নয়ন শ্যামা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

অঙ্কুর পুস্তকালয়
২এ, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০৯

অংকুর প্রকাশ □ ২০ এপ্রিল, ১৯৪১

প্রকাশক
সুব্রত দাশ
অংকুর পুস্তকালয়, ২এ নবীন কুণ্ডু লেন, কলিলাতা-৯

প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দু পত্রী

পরিবেশক
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
সি-৩, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর
অম্বর বর্ধন
দীপ্তি প্রিণ্টার্স
৯, রামনারায়ণ মতিলাল লেন, কলিকাতা-১৪

বাস থেকে নেমেই শ্যামা নয়নকে দেখতে পেয়েছিল।

বাস যেখানে থেমেছে, সেখানে জাতীয় সড়কের ধারেই হাট বসেছে। ছোট হাট, তবু সেখানে ব্যাপারীর ভীড়, ক্রেতাদের আনাগোনা। মুর্গীর ঝাঁপি সাজিয়ে একজন দোকানী বসে আছে! তার পাশেই একজন বুড়ো চাষী একটা হাড়-বের-করা গরু নিয়ে দাঁড়িয়ে। এটা গো-হাটা নয়। তবু বুড়ো কি ভেবে তার গরু নিয়ে এসেছে কে জানে! সেই মুর্গীর ব্যাপারী আর গরু-অলা বুড়োর মাঝ বরাবর নিতান্ত বেমানান পাকা জলপাই রঙের দামী প্যাণ্ট আর গাঢ় হলুদ জামা গায়ে নয়ন দাঁড়িয়ে ছিল। চোখে উগ্র জ্বালা, ঠোঁটে সিগারেট।

বাস থেকে প্রথমেই শ্যামা নামল, তারপর বাবা আর মা। শ্যামা নামতে নামতেই নয়নকে দেখতে পেল, ভীড়ের মধ্যেও। একপলক দেখা। বুকটা চমকে উঠেছিল শ্যামার। পরমুহূর্তেই অবশ্য নয়ন গা-ঢাকা দিল ভীড়ের মধ্যে। শ্যামা পলকে চোখ ঘুরিয়ে বাবা মার মুখ দেখে নিল। বাবা মার মুখ দেখে বোঝা যায় যে তারা নয়নকে দেখে নি।

অনেকদিন ধরেই নয়ন পিছু নিয়ে আছে। সব জায়গাতেই পিছু নেয়। কিন্তু এতটা আসবে, আগে ভাগে এসে অপেক্ষা করবে তা কল্পনা করে নি। তার ভিতরটায় এতক্ষণ নতুন একটা জায়গায় বেড়াতে আসার যে আনন্দটা ছিল তা হঠাৎ কেটে গিয়ে ভিতরটা হঠাৎ পোড়ো বাড়ির মতো ভয় ভয় ভাবে ছেয়ে গেল। ভয়টা নয়নের জন্যে। যদি বাবা মা টের পায় নয়ন এখানে এসেছে তবে কী যে হবে!

হেমন্তকাল। কলকাতায় এসময়ে শীত নেই। দুপুরে এখন পাখা চলে। তাই শ্যামা গরম জামা কিছু আনে নি। কিন্তু সড়কে পা দিয়েই সে বাতাসে চোরা শীতের টান টের পেল। উঁচু জাতীয় সড়কে দিগন্তের হাওয়া এসে লাগছে। ভিতরটা কেঁপে ওঠে শ্যামার। ভয়ে, শীতে।

কাঁধের শালটা বাবা ভাল করে গলায় জড়িয়ে নিয়ে মার দিকে ফিরে বলল—বলি নি তোমাকে মফঃস্বলে এসময়েই শীত পড়ে যায়।

—তাই তো দেখছি। ভর দুপুরেও বেশ বাতাস! এই বলে মা ভেলভেটের খাটো স্টোলটা জড়িয়ে নেয়।

বাবা শ্যামার দিকে ফিরে বলে—তুই তো কিছু আনলি না। ফেরার সময়ে ঠাণ্ডা লাগিয়ে বসবি। একেই পাকা টনসিল তোর, আমার শালটা নে বরং।

—আমার তো গরম লাগছে।

বাবা একটু হাসে—ওসব কম বয়সের কথা। গরম নেই।

মা বলল—আঁচলটা জড়িয়ে নে গলায়।

শ্যামা তাই নেয়। তার শীত করছে ঠিকই। একটু আগে বাসে গাদাই ভীড়ে বসে সে ঘামছিল। মানুষের গায়ের ভাপে একটা গরম আছে তো। এখন খোলা বাতাস বলে, নাকি নয়নকে দেখেছে বলে কেন যেন তার শীত করছে, কাঁটা দিচ্ছে গায়ে।

—এইখানে দিব্যি হাট বসেছে দেখছি।

বাবা একটুক্ষণ নাবালের হাটটার দিকে চেয়ে দেখে। ততক্ষণ প্রায় শ্বাস বন্ধ করে থাকে শ্যামা। বাবা চোখ ফিরিয়ে বলে—ফ্রেশ ডিম-টিম, মুর্গী, শাকপাতা পাওয়া যায়, ফুলকপি-টপিও উঠেছে বোধ হয়। ফেরার সময়ে যদি হাতে সময় থাকে তো দেখা যাবে।

—থলে টলে তো আনি নি। মা বলে।

—রুমাল আছে, শ্যামার ভ্যানিটি ব্যাগটাও বড়-সড়—

শ্যামা এতক্ষণে একটু হাসে,—আমার ব্যাগে শাকপাতা ঢোকাবে নাকি?

—শাকপাতা না হোক, ডজনখানেক ডিম এঁটে যাবে। আঁটবে না?

—যদি ডিম ভাঙে তো ব্যাগের দফা শেষ। তখন আর একটা কিনে দেবে তো?

অফিস থেকে রিটায়ারমেণ্টের সময়ে ফেয়ারওয়েলে পাওয়া চমৎকার বেনারসী লাঠিখানা একবার ওপরে তুলে আবার নামিয়ে বাবা বলে—ওরে ভাবিস না, হাট যখন একটা থলেও ওখানে কিনতে পাওয়া যাবে।

—বাবা, সব জায়গায় তোমার কেবল খাই-খাই।

বাবা একটু হাসে, বলে—খেতে আর তোরা দিস্ কোথায়! নুন বারণ, ঝাল বারণ, ফ্যাট বারণ, এত সব বারণে আর খাওয়ার

থাকে কি ?

—ব্লাডপ্রেসার দুশোর কাছাকাছি ওঠে কেন ? তুমি প্রেসার ঠিক রাখ আমরা সব বারণ তুলে নেব ।

—আর কমেছে । এটাই শেষ রোগ । একটা তো হয়ে গেছে, আর দুটো স্ট্রোক মোটে পাওনা ।

শুনে শ্যামা চুপ করে থাকে । চোখ ছল্‌ ছল্‌ করে । মা ধমক দিয়ে বলে—সবসময়ে তোমার আকথা কুকথা । যে কোন ভাল কথার মাঝখানেও তুমি কেবল তোমার রোগ-ভোগের কথা তুলে ফেল । ওটা ভাল নয় ।

জাতীয় সড়ক ধরে একটু এগোলেই ঝক্‌ঝকে নতুন একটা কংক্রিটের পোল । নিচে ছোট্ট একটা নদী তর তর করে বয়ে যাচ্ছে । পোল পেরোলেই বাঁ ধারে একটা বিরাট আমবাগান । জাতীয় সড়ক থেকে একটা মেটে রাস্তা নেমে আমবাগানে ঢুকে গেছে ।

পোলের ওপর দাঁড়িয়ে বাবা তার নকশাকাটা সুন্দর লাঠিগাছ তুলে মেটে রাস্তাটা দেখিয়ে বলে—ঐ হচ্ছে রাস্তা । এখান থেকে মাইলখানেক যেতে হবে ।

শ্যামা পোলের রেলিং ধরে ঝুঁকে নদীটা একটু দেখে । জল বড় পরিস্কার । সেই জলে তার ছায়া পড়ে । চারটে নৌকা পাড়ে বাঁধা । জলের নিচে মাছের চলাফেরা দেখা যাচ্ছে । জল থেকে চোখ তুলে শ্যামা একবার হাটের দিকে তাকায় । কিছুই বোঝা যায় না । কয়েকটা গরুর গাড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, চালাঘরের নিচে দোকানে দোকানে মানুষ । রঙচঙে জামাকাপড় ঝুলছে এধার ওধার । হলুদ জামা আর জলপাই-রঙা প্যাণ্ট পরা নয়ন কোথাও নেই । শ্যামা একটু স্বস্তির শ্বাস ফেলে শুনতে পায় মা বলছে—রাস্তা তুমি ভারী চেন কি না ।

বাবা বিরক্ত হয়ে বলে—চেনার কি ? এসব গাঁ-গঞ্জ জায়গা, কলকাতার গোলকধাঁধা তো নয় ! বাসে তিনজনকে জিজ্ঞেস করে সিওর হয়ে নিয়েছি ।

—তা হোক । তবু এখানকার কাউকে জিজ্ঞেস করে নাও । সেবার তুমি দেওঘরে বেড়াতে বেরিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলে, মনে নেই ! বুড়ো বয়সে কী কাণ্ড ।

—আরে, সে তো কানাওলায় ধরেছিল বলে । ‘নিজের বাসার

সামনে দিয়ে যাচ্ছি অথচ বাসা চিনতে পারছি না। কানাওলা হচ্ছে এক-রকমের স্পিরিট।

—তা হোক, তবু জেনেশুনে রাস্তায় নামা ভাল।

হাতে একটা ছোট্ট শোলমাছ নিয়ে এক গেঁয়ো হাটুরে হাট সেরে ফিরে যাচ্ছে, বাবা তাকে জিজ্ঞেস করে—মায়ের ইচ্ছা কালীবাড়ির রাস্তা তো ঐটে, না?

—ঐটেই। আমবাগানের ভিতর দিয়ে চলে যান। মোনা ঠাকুরের কাছে যাবেন তো! এখান থেকে মাইলখানেক।

—আপনিও ওদিকে যাবেন নাকি?

—না। আমি যাব বামুনগাছি। সোজা কোশখানেক গিয়ে ডানহাতি?

—ঐ দিকটায় লোক চলাচল নেই?

—আছে, তবে কম। মোনা ঠাকুরের জন্যেই আজকাল লোকজন যায়। হাট ফুরোলে কিছু লোক ফিরবে। কিন্তু একা হলেও ভয় নেই। রাস্তা নিরাপদ।

—সাপখোপ?

লোকটা একটু হাসে—দিনের আলো রয়েছে, ভয় কি। লাঠিটা একটু ঠুকে ঠুকে চলবেন। সাড়া পেলে ওরা রাস্তা ছেড়ে দেয়। মানুষকে সবাই ডরায়। চলে যান, ভয় নেই।

শ্যামা নয়নকে আর দেখতে পেল না বটে, কিন্তু বুকের ভিতরটা খিঁচ ধরে রইল। নয়ন খামোকা এতদূর আসে নি। এসেছে যখন কাছে আসার চেষ্টাও নিশ্চয়ই করবে। ও এখন মরীয়া। ওর প্রাণের ভয় নেই।

বাবা একবার গলা খাঁকারি দিয়ে লাঠিটা বারকয়েক রাস্তায় ঠুকে নিল। বলল—চল।

বড় রাস্তা ছেড়ে তারা মেটে রাস্তায় নামল। তারপরই আমবাগানে ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেল জাতীয় সড়ক, ওপারের হাট, নয়ন। গো-গাড়ির চাকায় রাস্তা এমনভাবে ভেঙে দুধারে বসে গেছে যে পাশাপাশি হাঁটা যায় না। আপনা থেকেই তারা আগুপিছু হয়ে গেল। সামনে বাবা, তারপর মা, সবশেষে শ্যামা।

বাবা হাতঘড়ি দেখে বলল—মোটে পৌনে দুটো। আমরা আস্তে

হাঁটলেও গিয়ে ফিরে আসতে ঘণ্টা তিনেকের বেশী লাগবে না। সন্ধ্যের আগেই বাস ধরতে হবে।

মা একটু বিরক্ত হয়ে বলে—মঠে মন্দিরে যাওয়ার সময়ে অত ফেরার তাড়া থাকলে হয় না। তুমি বাপু বড্ড ঘরকুনো হয়েছ আজকাল।

বাবা একটু থতিয়ে গিয়ে বলল—তা নয়। আসলে দিনকাল তো ভাল না, তোমাদের গায়ে সোনার গয়না-টয়না রয়েছে।

—লোকটা তো বলল ভয়ের কিছু নেই।

—ওসব লোকের কথা কি ধরতে হয়? বলে দিল ভয় নেই, তা বলেই কি ভয় নেই? দেশে আনএমপ্লয়মেণ্ট, খরা, বন্যা চারদিকে উপোসী অভাবী লোক। এ সময়ে চোর, গুণ্ডা, বদমাশ দেশে বাড়েই।

তারের যন্ত্র যেমন বাজে তেমনি তীব্র স্বরে গাছে গাছে পাখিদের ডাক বেজে যাচ্ছে। শুকনো পাতা ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে পায়ের তলায়। শ্যামার বুক কাঁপছে। একটা পাখির শিস্ কানে এল। উৎকণ্ঠ হয়ে শুনল শ্যামা। নয়ন নানারকমের শিস্ দিতে পারে।

বাবা যেতে যেতে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে বলে—কি ঠাণ্ডা সুন্দর নির্জন জায়গা এসব। কলকাতায় আমরা যে কি নরকে থাকি। শব্দ আর শব্দ।

মা বলে—গাঁ-গঞ্জ তো ঠাণ্ডা হবেই।

বাবা আবার হাঁটতে হাঁটতে উদাস গলায় বলে—কলকাতার জমিটা বেচে দিয়ে এসব দিকে চলে এলে কেমন হয়। ফ্রেশ বাতাস, ভাল তরিতরকারী, ডিম-দুধ-মাছ—

মা বলে—ও তোমাদের মুখের কথা। কলকাতা তোমাদের বশীকরণ করে রেখেছে। সেবার দেওঘরে গিয়ে একমাসও থাকি নি, তুমি কি হুড়োহুড়ি শুরু করলে—এখানে সিগারেটের টোবাকো পাওয়া যায় না, এ নেই, সে নেই—কুড়ি দিনের মাথায় ফিরে আসতে হল তোমার জন্যেই তো! তুমি আবার থাকবে গাঁয়ে।

বাবা হাসে, বলে—সে অবশ্য ঠিক। এক সময়ে যখন মফঃস্বলে চাকরী করতাম তখন কলকাতার নামে ভয় ভয় করত। তারপর কলকাতায় একটা বড় সময়ে থেকে থেকে কলকাতার সুবিধেগুলোয় এমন অভ্যাস হয়ে গেল, আর কোথাও সেই আরামটা পাই না। ধর গ্রীষ্মকালে যদি কখনও ফুলকপি খেতে ইচ্ছে করে, কিংবা অসময়ে গলদা চিংড়ি—সে কেবল

ওখানেই পাবে। অন্য কোথাও—

শ্যামা হাসে—বাবা, আবার?

চারদিকে গভীর অরণ্য-ছায়ার কোথা থেকে আবার সেই শিস্‌টা শোনা যায়। পাখির ডাকের মত, কিন্তু পাখির ডাক কিনা, তা শ্যামা বুঝতে পারে না ঠিক। উৎকর্ণ হয়ে শোনে। তার মুখের হাসিটা মিলিয়ে যায়।

রাস্তার ওপর গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ঝিরঝিরে রোদ এসে পড়েছে। দুলছে আলো-ছায়া, দোলে রহস্য। বিচিত্র অচেনা পাখিরা ডাকে। কে জানে সেইসব অচেনা পাখিদের একজন হয়ে নয়ন ডাকে কিনা। পিছন ফিরে একবার তাকায় শ্যামা। সঙ্গে সঙ্গে হোঁচট খায়।

—সাবধানে আয়। মা হাত বাড়িয়ে বলে।

—ঠিক আছে মা।

—কদ্‌বেলের গন্ধ পাচ্ছ? বাবা জিজ্ঞেস করে।

মা বাতাস শুঁকে বলে—কি একটা গন্ধ যেন চাম্‌সে মতন।

বাবা শ্বাস ফেলে বলে—বাঁদরলাঠি, সেই যে লম্বা লম্বা, সেগুলো ভাঙলেও এরকম গন্ধ বেরোয়।

বুনো কুলের ঝোপ পেরোবার সময়ে বাবা শ্যামাকে ডেকে দেখায়—এই কুল দেখ, বড় পুঁতির মত হয়, পাকলে ভারী মিষ্ট, মাণিকপুরের জঙ্গলে কত খেয়েছি।

বাতাস এখানে ভারী পরিষ্কার, সতেজ, বাতাসে বন্য গন্ধ, ভেজা মাটির সোঁদা মিষ্ট গন্ধটি। ছায়ায় কেমন শীত শীত করে। শ্যামা তার আঁচল গায়ে জড়ায়। ভীতু খরগোশের মত চারদিকে চায়। টুপ টুপ পাতা এসে পড়েছে গাছ থেকে। জলের ফোঁটার মত টুক্ করে একটু শব্দ হয় কি হয় না। এই ছায়াটি, এই নির্জনতা, এই অচেনা জায়গার সৌন্দর্য কী নিবিড় সুন্দর বলে মনে হত হেমন্তের এই গড়ানে দুপুরে! শ্যামার চোখে যদি নয়নের হলুদ জামা আর জলপাই-রঙা প্যাণ্টটা না ছায়া ফেলত।

আগাছা রাস্তার মাঝখানে হাত বাড়িয়ে রেখেছে। আঁচলে টান পড়তেই শ্যামা কেঁপে ওঠে, তারপর লজ্জিত মুখে গাছের কাঁটা থেকে তাড়াতাড়ি আঁচল ছাড়ায়। জোরে হাঁটা বাবার বহুকালের অভ্যাস। স্বভাবতই বাবা এগিয়ে যায়, দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে তার আর মার জন্য। আগু-পিছু তারা চলে।

—তোমার ইচ্ছের জন্যই আসা। কিন্তু আমার মন বলে, তন্ত্র-মন্ত্রে কিছু হবে না। বাবা উদাস গলায় বলে।

মা চুপ করে থাকে। তাদের মাঝখানে একটা নিস্তব্ধতা নেমে আসে।

শ্যামা স্তিমিত, নরম গলায় বলে—মোনা ঠাকুরের খুব নাম-ডাক।

—শুনেছি। কিন্তু আমরা হচ্ছি ঘরপোড়া গরু। বুকের মধ্যে ভয়টা সব সময়ে থম্ ধরে থাকে। তাকে শেষবার দেখা গিয়েছিল বেরিলিতে, তাও পাঁচ বছর হয়ে গেছে। পাঁচ বছরে কত কী হয়ে যায় মানুষের, তার ওপর পাগল মানুষ। বলে বাবা বড় করে শ্বাস ছাড়ে।

মার পা ধীর হয়ে আসে। তারপর একটু ধরা গলায় বলে—যা হবার তা হয়েছে তুমিও তো আর জ্যোতিষ নও।

—সন্ন্যাসী-ফকিরের পিছনে তো কম ঘোরা হল না।

—যতদিন বেঁচে আছি ততদিন ঘুরব। আমরা চোখ বুজলে তখন তার যা হওয়ার হোক।

বাবা মাথা নেড়ে বলে—আমার মনে হয় না যে সে বেঁচে আছে।

বে-ফাঁস কথা। এ কথাটা মা কোনদিন সহ্য করতে পারে না। দাঁড়িয়ে পড়ে মা হাঁফাতে থাকে। তীব্র স্বরে বলে—তোমার কেবল ঐ কথা। কিন্তু সে গেছে বলে যতদিন না জানতে পারছি ততদিন তোমাকেও ঘুরতে হবে। আমাকেও। মার কাছে ছেলে যে কী তা কোনদিন বাবা বুঝতে পারে না।

বাবা সঙ্গে সঙ্গে নরম হয়ে গিয়ে বলে—আমি তো ঘুরিই। ঘুরি না? বল!

আবার তারা হাঁটতে থাকে। আগু পিছু হয়ে। অচেনা পাখিরা ডাকে। গাছের ছায়ায় শীত জমে ওঠে। ঠাণ্ডা মাটি থেকে শীতলতা উঠে আসে। চারদিকে রহস্যময় আলো-আঁধারি। এর মধ্যেই কোথাও অলক্ষ্যে নয়নও চলেছে সঙ্গ দিয়ে। হয়তো পাখি হয়ে। হয়তো গাছের ছায়া হয়ে। শ্যামার বড় ভয় করে।

এখানকার তাড়িটা ভালই। নয়ন ঠোঁটের ফেনা মুছে নেয়। এখন ঠিক এই সময়ে তাড়ি খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না তার। অনেক কাল নেশা-ভাঙ করে নি সে। ছেড়েই দিয়েছে। কিন্তু কে জানত যে এখানে কলকাতা থেকে মাত্র চল্লিশ কি পঞ্চাশ মাইল দূরে, ভর দুপুরে এমন শীত করবে! নেশাটা সেই জন্যই করা। তবু যাকে ঠিক নেশা বলে তা হয় নি।

তাড়িটা কিন্তু ভালই। খারাপ কিছু মেশায় নি। পরিষ্কার গন্ধ, চনচনে স্বাদ। শীত ভাবটা কেটে গেল। ভাঁড়টা ফেলে দিয়ে বলল—তোমাদের এখানে এত শীত কেন হে?

—শীত হয় না এ সময়ে। ক'দিন বৃষ্টি গেল পরের পর। আজ দু দিন টেনে উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছে দেখছি। তাড়িওয়ালা যুবকটি বলল।

একটু আগে শ্যামা তার মা বাবার সঙ্গে নেমেছে। কোথায় যাবে তা নয়ন জানে। তাই পিছু নেয় নি, হাট পেরিয়ে দক্ষিণে গেলে একটা বাঁশের সাঁকো আছে। সেইটে দিয়ে পেরিয়ে নয়ন সর্টকাট্-এ আম-বাগানের গহীন জায়গাটায় পেঁাছে যাবে। তাড়া নেই। ওরা যে জোরে হাঁটবে না—এ তো জানা কথা।

নয়ন হাই তুলে জিজ্ঞেস করে—চাষবাস কর?

—আজ্ঞে না। বাবা করে একটু আধটু, বছরের চালটা উঠে আসে। আমার একটা চায়ের দোকান আছে বল্লভপুরে।

—তালগাছ কটা?

—অনেক। ঐটাই তো বাঁচিয়ে রেখেছে। বলে হাসে তাড়ি-ওয়ালা।

—ঝাণ্ডাওয়ালারা গাঁয়ে আসে না?

—আসে।

—কোন্ ঝাণ্ডা বেশী আসে?

—সব রকমই। সবাই ভাল ভাল কথা বলে।

—তোমরা কোন্ ঝাণ্ডার দলের?

—সে কি বলা যায়? আমরা এখন চালাক হয়ে গেছি!

—ভোট টোট দাও?

—দিই মাঝে মাঝে।

নয়ন হাসে। বলে—খুব চালাক হয়ে গেছ তোমরা। ফসল টসল কেমন হয়?

—হয়। এদিকটায় বৃষ্টি বেশ। আমনের ফসল ভাল এবার।

—ফসল রাখতে পার? কেটে নিয়ে যায় না?

—নেয়, আবার রাখিও। যে যেমন পারে।

নয়ন লোকটার চোখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। লোকটা চোখ নামিয়ে নেয়। নয়ন হেসে বলে—তোমরা খুব চালাক হয়ে গেছ।

চন্‌চনে খিদে পেয়েছে। নয়ন মাটিতে বসে ছিল, এবার উঠল। উঠতেই টের পেল প্যাণ্টের পিছন দিকটা ভেজা-ভেজা। বৃষ্টি হয়ে গেছে খুব। মাটির ভিতরে চোরা জল। রসস্থ মাটি। নয়ন কয়েক পা জুতোর হিল চেপে হেঁটে দেখল নরম মাটিতে জুতো বসে যাচ্ছে।

পাশেই তেলেভাজার দোকান। সেখানে বেশ ভীড়। গন্ধটাও ছেড়েছে ভাল। কিন্তু যে লোকটা ভাজছে তার কব্জির কাছে একটা শ্বেতীর মত দাগ দেখে নয়ন আর তেলেভাজা কিনল না। তিনটে কাঁচা মুরগীর ডিম কিনে চায়ের একটা স্টলে গিয়ে দু কাপ চা খেল পর পর। তারপর বাচ্চা ছেলেটাকে ডিম তিনটে দিয়ে খুব অবহেলায় বলল—সেদ্ধ করে দে।

ছেলেটা একপলক নয়নের চোখে চোখে রাখল। তারপর চায়ের কেটলির পাশেই উনুনের ওপর একটা মগে সেদ্ধ চাপিয়ে দিল।

তিনটে সেদ্ধ ডিমের প্রথমটা খেতেই বিস্বাদে ভরে গেল নয়নের মুখ। নেশার মুখে সেদ্ধ ডিম বড়ই পানসে। কোনক্রমে আঁশটে গন্ধের দলাটা গিলে সে দুটো ডিম পকেটে রাখল। তারপর ফিরে এল তাড়িওলার কাছে।

—আর এক ভাঁড়।

তাড়িওলা ভাঁড় হাতে দিয়ে বলে—নির্ভয়ে খান। এর নেশা খুব পাতলা। বাবু, আপনার কোন্ ঝাণ্ডা?

নয়ন ভাঁড় মুখে দিয়ে কুলকুচো করে মুখের বিস্বাদ তাড়িয়ে বলে—জানলে যদি প্যাঁদাও বাপু!

লোকটা হেসে বলে—ওরে ব্বাস্ রে। কলকাতার বাবু আপনারা, ধমক দিলে হেগে মুতে ফেলি।

—খুব চালাক, না? আমার ঝাণ্ডা লাল, বুঝলে? তবে লালটা

অনেকটা রক্তের মত, অন্য সব ঝাণ্ডার সঙ্গে মেলে না। আমার নিজের ঝাণ্ডার রঙকে আমি নিজেই ভয় পাই।

লোকটা হেঁয়ালি শুনে চেয়ে থাকে।

নয়ন দাঁড়ায় না। এবার রওনা হওয়া উচিত। শ্যামা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। নয়ন হাঁটতে থাকে। দু-পকেটে দুটো ডিম ফুলে থাকে। নয়ন গ্রাহ্য করে না। লম্বা পায়ে হাটটা পেরিয়ে সে একটা ঢিবির ওপর উঠে আসে। দক্ষিণে সাঁকো, সঠিক জায়গাটা চেনে না নয়ন। এগিয়ে বাঁশঝাড়টা পেরোলে বোঝা যাবে। নয়ন হাঁটতে থাকে। হেমন্তের দুপুরকে শূন্য করে দিয়ে হু-হু করে একটা কোকিল ক্ষণেক ডেকে উঠেই চুপ করে যায়। নয়ন ঢিবির উৎরাইটা দৌড়ে নামতে নামতে অবিকল কোকিলের ডাকটা ডাকতে থাকে। কুহু-কুহু-কুহু-কুহু…

শ্যামা যতক্ষণ পৃথিবীতে আছে ততক্ষণ ক্লান্তি নেই। সে এখানে এসেছে শ্যামারা আসবার তিন চার ঘণ্টা আগে। নয়নের হাতে ঘড়ি নেই। থাকলে ঠিক সময়টা বোঝা যেত। ঘড়িটা ইচ্ছে করেই পরে নি নয়ন। যখন শ্যামার জন্য সে কোথাও যায় তখন সে সময়ের পরোয়া করে না। তখন তার কাছে জীবনটাই একটা অখণ্ড, অনন্ত সময়। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, কতদূর যেতে হবে তার কোন ঠিক থাকে না। তবে সবটুকু সময় দেওয়ার জন্য সে প্রস্তুত থাকে। যখন নয়ন এখানে এসেছে তখন হাটটা ভাল করে জমে নি। ব্যাপারীরা আসছে সবে, চত্বরটায় তখনও বিশৃঙ্খলা। জিনিসপত্রের টাল জমছে, চায়ের দোকানের উনুনে তখনও আঁচ পড়ে নি। গত তিন চার ঘণ্টা ধরে নয়ন হাটটাকে জমে উঠতে দেখেছে।

কিংবা বলা যায় নয়ন কিছুই দেখে নি। তার চারধারে পৃথিবীর কিছু অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় মানুষেরা অকারণে ভীড় জমিয়েছে—এইটুকু মাত্র সে টের পেয়েছে। শ্যামা যতক্ষণ আসে নি ততক্ষণ এ জায়গাটার কোন সৌন্দর্য ছিল না, তাৎপর্য নয়। ততক্ষণ সে অদূরে তাড়ির কলসীটাও লক্ষ্য করে নি। শ্যামাকে বাস থেকে নামতে দেখে লুকোবার সময়ে সে গিয়ে প্রায় তাড়িওয়ালার গায়ে হোঁচট খেল। তখনই টের পেল। উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছে, এ জায়গাটায় শীত পড়েছে বেশ।

বাঁশ-ঝাড়ের পাশ দিয়ে পায়ের রাস্তাটা ঘুরে গেছে। ঝরা বাঁশপাতার পুরু গালচের মত হয়ে গেছে রাস্তা, পা রাখলে নরম লাগে। আরও দুবার

কোকিলের ডাক ডাকল নয়ন।

বাঁশ-ঝাড়টা পেরলেই দেখা যায় শ্মশান। চাতালটা খাঁ খাঁ করছে। গত রাতে কারা মড়া পুড়িয়ে গেছে, কালো আংরার দাগ ছড়িয়ে আছে, ইতস্তত কাঠকয়লা। ওদের ঘর অনতিদূরে। খোড়ো ঘরের সামনে বসে এক মধ্যবয়সী মেয়েছেলে নিজের রুক্ষ চুলে আঙুল ডুবিয়ে উকুন খুঁজছে।

—এ ধারে নদীর ওপর একটা বাঁশের সাঁকো আছে না? নয়ন তাকে জিজ্ঞেস করে।

মেয়েছেলেটা তাকে চোখ ছোট করে একপলক দেখে নিয়ে বলে—সে তো ভেঙে গেছে প্রায়। আরো দক্ষিণে।

—পেরোন যাবে না?

মেয়েছেলেটা উদাস গলায় বলে—কে জানে! লোকে তো এখনও পার হয়।

গত তিন চার ঘণ্টা উগ্র উত্তেজনায় শ্যামার জন্য অপেক্ষা করছে নয়ন। কিছু খায় নি। চনচনে খিদের মুখে পাতলা তাড়িটা তাকে ধরেছে ভাল। গা জ্বালা করছে। ঘামে ভিজে যাচ্ছে ভিতরের গেঞ্জি। গলা বুক শুকিয়ে আসছে। কিন্তু এগুলো কিছুই গ্রাহ্য করার মত ব্যাপার নয়। খিদে-তেষ্টা, শীত-গ্রীষ্ম কোথায় যে উড়ে যায় এসব সময়ে! চারদিকটা নির্জন হয়ে যায় যেন। কেবল নয়ন থাকে, থাকে শ্যামা।

নয়ন জানে, শ্যামা তাকে দেখেছে। দেখে নিশ্চয়ই সাবধান হয়ে গেছে সে। ঐ আমবাগানে আবার তাকে পিছু নিতে দেখলে শ্যামা কি করবে? সেবার পিকনিক গার্ডেনসে তার কলেজের বান্ধবী আর বন্ধুদের সঙ্গে যখন গিয়েছিল শ্যামা তখন এই রকম ভাবে দেখা হয়েছিল। শ্যামা তাকে দেখেছিল কিন্তু কিছু করে নি। যদি ইচ্ছে করত শ্যামা, যদি নয়নের সেই পিছু-নেওয়ার কথা বলে দিত তার বন্ধুদের তবে সেইসব বন্ধুরা পিষে ফেলতে পারত নয়নকে। কিন্তু শ্যামা অতটা করে নি। শ্যামা সে রকম মেয়ে নয়। নিষ্ঠুরতা তার স্বভাবে নেই। আবার শ্যামার মত নিষ্ঠুরও হয় না।

বাঁশঝাড়, কাঁটাঝোপ, বন-করমচার ভিতর দিয়ে উঁচু নিচু পায়ের রাস্তা চলে গেছে। জঙ্গুলে জায়গা, ঘরবাড়ি বড় একটা দেখা যায় না। বাঁ

ধারে আবাদ দেখা যায় গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে। সিকি মাইল গিয়ে নয়ন বাঁশের সাঁকোটা দেখতে পেল। চারদিকে হেমন্তের পাতাঝরা গাছ। নির্জন শীতলতা। সেই নিঝুমতায় বাঁশের সাঁকোটা বুড়ো জীর্ণ হয়ে ঝুলছে। জলে ছায়া দেখছে নিজের। কাছে গিয়ে নয়ন দেখে, পা রাখার জন্য একটি মাত্র বাঁশ অবশিষ্ট আছে, আর দু-ধারে ধরার বাঁশ নেই। পার হওয়া বেশ শক্ত। কিন্তু ওপাড়ে শ্যামা আছে, নয়নের কিছুই তেমন শক্ত মনে হয় না।

বার বার পা পিছলে গেল, ভারসাম্য হারিয়ে পড়তে পড়তে ঝুলে আবার উঠতে হল, তবু হামাগুড়ি দিয়ে সাঁকোটা ঠিক পার হয়ে গেল নয়ন। তারপর নিবিড় ছায়ায় আচ্ছন্ন বনভূমিতে ঢুকল। তারপর কেবল পাখির ডাক, আর ঝিঁঝির শব্দ এবং বন্য গাছের আর ভেজা মাটির গন্ধ। আগাছা, ঝোপ আর ছায়ার ভিতর দিয়ে রাস্তাটা গেছে। কিন্তু এ রাস্তায় যে লোক চলাচল খুব কম তা রাস্তার অস্পষ্ট চিহ্ন দেখলেই বোঝা যায়। পায়ে-হাঁটা রাস্তার মাঝখানে ঘাস উঠেছে।

পাখির ডাক নকল করতে করতে নয়ন হাঁটে। যত বিচিত্র ডাক শোনে ততই বিচিত্র ডাক সে হুবহু নকল করে। ভর-দুপুরে খিদে পেটে তাড়িটা গেঁজে উঠছে। নয়নের চোখের পাতা ভারী ভারী, শরীরের ভিতরটা ঘুম-ঘুম। হাই উঠছে। কোন গাছের ছায়ায় শরীরটা একবার পেতে দিলে দিনটা নিঃসাড়ে কেটে যাবে! কিন্তু সে কথা নয়ন ভাবতেই পারে না। সে এগোচ্ছে পশ্চিম দিক থেকে পুবে। শ্যামা এই বনভূমিরই উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে আসছে। রাস্তায় তাদের দেখা হবে। এখন এই আমবাগানের বাতাসে শ্যামার গন্ধ আছে, স্পর্শ আছে। নয়নের হাজার বছর ধরে জেগে থাকতে ইচ্ছে করে।

কিছুদূর গিয়েই নয়ন ভগ্নস্তূপটা দেখতে পায়। বিশাল বাড়ি ছিল কোনকালে। অনেকটা জায়গা জুড়ে ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে। মাঝখানে বাড়িটার দেয়ালগুলো দাঁড়িয়ে আছে। ইঁটের ভিতর থেকে, মেঝে থেকে বড় বড় গাছ উঠেছে। চারদিকেই ছড়ান ইঁট—পুরোনো শ্যাওলাও কালো। পায়ে হাঁটা পথটা ভগ্নস্তূপটা এড়িয়ে ঘুরে গিয়ে অদূরে রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। কিন্তু সে পথে যায় না নয়ন। গেলে রাস্তা থেকে তাকে স্পষ্ট দেখা যাবে। সে রাস্তা ছেড়ে ধ্বংসস্তূপটার ভিতরে উঠে যেতে থাকে।

যেখানে ইঁট সেখানেই সাপ। পুরোনো বাড়ি, ইটের খাঁজ, এ হচ্ছে সাপের প্রিয় আস্তানা। নয়ন তা জানে, তবু সাপের কথা তার মনেই আসে না। আকীর্ণ শ্যাওলায় পিছল ইঁটের খাঁজে খাঁজে পা রেখে, হোঁচট খেয়ে, তাল সামলে সে বাড়িটার দিকে উঠে যায়। ঐ বাড়ির উঁচু ভিত থেকে রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যাবে। দেখা যাবে শ্যামাকেও। দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখবে নয়ন। বিপদআপদের কথা তার মনেও থাকে না।

ওরা আসছে ঘুর রাস্তায়, আস্তে হেঁটে। নয়ন এসেছে চোরা পথে, অনেক তাড়াতাড়ি। তবু নয়নের হঠাৎ ভয় হয় শ্যামা জায়গাটা পেরিয়ে যায় নি তো! তাড়ির ঘোরে তার হয়তো সময় জ্ঞান নষ্ট হয়ে গেছে। সে হয়তো খুব আস্তে হেঁটেছে।

মোটা মোটা কয়েকটা থাম দাঁড়িয়ে আছে। বেশ পুরু দেয়াল। এখন কোথাও কোথাও দেয়ালে পঙ্খের কাজের চিহ্ন দেখা যায়। থামের শীর্ষে কিছু কারুকাজ। একটা লোহার বরগা আড়াআড়ি মাথার ওপর রয়ে গেছে আজও। আগাছা ভেদ করে নয়ন ক্রমে বাড়ির ভিতের ওপর উঠে আসে। চারিদিকে রহস্যময় ফাটল, ভিতের ভিতরে হাঁ করা জায়গাগুলোতে পাতালের অন্ধকার। চারদিকেই কাঁকড়া বিছেদের আস্তানা। একটা পিপাসা, একটা শিরা ছিঁড়ে যাওয়া প্রতীক্ষায় তার শরীরটা টান টান। বুকের ভিতরটা ধক্ ধক্ করে চোখ জ্বলে, ঠোঁট শুকিয়ে আসে, জ্বর জ্বর লাগে শরীর। তাড়িটা না খেলেই পারত সে। শরীরটা এখন কেমন কাঁপছে। খিদে মরে গিয়ে দুর্বল লাগে হাত পা। ঘুম পায়।

নয়ন জানলা দরজাহীন দেয়ালগুলোর ভিতর দিয়ে এদিকে ওদিকে একটু ঘুরে দেখে। চারদিকে স্তূপ হয়ে ইঁট, বালি আর রাবিশ পড়ে আছে। ঘুরে ঘুরে সে আসে সামনের দিকটায়। একটা প্রকাণ্ড থাম দেখতে পেয়ে দাঁড়ায়। একটু বসতে ইচ্ছে করে তার। কিন্তু বসে না। হাত বাড়িয়ে থামের গায়ে ভর দেয়। পরমুহূর্তেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে ওঠে। তার মনে হয়, ভর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই থামটা একটু দুলে উঠল। সে সভয়ে প্রকাণ্ড উঁচু থামের দিকে চায়। তারপর হাসে। ভয়টা কেটে যায়। হয়তো তাড়ির নেশায় ভুল বুঝেছে ভেবে আবার

থামটার গায়ে ভর রাখে, আবার মনে হয়—থামটা দুলে উঠল। কিন্তু এবার আর চমকে সরে গেল না নয়ন। ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে অন্যমনে নির্জন রাস্তাটার দিকে চেয়ে রইল। ভাঙা চোরা রাস্তার দু ধারে গরুর গাড়ির চাকার গভীর খাদ, সেই খাদে কাদা জমে আছে। সারা বছর ওই কাদা কমই শুকোয়। চারদিকে পাখি ডাকে। কেবল পাখি ডাকে। অন্যমনে বে খেয়ালে নয়নও ডাকতে থাকে। প্রথমে দোয়েলের মত, তারপর কুবো পাখির শব্দ করে, তারপর কোকিলের মত ডাকে।

তারপর ক্লান্তি লাগে। হরবোলা হয়ে থেকে কোন লাভ নেই। চাই নিজস্ব একটি শব্দ, নিজস্ব ডাক। নিজের শব্দটা কোনদিনই খুঁজে পায় না নয়ন। চব্বিশ বছর বয়স হয়ে গেল। ক্লান্তি লাগে, তবু অভ্যাসবশত সে ডাকে। প্রায় সমস্ত শ্রুত শব্দই হুবহু গলায় তুলে আনতে পারে সে। পাখ পাখালীর বিচিত্র ডাক, চাঁদের দিকে চেয়ে কুকুরের কান্না, বেড়ালের বিবাদ, ইঞ্জিনের হুইশ্‌ল্, কিংবা এরকম অনেক কিছু। কিন্তু হরবোলা হয়ে থাকার ক্লান্তি বড় ভীষণ। সে তো ওইসব শব্দের কোন-টারই মূল উৎস নয়! সে পাখি নয়, শেয়াল কুকুর বা রেল ইঞ্জিনও নয়। সে নয়ন রায়। তার নিজস্ব শব্দ কোন্‌টা? কোথায় তার নিজের ডাক? যে ডাক শুনলে শ্যামা সাড়া দেবে?

দূর থেকে একটা মেয়েলী গলার অস্পষ্ট স্বর শুনতে পেল নয়ন। উৎকর্ণ হয়ে রইল। তার গায়ে দিল কাঁটা। একটু শুনেই বুঝল এ শ্যামা বা তার মায়ের গলা নয়। বোধহয় একটা বাচ্ছা ছেলে তার বাবাকে ডেকে কিছু বলল, একটা পুরুষের গলা উত্তর দিল। ভগ্নস্তূপের দক্ষিণে বনের মধ্যে তারা কিছু খুঁজছে। গাঁ-গঞ্জের লোকেরাই হবে। নয়ন গা করল না। হাত বাড়িয়ে বুক-সমান আগাছার জঙ্গল থেকে একটা ডাল ভেঙে দাঁতে চিবোতে লাগল। তিতকুটে স্বাদ, গন্ধও বিচ্ছিরি। কিন্তু সেসব তেমন খেয়াল করে না সে। অন্যমনে ডালটা চিবোতে থাকে।

—কোন সুখই কখনও পরিপূর্ণ নয়, বুঝলে! আমাকেই দেখ চিরকাল ভাল চাকরি করেছি, পয়সা যথেষ্ট পেয়েছি। ছেলেমেয়ের দিক

থেকেও সুখীই ছিলাম। একটা ছেলে একটা মেয়ে—সুস্থ সবল। কোথা থেকে কী হয়ে গেল—

—তুমি রাস্তা দেখে চল। হোঁচট খাচ্ছ।

বাবা রাস্তা দেখতে গিয়ে ঝুঁকে লাঠিটা বারকয়েক ঠোকে। তারপর একটা 'হু-উম' শব্দ করে আপনমনেই বলে—কোন সুখই চিরস্থায়ী নয়।

অদূরে একটা শেয়ালের হাসি শোনা যায়। পরমুহূর্তেই একটা কোকিল হু-হু করে ডেকে উঠেই স্তব্ধ হয়। বাবা থমকে দাঁড়িয়ে বলে —শেয়াল ডাকছে।

মা বলে —তাতে কি। এসব জায়গায় শেয়াল তো থাকবেই।

বাবা চিন্তিত মুখখানা ফিরিয়ে বলে—সে কথা বলছি না। দিনের বেলা শেয়াল বড় একটা ডাকে না।

—তোমার বাপু বড় ভয়।

বাবা ভ্রূ কুঁচকে বলে—কোকিলটাই বা হঠাৎ ডেকে উঠে থেমে গেল কেন?

—তাতেই বা কি?

—কিছু না।

শ্যামার বুকটা খামচে ধরে এক ভয়। শেয়ালের ডাক নয়ন হুবহু ডাকতে পারে, তা শুনলে কারও অন্যরকম সন্দেহ হবে না। কিন্তু এ ডাকটা যেন শেয়ালের ডাকের মধ্যে একটু বিদ্রূপ মিশিয়ে দেওয়া। নয়ন কি তাই করছে? কোকিলের ডাক ডেকেই সে চুপ করে গেল কেন? সে কি শ্যামাকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য যে, সে এখানে আছে, অদূরে?

হরবোলা নয়নকে বাবা তো জানে। যদি নয়ন ডাকগুলো ঠিকমত না ডাকে তবে বাবা বুঝতে পেরে যাবে। বুঝলে কী হবে তা শ্যামা ভেবে পায় না।

একটা বুনো ঝোপের পাশ দিয়ে রাস্তাটা বেঁকে গেছে। সেই বাঁকটা ঘুরতেই বাবা বাহারী লাঠিগাছ তুলে হেঁকে বলল—ঐ দেখ, কোন রাজারাজড়ার বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। কি বিরাট বাড়ি ছিল, অ্যাঁ!

—দেখছি।

শ্যামাও দেখল। বাঁ ধারে, রাস্তা থেকে খুব দূরে নয়, কয়েকটা থাম গম্বুজ পুরু দেয়াল মিলিয়ে বিশাল এক বাড়ি। তাতে অশ্বত্থ, বট, আগাছার জঙ্গল। কিছু একটা আন্দাজ করে শ্যামা চেয়ে ছিল। হঠাৎ

সে দেখল কিংবা তার চোখের ভুলও হতে পারে—বিশাল ভারী একটা থাম যেন খুব সামান্য একটু দুলে গেল। পলকে মুখ সাদা হয়ে গেল শ্যামার। সে কোথাও কাউকে দেখে নি, কিন্তু হঠাৎ খুব নিশ্চিতভাবে তার মনে হল, নয়ন ঐখানে আছে। ওই থামটার আড়ালে। ওইখান থেকেই সে শ্যামাকে উদ্দেশ্য করে বিদ্রূপ মেশান শেয়ালের ডাক ডেকেছিল, কোকিল ডেকে থেমে গিয়েছিল। থামটা কি নড়ল সত্যিই? যা পুরোনো বাড়ি নড়তেও পারে। যদি থামটা ভেঙে পড়ে এখন, যদি যদি চাপা পড়ে মরে যায় নয়ন, তবে কি শ্যামা দুঃখ পাবে! ঠিক বুঝতে পারে না শ্যামা।

অনেক নীল আর বেগুনে বুনো ফুল ফুটে আছে।

—মা, আমি কয়েকটা ফুল তুলি। কি সুন্দর ফুল! শ্যামা বলে।

—এসব জঙ্গলে সাপখোপ আছে।

—কিছু হবে না। কয়েকটা তুলব।

মা বাবা দুজনেই অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। দাদার কথা উঠলেই তাদের এরকম হয়।

—আমরা দাঁড়াই, তুই তোল। মা বলে।

শ্যামা মাথা নাড়ে—দাঁড়াবে কেন? তোমরা এগোও না। যা আস্তে হাঁট তোমরা, আমি ঠিক পা চালিয়ে ধরে ফেলব।

—দেরি করিস্ না কিন্তু! এই বলে ব্যাপারটায় আর গুরুত্ব না দিয়ে বাবা আর মা হাঁটতে থাকে। দুজনে এখন দাদার কথা বলবে, শ্যামার জন্য দুশ্চিন্তা এখন অবান্তর।

শ্যামা তাই চায়। তার ধারণা, ওই পুরোনো ভেঙে পড়া বাড়ির কোন ঘুপচিতে ঠিক নয়ন আছে। কোন যাদুবলে নয়ন ঠিক তাদের আগে আগে এসেছে, অপেক্ষা করছে। এটা ভাল নয়। শ্যামা একবার নয়নের মুখোমুখি হতে চায়। এই নির্জন জায়গায় বিপজ্জনকভাবে পিছু নিয়েছে নয়ন? ঠিক ধরা পড়ে যাবে। বাবা যদি দেখতে পায় নয়নকে। গত মাসেও একবার বাবার প্রেসার দুশো ছাড়িয়ে গিয়েছিল। একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। দরকার হলে শ্যামা নয়নের পায়ে ধরে বলবে—ফিরে যাও। শ্যামা তাই বাবা মাকে এগিয়ে দিতে চায়। এখন একা এই বনভূমিতে বেরিয়ে আসুক নয়ন। শ্যামা মুখোমুখি হবে।

বাবা আর মা এগিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে চলে গেল। কিছুক্ষণ

লোকটা হাসে! ছেলেটাও খি-খি করে হাসে, বলে···ঘেমো-গন্ধ বাবা, কি বলছে দ্যাখো!

—আমাকে সাপ ধরা শিখিয়ে দেবেন?

লোকটা উদাস গলায় বলে···শিখে কি করবেন?

—শিখে রাখি। কখনও কাজে লেগে যেতে পারে।

—কিছুই কাজে আসে না। আমি শিখেছি বিস্তর কষ্ট করে। সাপুড়েরা তাদের মন্ত্রগুপ্তি নিজেদের মধ্যে ধরে রাখে। আমি এক ওস্তাদের পিছনে বছরখানেক ঘুরে শিখেছি। কিন্তু ব্যাপারটা এত সোজা যে অত কষ্টে শিখবার দরকারই নেই।

—কৌশলটা কি?

—সাপ কোথায় থাকে তার আন্দাজ যে করতে পারে তার অর্ধেক শেখা হয়ে গেল। তার পরেরটুকু হচ্ছে সাপ সম্বন্ধে ভয়টাকে উড়িয়ে দিয়ে একটু সাহস করা। আর ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় হাতের তেলোয় চেপে ধরা। কৈ মাছ ধরার মতই সোজা। সাপের দাঁত তার মুখে, সারা শরীরে তো নয়!

—আমাকে শেখাবেন?

—শেখাতে পারি।

—আমার কিন্তু পয়সা নেই।

লোকটা হাসে, বলে···আমার খাওয়ার সংস্থান আছে, সবকিছু বেচি না।

—যদি শেখান তো এদিকটায় কদিন থেকে যাই।

—সঙ্গের লোকেরা?

—ওরা আমার কেউ না।

লোকটা একটু থমকে যায়। কি যেন বলি বলি করেও বলে না। সুকুল চলতে চলতে অজান্তে নয়নের কাছে ঘেঁষে আসে। নয়ন তার দিকে একবার মিটিমিটি করে চায়। তারপর বাপ-ব্যাটাকে চমকে দিয়ে হঠাৎ কোকিল-ডাক ডেকে ওঠে। কুহু-কুহু করে তার অবিরল এবং অবিকল মিষ্টি ডাকটি উঠে উঠে নেমে আসে হঠাৎ। স্তম্ভিত বিস্ময়ে ছেলেটা দাঁড়িয়ে পড়ে! লোকটা মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

—আরে বাঃ। লোকটা বলে।

—আমাকে শিখিয়ে দেবে ? ছেলেটা জিজ্ঞেস করে।

—দেব। তার বদলে তোমরা যদি আমাকে থাকতে দাও।

—দেব। আমাদের বাড়িতে অনেক জায়গা। ছেলেটা লাফিয়ে গিয়ে তার বাবার হাত ধরে ঝুলে পড়ে…অনেক জায়গা, না বাবা ?

ওরা বাপ-ব্যাটা সামনে হাঁটছে, নয়ন পিছনে। লোকটা মুখ ঘুরিয়ে একবার নয়নকে দেখে নিয়ে বলল…এখানে থাকতে চান কেন ?

—এমনিই। জায়গাটা ভাল লেগে গেছে।

—কাজকর্ম কিছু করেন না ?

—না ডাক্তারী পড়তাম, ছেড়ে দিয়েছি।

—ছাড়লেন কেন ?

—পোষাল না।

—এখন তবে কি করে চলে ?

—চলে যায়। ওসব নিয়ে ভাবি না।

লোকটা একটু ভেবে বলে…এদিকে এসেছিলেন কেন ?

—চলে এলাম।

—ঐ মেয়েটা কে ?

—ও শ্যামা, আমার বহুকালের চেনা। আগে একই বাড়িতে ভাড়া থাকতাম। এখন দূরে চলে গেছে ওরা। আমি ওকে বিয়ে করতে চাই।

লোকটা তার ছেলের পিঠে হাত রেখে বলে…সুকুল বাবা, তুমি আগে আগে হাঁট।

সুকুল অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগিয়ে হাঁটে। লোকটা নয়নের পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলে…তাই জঙ্গলের মধ্যে জাপটে ধরেছিলেন ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে নয়ন জিজ্ঞেস করে…মোনা ঠাকুরের ওখানে বশীকরণ-টশীকরণ হয় ?

লোকটা হেসে বলে…হয়।

—বশীকরণ করতে কত টাকা লাগে ?

—ঠিক জানি না।

নয়ন সন্দেহের চোখে চেয়ে বলে…বশীকরণে কাজ হয় তো ? না হলে কিন্তু মোনা ঠাকুরের মন্দির আমি ভেঙে দিয়ে যাব।

লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে…মোনা ঠাকুরের মন্দির ভাঙা যায় না!

—কেন ?

আমি যেমন সাপ ধরি, মোনা ঠাকুর তেমনি মানুষ ধরে। আমি যেমন বিষ নিংড়ে দাঁত ভেঙে ছেড়ে দিই, তেমনি তিনিও মানুষের বিষ দাঁত তুলে নেন।

—হিপনোটিজ্‌ম্‌ না ?

—কে জানে !

—আমি নয়ন রায়। মোনা ঠাকুরদের মন্দির ভাঙতেই আমার জন্ম। বলে নয়ন একটু আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসে।

লোকটা বলে···আর যদি মোনা ঠাকুরের বশীকরণে কাজ হয়, যদি মেয়েটাকে বশ করতে পারেন তো কি করবেন ?

—তাহলেও ভাঙবো।

—কেন ?

নয়ন একটু হেসে বলে···শ্যামাকে বশ করতে যেমন চাই, তেমনি মোনা ঠাকুরদেরও উচ্ছেদ করতে চাই।

লোকটা একটু হেসে বলে···যদি দুনিয়া থেকে সব মোনা ঠাকুরের উচ্ছেদ করে দেন তাহলে আবার কাউকে বশীকরণ করার দরকার হলে মোনা ঠাকুরকে পাবেন কোথায় ?

—মোনা ঠাকুররা না থাকলে পৃথিবীর কোন ক্ষতি হবে না। থাকলে বরং ক্ষতি।

—তাহলে শ্যামার কি হবে ?

—কি হবে ?

—শ্যামাকে বশীকরণ করবে কে ?

—কেউ করবে না। তার দরকার হবে না। শ্যামাকে কেড়ে নেওয়ার মত জোর আমার আছে।

—তবে বশীকরণের কথা ভাবছেন কেন ?

খুব চিন্তান্বিত মুখে নয়ন বলে···ও এমনিই। মোনা ঠাকুরদের ক্ষমতা কতদূর তা একবার নিজের চোখে দেখতে চাই।

লোকটা হেসে বলে···কিছু ক্ষমতা আছে নিশ্চয়ই। উনি বান মারেন, মারণ উচাটন জানেন, বশীকরণ জানেন, কত জজ-ম্যাজিস্ট্রেট এসে ধুলোয় গড়ায়। মাটি থেকে আধ হাত উঁচুতে উঠে শূন্যে বসে জপ-তপ করেন তিনি। বলে লোকটা নয়নের দিকে হাসিমুখে চেয়ে থাকে।

নয়ন ভ্রূ কুঁচকে সামনের দিকে চেয়ে থাকে। চিন্তাকুটিল মুখ, খুব অন্যমনস্ক। লোকটার কথা তার কানে গেছে বলে মনে হয় না।

জঙ্গল ক্রমে শেষ হয়ে আসে। আম বাগানের শেষে একটা মাঠ কোনাকুনি পার হয়ে, একটা বড় পুরোনো দীঘির কালো জলে নিজেদের ছায়া ফেলে, উত্তরে কয়েকটা ঢিবি, গড়খাইয়ের মত জায়গা পেরিয়ে সুপুরি বাগান পায় তারা। সেই বাগান পেরলে একটা শ্যাওলা ধরা পুরোনো মন্দির দেখা যায়।

লোকটা নয়নের দিকে ঝুঁকে বলে—দেখেছেন! ঐ হচ্ছে মোনা ঠাকুরের অস্তানা।

নয়ন গম্ভীরভাবে বলে···হুঁ।

—লোকে কয় মাটির পুতুলা। কালী আমার মাটির পুতুলা। ঢ্যাস্ করে ফেলে দ্যান জলে, ভুস করে ডুবে যাবে। তো সব ঠিক। কিন্তু মায়ের গলার মালাখানা মোর ঘোরে কেন রে? বন বন করে ঘোরে কেন মালাখানা? হ্যাঁ? বলে মোনা ঠাকুর একটু হাসে।

মন্দিরের পাশে চৌকো ঘরখানা। সামনে বাঁধান চাতাল। সেখানে কয়েক জোড়া ছাড়া জুতো। চাতালের ওপাশে-বয়ঃসন্ধির মেয়েদের মত হিল্ হিলে শরীরের সুপুরিগাছের সারি। ঘেঁটুবন, আশশ্যাওড়া আর ভাটগাছের জঙ্গল। চারদিক কেমন ঠাণ্ডা, নিঝুম। শ্যামা আঁচলখানা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে বসে।

বাঁশের বেড়ার ওপর মাটির আস্তরণ, তাতে চুনকাম করে ঘরের দেয়াল তৈরী হয়েছে। ওপরে টিনের চাল, মেঝে বাঁধান। ছেঁড়াখোড়া শতরঞ্চি পাতা। কয়েকটা পাটির আসন। শতরঞ্চিতে মোনা ঠাকুর বসে আছে। গায়ের রঙ তামাটে, বড় বড় চুল, গালে ছাঁটা দাড়ি, তাতে সাদা ছোপ ধরে এসেছে। মুখখানা লম্বাটে, ভাঙা, কিন্তু তার একটা কমনীয় সৌন্দর্য আছে। হাসলে মোনা ঠাকুরকে খুব সরল মনের লোক মনে হয়, গম্ভীর হলে মনে হয় চিন্তাশীল। খালি গায়ে পৈতেটা খুব সাদা দেখায়। বুকে, হাতে, কাঁধে, কানে, নাকে প্রচুর লোম। শরীরের বাঁধুনি কৃশ, কিন্তু শক্ত। পরনে পরিষ্কার একখানা ধুতি। পাশে বিড়ির বাণ্ডিল আর দেশলাই। মোনা ঠাকুরের মুখে বিড়ি নেভে না। একটা ফেলেই আর একটা ধরায়।

মোনা ঠাকুরের একেবারে সামনে দুটো পাটিতে বাবা আর মা বসে আছে। আশেপাশে আরও দু-চারজন গাঁইয়া লোক। তাদের মুখ চোখ হাবাগোবা, চোখে ভয় আর ভক্তি।

দরজার পাশে একটা পাটিতে বসে ছিল শ্যামা। তার মন ভাল নেই। একটু অন্যমনস্ক হয়ে সে মোনা ঠাকুরের দিকে চেয়েছিল।

মোনা ঠাকুর একটু দুলে বলে—লোকে বলে মাটির পুতুলা। তো তাই। তবু কালী আমার হাঁটে চলে, খায়-দায়, চুল ফেরায়, চান করে, আমার কালীর মন খারাপ হয়, কাঁদে হাসে। পাগ্‌লি।

বাইরে একটা মেঘের ছায়া পড়েছে। চাপ বাঁধা গাছপালা আর জঙ্গল। দিনের বেলায়ও প্রবল ঝিঁঝিঁ ডাকছে। গাছপালাগুলো অন্ধকার সব ছায়া ফেলেছে। ঐ আলো-আঁধারির কোথাও নয়ন লুকিয়ে আছে। সারা রাস্তা যত পাখির ডাক শুনেছে শ্যামা, যত দূরাগত শব্দ শুনেছে তত সে চমকে উঠেছে। মনে হয়েছে, পাখি নয়, নয়ন। সব শব্দই করছে নয়ন। সেই হরবোলা তার বিচিত্র সব শব্দ তুলে শ্যামার চারিদিকে একটা জাল তৈরী করছে। শ্যামার মন ভাল লাগে না।

মোনা ঠাকুর বাবার দিকে চেয়ে বলে...বাবুমশায়, আপনি কি ছেলের খবরের জন্য এসেছেন?

একটু চমকে ওঠে শ্যামা। লোকটা জানল কি করে? তারা যে দাদার খবরের জন্য এসেছে তা তো বলে নি।

বাবা একটু স্তব্ধ হয়ে তারপর ধরা গলায় বলে···আজ্ঞে হ্যাঁ ঠাকুর-মশাই। আপনি তো অন্তর্যামী।

মোনা ঠাকুর মাথা নেড়ে বলে···অষ্টসিদ্ধির দুটো সিদ্ধি হলেই এসব বলা যায়। কিছু না বাবুমশাই। লোকের চোখে মুখে সমিস্যের কথা লেখাই থাকে। সেটা পড়ার মত অক্ষরজ্ঞান থাকলেই হল। ওই মেয়েটি কি আপনারই?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মোনা ঠাকুর হেসে বলে···তা মেয়ের মুখ অত ভার কেন? এ জায়গা ভাল লাগছে না মা? ভয় করছে?

শ্যামা মাথা নেড়ে জানায়, না। তারপর একটু হাসে।

—ভয় নেই মা, আমার কালীমায়ের আওতায় বিপদ-আপদ নেই। সাপখোপের মুখে আপনা থেকেই বন্ধন পড়ে যায়, চোর বদমাশরা অসাড়

হয়। যাও মা, ঘুরে টুরে জায়গাটা দেখে এস। পশ্চিমে একটা সুড়ঙ্গ আছে, অনেকটা যাওয়া যায় ভিতরে, দক্ষিণে শিবমন্দির আছে। দাঁড়াও, সঙ্গে লোক দিচ্ছি। বলে মোনা ঠাকুর ভিতরবাড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকে...তারা, ওরে তারা···

ডাক শুনে উনিশ বছরের একটা লালপেড়ে শাড়িপরা লাজুক মেয়ে এসে ভিতরের দরজায় দাঁড়ায়।

—এই মাকে নিয়ে যা তো, সব দেখিয়ে আন। যাও মা, ঐ আমার মেয়ের সঙ্গে যাও। কোন ভয় নেই।

শ্যামা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। উঠে পড়ে। অনেকক্ষণ ধরে তার মন থম ধরে আছে। মুখে কতকগুলি উষ্ণ স্পর্শ এখনও ফোস্কার মত লেগে আছে। মন ভাল নেই।

কোথায় একটা বেড়াল কাঁদছে। মেয়েটির সঙ্গে বাইরে যাবে বলে পা বাড়িয়েও থেমে গেল শ্যামা। নয়ন! নয়ন নয় তো? আতঙ্কিত মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল···ওটা কি ডাকছে?

মেয়েটি মুগ্ধ চোখে তাকে দেখছিল, হেসে বলল···বেড়াল। আমাদের বেড়ালের বাচ্চা হারিয়ে গেছে, কাঁদছে কাল থেকে।

চাতালে পা দিতেই বাতাস লাগল। বাতাসটা হিম। চারদিকে বেশী গাছপালার জন্যই বোধ হয়।

শ্যামা বলল ··তবে যে শুনলাম, মোনা ঠাকুর বললেন, এখানে কোন অমঙ্গল হয় না! বেড়ালটার বাচ্চা তাহলে চুরি গেল কেন?

মেয়েটি খুবই সাধারণ। গিন্নি-বান্নির মত ঢিলে করে ফেরতা ঘুরিয়ে শাড়ি পরেছে। কপালে তেল সিঁদুরের বড় একটা টিপ। সিঁথি সাদা। মুখে সরলতা আর বিস্ময়। শ্যামার সাজগোজ দেখছে বার বার। প্রশ্ন শুনে চোখ দুটো বড় করে বলে—মানুষকে সাহস দেওয়ার জন্য বাবা অনেক সময় ওরকম সব কথা বলেন। নইলে এখানেও কত ঘটনা হয়। আমারই এক ভাই তো চার বছর আগে কলেরায় মারা গেছে!

—তাহলে কি ওসব মিথ্যে কথা?

মেয়েটা ঠিক-ঠাক জবাব দিতে পারে না। কিন্তু সরল মুখে সে খুব হাসে। তারপর বলে...না, বাবা ঠিক মিথ্যে কথাও বলে না। যার বিশ্বাস আছে তার অমঙ্গল হয় না।

—তবে আপনার ভাই মারা গেল কেন? মোনা ঠাকুরের তো বিশ্বাস

আছে।

মেয়েটা হেসেই বলে···ওসব আমি ঠিক বুঝি না। বাবা আমাদের সঙ্গে তো বেশী কথা বলে না। কি করে জানব বলুন! আমরা শুধু জানি, বাবার কাছে অনেক লোক আসে, বাবা তাদের অনেক সমস্যার সমাধান করে দেয়।

শ্যামা চাতালের সিঁড়িতে পা দিয়ে বলে···কালীর গলার মালা সত্যিই ঘোরে?

মেয়েটা বলে···আমরা তো ওসব দেখতে পাই না। বাবা যখন পুজো করে তখন মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকে। আপনি কিন্তু খুব সুন্দর।

—যাঃ, আমি তো কালো।

—খুব কালো না। তবে ফর্সা হলে আপনি ঠিক রাণীর মত হতেন।

—আজকাল কলকাতায় গয়না পরার চল নেই, না?

—কেন?

—আপনি তো পরেন নি।

—আমার বেশী গয়নাই নেই। তাছাড়া দিনকাল তো ভাল না, গয়না পরলে যদি চোর-ডাকাত পিছু নেয়?

—আপনি যা সুন্দর! চোর-ডাকাত না হোক ছেলে-ছোকরা পিছু নেবেই।

শ্যামা একটু গম্ভীর হয়ে যায়।

—আপনি এটা কি শাড়ি পরেছেন? শিফন?

—না, এটা কমদামী শাড়ি। রাসো।

মেয়েটার হাসি তার চোখেও উপচে পড়ে। সে মিটমিটে হাসিচোখে চেয়ে বলে...আমাদের কিন্তু ওসব জোটে না। পুজোর শাড়িই পরি আমরা। এই দেখুন না পরে আছি, লালপেড়ে। তার ওপর আবার খাটো।

বলে খুব হাসে। শ্যামার তক্ষুনি মেয়েটাকে ভাল লাগতে থাকে। সে সমবেদনার গলায় জিজ্ঞেস করে···কেন, ভাল শাড়ি আপনার পরতে নেই?

—বাবা পরতে দেয় না, কিনে দেওয়ারও লোক নেই।

—গ্রামদেশে ভাল শাড়ি পাওয়া যায় না?

মেয়েটা মাথা হেলিয়ে বলে···খুব যায়। কলকাতায় নতুন শাড়ি বেরোলে তিনদিনের মধ্যেই এদিকে চলে আসে। গাঁয়ের মেয়েরা সবাই পরে। আমরা ঠাকুরবাড়ির মেয়ে তো, আমাদেরই জোটে না।

—মন খারাপ লাগে, না ?

—লাগবে না ? সাজগোজ করার বয়সই তো এটা, নয় ?

শ্যামা একটু হেসে বলে···বিয়ে হলে পরবেন, তখন তো আর বাধা থাকবে না।

—বিয়ে কে দিচ্ছে !

—কেন ?

—বাবা তার কালী ছাড়া কিছু বোঝেই না। আমি কত বড়টা হয়ে যাচ্ছি কে খেয়াল রাখে ! মা ভয়ে বিয়ের কথা তোলে না। এই করেই আমার দিদি একটা বাজে ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেল।

শ্যামা একটু থমকে গিয়ে বলে···সে কী !

—সত্যিই।

শ্যামা একটু হেসে বলে···তবে তো মোনা ঠাকুরেরই সমস্যা অনেক !

মেয়েটা মাথা নেড়ে বলে···না। বাবার কোন সমস্যা নেই।

—এগুলোই তো সমস্যা। যার বেড়ালের বাচ্চা মরে যায়, মেয়ে পালিয়ে যায়, সে-ই তো সত্যিকারের দুঃখী লোক। সে কি করে অন্যের ভাল করবে ?

মেয়েটা একটু উদাস গলায় বলে···কিন্তু তবু বাবার কোনও সমস্যা নেই।

কেন ?

মেয়েটা মুখে আঁচল দিয়ে হেসে বলে···আসলে আমরা তিন বোন, আমার মা, আমাদের মরা ভাইটা, আমাদের বেড়াল···এরা আবার কেউ না। বাবা হচ্ছেন মোনা ঠাকুর···মস্ত ভক্ত সাধু। আর আমরা, তার পরিবারের লোকেরা হচ্ছি এই আপনাদের মতই বাইরের লোক, বদ্ধ জীব। বাবার কাছে আপন পর বলে ভেদ নেই। যেদিন আমার ভাই মারা যায় সেদিন বাবার পায়ে একটা কাঁটা ফুটেছিল। বাবা ঐ চালাতে বসে লেবু-কাঁটা দিয়ে সেই কাঁটা তুলছিল। দৌড়ে গিয়ে যখন বাবাকে খবর দিলাম তখনও কাঁটা তোলা হয় নি। বাবা খবরটা শুনল, তারপর আস্তে আস্তে

খুঁটে কাঁটা তুলল, তারপর ভিতর বাড়িতে গেল।

শ্যামা বলে…সে কী!

মেয়েটা হাসে, বলে…সত্যি বলছি। বাবার কোন সমস্যা নেই। আপনাদের সঙ্গে যেমন সুরে কথা বলেন, আমাদের সঙ্গেও তেমন করেই কথা বলেন। আমরা বাবাকে মোনা ঠাকুর বলেই চিনি, বাবা বলে নয়।

চাতাল পেরিয়ে একটা মাঠ মত। দক্ষিণে দ্বাদশ শিবের মন্দিরের গা ভেদ করে অশ্বত্থ গাছ গজিয়েছে। মন্দিরের গায়ে শ্যাওলা।

—এসব মন্দির কি বহু দিনের পুরোনো?

—কয়েক শো বছর বোধ হয়। শিব মন্দিরে তক্ষক ডাকে। মেয়েটা হেসেই বলে।

—সুড়ঙ্গটা কোন্ দিকে?

—পশ্চিম দিকে। দেখবেন? নাকি এমনি বেড়াবেন?

শ্যামা মেয়েটির দিকে চায়। সরল সোজা মুখ, অকপট চোখ। কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু টের পাওয়া যায়, এই মন্দির, মোনা ঠাকুর, এ সবের ওপর মেয়েটির কোন টান নেই। মেয়েটা এই মন্দিরের দেবতা বা তার পুজারীকে গ্রহণ করে নি।

শ্যামা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে…আপনি আপনার বাবার সবকিছু বিশ্বাস করেন না?

মেয়েটা চোখ বড় করে হেসে বলে…করব না কেন? আপনাদের যেমন বিশ্বাস আমাদেরও তেমনই বিশ্বাস। তবে…মেয়েটা চুপ করে থাকে।

—তবে কি?

—বলছিলাম, আমার ভাই মরে যাওয়ার দিন ঐ যে বাবাকে পায়ের কাঁটা তুলতে দেখেছিলাম ওটা কখনো ভুলতে পারি না। একজন মরে যাচ্ছে, আর বাবা কাঁটা তুলছে, কেমন যেন মনে হয়। ঠিক যেন সংসারের একটা কাঁটা বাবা তুলে ফেলছে। এরকম করে ভাবলে ভয় করে।

শ্যামার বুকের ভিতরটা গুড় গুড় করে। সে আস্তে করে বলে—কিন্তু বাবার মুখ দেখে উনি কিন্তু ঠিকই বলেছিলেন আমরা কার খোঁজে এসেছি।

—মেয়েটা কিন্তু কোন কৌতূহল দেখায় না। কেবল বলে…বাবা তো সবই ঠিক বলে। আমরা জানি। নইলে লোকে আসবে কেন?

—অনেক লোক আসে ?

—অনেক। ছুটির দিন হলে এ সময়টায় লোক গিজ গিজ করে। কলকাতা থেকেই বেশী আসে।

শ্যামা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—আমার এক দাদা পাঁচ বছর হল হারিয়ে গেছে।

মেয়েটা উত্তর দেয় না মাথা নিচু করে হাঁটে। শ্যামার তখন মনে পড়ে, এ মেয়েটার ভাই মরে গেছে, একটা মাত্র ভাই। এর দুঃখ আরও বেশি হওয়ার কথা। তার দাদা বেঁচে থাকলেও থাকতে পারে। এ মেয়েটার ভাই নিশ্চিত ভাবে মারা গেছে।

শিব মন্দিরের পাশে একটা টিউবওয়েল দেখে শ্যামার তেষ্টা পায়। বলে…একটু জল খাব ?

—আমি বাড়ি থেকে এনে দেব ?

—না, না। ঐ তো টিউবওয়েল !

—আঁজলা করে খেতে অসুবিধে হবে না ?

—দূর।

—তবে চলুন আমি কল টিপে দিই। এখানকার জল খুব মিষ্টি।

জল খাওয়ার সময়ে নিচু হয়ে শ্যামা হঠাৎ শুনতে পেল, কোকিল ডাকছে। সারা গায়ে কাঁটা দিল তার। মুখ তুলে বলল…কি ডাকছে ?

—ওমা ! কোকিল। মেয়েটা হেসে গড়িয়ে পড়ে।

শ্যামা স্থির হতে পারে না ! প্রশ্ন করে…সত্যিকারেব কোকিল।

—তা নয় তো কি ?

—অনেক সময়ে মানুষ কোকিলের মত ডাকতে পারে।

মেয়েটা মুখে আঁচল তুলে বলে…এখানে কে আবার মানুষ কোকিল ডাকতে আসবে ? আমি জন্ম থেকে কোকিলের ডাক শুনছি। এ সত্যি-কারের কোকিলের ডাক।

শ্যামা জল খেয়ে আঁচলে মুখ মুছে বলে…আমি একজনকে জানি যে হুবহু কোকিলের মত ডাকে। ধরা যায় না যে মানুষ ডাকছে।

মেয়েটা শ্যামার দিকে চেয়ে বলে…কিন্তু এ মানুষের ডাক নয়। ঐ শিমুল গাছে কোকিল বসেছে। সারা দিনই ডাকে। আমি চিনি ঐ ডাক।

চারদিকে ঝোপ-ঝাড় আর গাছে বাতাস বয়ে যাওয়ার শব্দ হয়। রোদের মুখ থেকে মেঘ সরে গেছে। তবু এইখানে রৌদ্রের ততদূর

উজ্জ্বলতা নেই। গাছের ছায়ারা পড়ে আছে। শ্যামা তার মুখে গালে নয়নের স্পর্শ ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করে।

—সুড়ঙ্গটা দেখবেন? মেয়েটা জিজ্ঞেস করে।

—চলুন, দেখি। কখনো দেখিনি।

দেখার কিছু নেই। মেয়েটা উদাসভাবে বলে···আমরা তো জন্ম থেকে দেখছি।

—এ সবই কি আপনাদের সম্পত্তি?

—না। দেবত্র। এক জমিদার দেবত্র করেছিল। তার আর বংশ নেই। আমাদের কিছু ব্রহ্মত্র জমি আছে। আমরা এই মন্দিরের চার পুরুষের পুরুত।

—এখানেই জন্মেছেন?

মেয়েটা হেসে বলে—তবে আর কোথায় ব

—ভাল লাগে এ জায়গা?

মেয়েটা মাথা নেড়ে বলে···একদম না। অন্য কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে। কেউ যদি নিয়ে যেতে চায় চলে যাব।

শ্যামা হেসে ফেলে। বলে···এ জায়গার ওপর আপনার এত রাগ কেন?

মেয়েটা হেসে বলল···আপনার মত একটা রঙীন সুন্দর শাড়ি পরতে ভীষণ ইচ্ছে হয়, জানেন!

শ্যামা একটা শ্বাস ফেলে। তারা নরম ঘাসের ওপর দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে হাঁটে।

মেয়েটা বলে··খুব সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করে। বাসে-ট্রামে মোটরগাড়িতে চড়তে ইচ্ছে করে, রেডিও শুনতে ইচ্ছে করে।

—এখানে কিছু নেই?

মেয়েটা অন্যমনস্ক ভাবে বলে···মাঝে মাঝে অমাবস্যার পুজোয় এই মাঠে সিনেমা দেখান হয়। যাত্রাওলারা আসে। অনেক বছর আগে একটা সার্কাসও এসেছিল। এই সার্কাসের একটা লোক খেলা দেখাত, তাকে সিংহ থাবা দেয়। সার্কাসের লোকেরা তাকে এইখানেই ফেলে গেল। সে এখনও আছে। ঐ দিকে মন্দিরের উত্তরে বাঁশঝাড়টার পিছনে থাকে। বাবা দেখতে পারে না।

—কেন পারে না?

—এই গাঁয়ের সে-ই একমাত্র লোক যে এ মন্দিরে আসে না।

—কেন?

মেয়েটা ম্লান একটু হাসে। বলে···তার একটা ছেলে আছে। তার বৌ ছেলের জন্ম দিয়েই মারা যায়। বাবা বলে, ছেলেটা ঐ লোকটার নয়! কী ঘেন্নার কথা বলুন! কিন্তু লোকটা বলে যে ছেলেটা তারই। এই নিয়ে ঝগড়া। বলে মেয়েটা আবার হাসে মুখে আঁচল দিয়ে।

তারপর আবার বলে···এখানে কিছু নেই। কেবলই মনে হয়, আমাদের একটা আদ্যিকালের পোড়ো অন্ধকার জায়গায় ফেলে রেখে চারদিকে পৃথিবীটা এগিয়ে যাচ্ছে। কলকাতা থেকে কত লোক আসে, তাদের যত দেখি তত ঐ কথা মনে হয়। বাবা তাদের দুঃখের কথা শোনে, আর আমি দেখি তাদের পরনে কত রঙীন কাপড়ের পোশাক, কী রকম ঝলমলে মুখ চোখ, কেমন দূর মাখানো তাদের চেহারায়!

শ্যামা হাসি চেপে বলে···কিন্তু এ তো কলকাতা থেকে খুব দূর নয়।

মেয়েটা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে···দূর কেন হবে। কত লোক এখান থেকেও চাকরি করতে যায় রোজ, কিংবা সিনেমা দেখে আসে, কেনাকাটা করতেও যায়। কাছেই একটা দুটো শহরও তো আছে। কিন্তু আমরা ঠাকুরবাড়ির মেয়ে বলেই কোথাও যাওয়া হয় না।

মেয়েটা থেমে গিয়ে বলে—ঐ হচ্ছে সুড়ঙ্গের রাস্তা।

একটা উঁচু বেদীর মত বাঁধানো জায়গা! চারটে থাম, ওপরে সুন্দর একটা চুড়োওয়ালা ছাদ। ছাদের নিচে একটা ছোট ঘর, তার দরজাটা খোলা। মেয়েটা সেদিকে চেয়ে বিস্বাদ মুখে বলে···ঐ। যাবেন?

—কতদূর গেছে সুড়ঙ্গটা?

—বেশি দূর নয়। একটু গিয়েই দেখবেন ছাদ ভেঙে পড়েছে, ইঁটের ডাঁই, আর আগাছা। বাঁশবেড়ের হংসেশ্বরীর মন্দিরে এরকম সুড়ঙ্গ আছে, শুনেছি।

—সাপখোপ নেই তো।

মেয়েটা মুখে আঁচল তুলে হেসে বলে···কত কী আছে! আমরা ছেলেবেলায় চোর-চোর খেলতে যেতাম ওর ভিতরে। বড় হয়ে আর যাই না। অনেকে গুপ্তধনের লোভে খুব খোঁড়াখুঁড়ি করত একসময়ে। কেউ কিছু পায় নি।

শ্যামা হেসে বলে···আমরা যদি কিছু পেয়ে যাই?

মেয়েটা হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ে।

ঘরে ঢুকে প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়েই শ্যামা থেমে পড়ে। সামনে গভীর অন্ধকারে নেমে গেছে সিঁড়ি। একটা চামচিকে ডেকে ওঠে।

—অন্ধকার যে!

—কোন ভয় নেই। আমি আগে যাচ্ছি।

মেয়েটা শ্যামাকে পেরিয়ে আগে আগে নামে। শ্যামা পিছনে। আবার হঠাৎ চামচিকে ডেকে ওঠে। এবার একটু দূর থেকে।

মেয়েটা থমকে মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে—আপনার নাম কি?

—শ্যামা।

মেয়েটা হাসে, বলে···আমার নাম তারা।

—জানি।

—আমাদের নামের একই অর্থ।

শ্যামা মাথা নাড়ে হাসে।

—শ্যামার মন্দিরেই আপনি এসেছেন। অন্ধকারকে কি খুব ভয় শ্যামাদি?

শ্যামা অপ্রতিভ ভাবে হেসে বলে···আমরা তো ভাই শহরের মানুষ, অন্ধকারকে একটু ভয় পাই।

—তবে থাক, গিয়ে কাজ নেই।

—কেন?

—আমার কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে। অনেকদিন নামি নি কিনা!

গভীর অন্ধকার তলদেশ থেকে হঠাৎ একটা টিকটিকি ডেকে ওঠে। শ্যামা উৎকর্ণ হয়ে শোনে।

তিন চার ধাপ সিঁড়ি নেমে গলা পর্যন্ত অন্ধকারে দুজনে একটু দাঁড়িয়ে রইল। সামনে তারা, পিছনে শ্যামা।

তারা একটা শ্বাস ফেলে বলল···আপনার কি নামতে খুব ইচ্ছে করছে?

শ্যামা মাথা নেড়ে বলল···না। বলে সে উঠতে লাগল।

ওপরে এসে, ফাঁকা জায়গায় এবং আলোতে মেয়েটাকে বিমর্ষ দেখাল। শ্যামার দিকে চেয়ে সে বলল···জানেন, আমার সেই ভাইটা মরে যাওয়ার পর থেকেই আমি কেমন যেন ভয়-ভয় পাই। নির্জনে বা অন্ধকারে থাকতে পারি না! কিছু মনে করলেন না তো শ্যামাদি?

সুড়ঙ্গটা দেখার খুব ইচ্ছে ছিল আপনার।

শ্যামা অন্যমনস্ক ছিল। খুব অন্যমনস্ক। আসল ডাক আর নকল ডাকের পার্থক্য বোঝা যে কী মুশকিল! সে তারার কথার উত্তর দিল না।

এখনও বেলা আছে। সূর্যের আলো আরও কিছুক্ষণ থাকবে। কেবল পশ্চিমের আকাশে একটা ধোঁয়াটে অস্বচ্ছতা ঘুলিয়ে উঠছে। নিবিড় গাছপালার ওপর দিয়ে একটা বিবর্ণ আকাশ দেখা যায়। এই ঋতুতে এ রকম হয়। মাটির তাপ ওঠে, কুয়াশা জমে, স্থির বাতাসে ধুলো ভেসে থাকে। সেই অস্বচ্ছতার আড়ালে সূর্যকে পরিষ্কার গোল চাঁদের মত দেখা যায়। উজ্জ্বলতা নেই তার। চারপাশে আকাশের সেই অস্বচ্ছতা এক রকম ছায়া ফেলেছে।

মোনা ঠাকুর তার আসন ছেড়ে উঠে গেছে। মা আঁচলে চোখ মুছছে। বাবা স্তব্ধ হয়ে বসে। শ্যামা গিয়ে তার মায়ের পাশে বসল।

—কি হল মা ?

মা বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে ধরল তাকে…যদি সত্যি হয় শ্যামা, তবে আমি কালীর সোনার চোখ গড়িয়ে দেব।

—কী হয়েছে বল না!

মা মোনা ঠাকুরের শূন্য আসনটার দিকে চেয়ে ধরা গলায়…ঘলে ও নাকি বেঁচে আছে। হৃষিকেশ বা হরিদ্বারের দিকে আছে। সন্ন্যাসী হয়েছে, মাথার অসুখ নেই।

বাবা একটা শ্বাস ফেলে বলে—আমি ডেফিনিট্ হতে পারছি না!

মা চোখ থেকে আঁচল সরিয়ে ঝেঁঝে উঠে বলে…আমরা কিছু বলার আগেই উনি কি করে বুঝলেন যে আমরা ছেলের কথা জানতে এসেছি। তুমি তোমার ডেফিনিট্ নিয়ে থাকো গে। আমি হৃষিকেশ যাবো।

বাবা মৃদু স্বরে বলে—এসব বিষয়ে সিওর হওয়া যে কী মুশকিল তা তুমি পুরুষ হলে বুঝতে। এত বছর অপেক্ষা করার পর আশা করতে ভরসা পাই না।

মা বলে…তুমি না পাও আমি পাচ্ছি।

বাবা চুপ করে থাকে।

শ্যামার ভিতরটা মুচেখে ওঠে ব্যথায়। আবার আনন্দেও। দাদা কি

আবার ফিরে আসবে ! দাদা কি বেঁচে আছে ! আবার ফিরে যদি আসে, যদি আবার প্যাণ্ট-শ্যার্ট পরে, আড্ডা মারতে বেরোয়, যদি আবার খাওয়া নিয়ে মার সঙ্গে ঝগড়া করে ! যদি আবার আগের মত তারা চারজন রাতের খাওয়ার পর লুডো বা তাস নিয়ে বসে ! কত চাল চুরি করত দাদা, মা দেখেও দেখত না। আবার কি সে সব হবে ঠিক আগেকার মত ! ঠিক বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। শ্যামা মনে মনে ধরেই নিয়েছিল, দাদা নেই। কোন নদীর পাড়ে, বা রেললাইনের ধারে, কিংবা বড় মাঠের মধ্যে সেই পাগল মানুষটা শেষ হয়ে পড়ে আছে···এ রকমটাই মনে হত তার, মাঝরাতে ঘুম ভেঙে ধক্ করে কেঁপে উঠত বুক ! বাবা প্রায় সময়েই বলত···দ্যাখো গে, কোথাও ভিক্ষে-টিক্ষে করছে বোধ হয়। মার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, দাদা সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। মায়ের কথা, বাড়ির কথা সে ভুলে গেছে বলেই আসছে না। একদিন ঠিক ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মত ফিরে আসবে। আবার 'মা' বলে ডাকবে, বিয়ে করবে, চাকরি করবে··· । শ্যামার ঠিক বিশ্বাস হয় না। এ সব তো সিনেমায় হয়, গল্পে হয়, কিন্তু তার দাদার বেলায় হবে কি ?

তাকে কাছে টেনে, আদর করে, কপালের চুল সরিয়ে দিয়ে গাঢ় আনন্দের স্বরে মা বলল···শ্যামা, একটু পরেই সন্ধে লেগে যাবে মা, আমরা আরতিটা দেখে যাব।

—দেরি হয়ে যাবে না ?

—হোক গে। এ বড় জাগ্রত দেবতার স্থান ! একটু থাকি।

বাবা বিড় বিড় করে বলে···দিনকাল ভাল নয়।

মা বড় চোখে বাবার দিকে চায়। বাবা মুখ ফিরিয়ে নেয়।।

২

উদাস একখানা মাঠ। শেষ বেলার বার্লি'রঙের আলো পড়ে আছে। একখানা টিনের দোচালার দাওয়ায় বসে বাপ-ব্যাটা।

ছেলে মুখে তুলে বলে···বাবা, দাদুবুড়ো কেমন করে হাঁটে।

—দাদুবুড়োর কোমর বাঁকা, কুঁজো হয়ে মাজায় হাত রেখে হাঁটে।

—কামড়ায় না।

—কামড়ায়।

—কেমন লাগে ?

—লাগে না। দাদুবুড়োর দাঁত নেই তো, কেবল মাড়ি !

কামড়ালে কাতুকুতু লাগে।

সুকুল হেসে গড়িয়ে পড়ে। তার বাবা হাসতে গিয়ে দেখে, কোনাকুনি মাঠ পার হয়ে নয়ন আসছে। কোকিল ডাক। কোকিলের ডাকই নয়নের বেশি প্রিয়।

সে কাছে আসতেই ছেলের বাপ হাসে, বলে…শ্যামাপাড়ির ডাক পারেন না ?

নয়ন খুব গম্ভীর। মাথা নাড়ে। না।

—কি হল ওখানে ?

—কিছু না। এখানে আরতি হবে।

—বসুন।

নয়ন দাওয়ার একধারে বসে। সুকুল উঠে তার দিকে চায়।

—কোথায় গিয়েছিলে ?

কল্পতরুর মন্দিরে।

মোনা ঠাকুর ভীষণ রাগী। কামড়ায়।

নয়ন কেবল মৃদু একটু হাসে।

—তুমি আমাকে কখন পাখীর ডাক শেখাবে ?

—কাল থেকে শেখাব।

—আমি ঘুমোলে চলে যাবে না তো ?

—না।

সুকুল নিশ্চিন্ত মনে তার বাবার দিকে চেয়ে বলে…বাবা, সিংহটা তোমাকে কেমন করে থাবা দিয়ে মেরেছিল বল।

লোকটা নয়নের দিকে চেয়ে হাসে। বলে…এই গল্প ও কতবার শুনেছে, তবু রোজ শুনবে ?

নয়ন ঝুঁকে বলে…কি গল্প ?

—গল্প না। একটা ঘটনা।

—আপনাকে সিংহ থাবা দিয়েছিল ?

লোকটা উদাস গলায় বলে…সিংহ কি না কে জানে। আদুবুড়ো বলত, সেটা কেশরী বাঘ।

—সেটা কি ?

—সিংহই আসলে। তবে গাউস সাহেবের গরিব সার্কাসে আর কত বড় সিংহ হবে! আদুবুড়ো বলত…আসল সিংহ হয় গহীন

লোকটা হাসে! ছেলেটাও খি-খি করে হাসে, বলে···ঘেমো-গন্ধ বাবা, কি বলছে দ্যাখো!

—আমাকে সাপ ধরা শিখিয়ে দেবেন?

লোকটা উদাস গলায় বলে···শিখে কি করবেন?

—শিখে রাখি। কখনও কাজে লেগে যেতে পারে।

—কিছুই কাজে আসে না। আমি শিখেছি বিস্তর কষ্ট করে। সাপুড়েরা তাদের মন্ত্রগুপ্তি নিজেদের মধ্যে ধরে রাখে। আমি এক ওস্তাদের পিছনে বছরখানেক ঘুরে শিখেছি। কিন্তু ব্যাপারটা এত সোজা যে অত কষ্টে শিখবার দরকারই নেই।

—কৌশলটা কি?

—সাপ কোথায় থাকে তার আন্দাজ যে করতে পারে তার অর্ধেক শেখা হয়ে গেল। তার পরেরটুকু হচ্ছে সাপ সম্বন্ধে ভয়টাকে উড়িয়ে দিয়ে একটু সাহস করা। আর ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় হাতের তেলোয় চেপে ধরা। কৈ মাছ ধরার মতই সোজা। সাপের দাঁত তার মুখে, সারা শরীরে তো নয়!

—আমাকে শেখাবেন?

—শেখাতে পারি।

—আমার কিন্তু পয়সা নেই।

লোকটা হাসে, বলে···আমার খাওয়ার সংস্থান আছে, সবকিছু বেচি না।

—যদি শেখান তো এদিকটায় কদিন থেকে যাই।

—সঙ্গের লোকেরা?

—ওরা আমার কেউ না।

লোকটা একটু থমকে যায়। কি যেন বলি বলি করেও বলে না। সুকুল চলতে চলতে অজান্তে নয়নের কাছে ঘেঁষে আসে। নয়ন তার দিকে একবার মিটিমিটি করে চায়। তারপর বাপ-ব্যাটাকে চমকে দিয়ে হঠাৎ কোকিল-ডাক ডেকে ওঠে। কুহু-কুহু করে তার অবিরল এবং অবিকল মিষ্টি ডাকটি উঠে উঠে নেমে আসে হঠাৎ। স্তম্ভিত বিস্ময়ে ছেলেটা দাঁড়িয়ে পড়ে! লোকটা মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

—আরে বাঃ। লোকটা বলে।

—আমাকে শিখিয়ে দেবে ? ছেলেটা জিজ্ঞেস করে।

—দেব। তার বদলে তোমরা যদি আমাকে থাকতে দাও।

—দেব। আমাদের বাড়িতে অনেক জায়গা। ছেলেটা লাফিয়ে গিয়ে তার বাবার হাত ধরে ঝুলে পড়ে…অনেক জায়গা, না বাবা ?

ওরা বাপ-ব্যাটা সামনে হাঁটছে, নয়ন পিছনে। লোকটা মুখ ঘুরিয়ে একবার নয়নকে দেখে নিয়ে বলল…এখানে থাকতে চান কেন ?

—এমনিই। জায়গাটা ভাল লেগে গেছে।

—কাজকর্ম কিছু করেন না ?

—না ডাক্তারী পড়তাম, ছেড়ে দিয়েছি।

—ছাড়লেন কেন ?

—পোষাল না।

—এখন তবে কি করে চলে ?

—চলে যায়। ওসব নিয়ে ভাবি না।

লোকটা একটু ভেবে বলে…এদিকে এসেছিলেন কেন ?

—চলে এলাম।

—ঐ মেয়েটা কে ?

—ও শ্যামা, আমার বহুকালের চেনা। আগে একই বাড়িতে ভাড়া থাকতাম। এখন দূরে চলে গেছে ওরা। আমি ওকে বিয়ে করতে চাই।

লোকটা তার ছেলের পিঠে হাত রেখে বলে…সুকুল বাবা, তুমি আগে আগে হাঁট।

সুকুল অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগিয়ে হাঁটে। লোকটা নয়নের পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলে…তাই জঙ্গলের মধ্যে জাপটে ধরেছিলেন ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে নয়ন জিজ্ঞেস করে…মোনা ঠাকুরের ওখানে বশীকরণ-টশীকরণ হয় ?

লোকটা হেসে বলে…হয়।

—বশীকরণ করতে কত টাকা লাগে ?

—ঠিক জানি না।

নয়ন সন্দেহের চোখে চেয়ে বলে…বশীকরণে কাজ হয় তো ? না হলে কিন্তু মোনা ঠাকুরের মন্দির আমি ভেঙে দিয়ে যাব।

লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে…মোনা ঠাকুরের মন্দির ভাঙা যায় না !

—কেন ?

আমি যেমন সাপ ধরি, মোনা ঠাকুর তেমনি মানুষ ধরে। আমি যেমন বিষ নিংড়ে দাঁত ভেঙে ছেড়ে দিই, তেমনি তিনিও মানুষের বিষ দাঁত তুলে নেন।

—হিপনোটিজ্‌ম্‌ না ?

—কে জানে !

—আমি নয়ন রায়। মোনা ঠাকুরদের মন্দির ভাঙতেই আমার জন্ম। বলে নয়ন একটু আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসে।

লোকটা বলে···আর যদি মোনা ঠাকুরের বশীকরণে কাজ হয়, যদি মেয়েটাকে বশ করতে পারেন তো কি করবেন ?

—তাহলেও ভাঙবো।

—কেন ?

নয়ন একটু হেসে বলে···শ্যামাকে বশ করতে যেমন চাই, তেমনি মোনা ঠাকুরদেরও উচ্ছেদ করতে চাই।

লোকটা একটু হেসে বলে···যদি দুনিয়া থেকে সব মোনা ঠাকুরের উচ্ছেদ করে দেন তাহলে আবার কাউকে বশীকরণ করার দরকার হলে মোনা ঠাকুরকে পাবেন কোথায় ?

—মোনা ঠাকুররা না থাকলে পৃথিবীর কোন ক্ষতি হবে না। থাকলে বরং ক্ষতি।

—তাহলে শ্যামার কি হবে ?

—কি হবে ?

—শ্যামাকে বশীকরণ করবে কে ?

—কেউ করবে না। তার দরকার হবে না। শ্যামাকে কেড়ে নেওয়ার মত জোর আমার আছে।

—তবে বশীকরণের কথা ভাবছেন কেন ?

খুব চিন্তান্বিত মুখে নয়ন বলে···ও এমনিই। মোনা ঠাকুরদের ক্ষমতা কতদূর তা একবার নিজের চোখে দেখতে চাই।

লোকটা হেসে বলে···কিছু ক্ষমতা আছে নিশ্চয়ই। উনি বান মারেন, মারণ উচাটন জানেন, বশীকরণ জানেন, কত জজ-ম্যাজিস্ট্রেট এসে ধুলোয় গড়ায়। মাটি থেকে আধ হাত উঁচুতে উঠে শূন্যে বসে জপ-তপ করেন তিনি। বলে লোকটা নয়নের দিকে হাসিমুখে চেয়ে থাকে।

নয়ন ভ্রূ কুঁচকে সামনের দিকে চেয়ে থাকে। চিন্তাকুটিল মুখ, খুব অন্যমনস্ক। লোকটার কথা তার কানে গেছে বলে মনে হয় না।

জঙ্গল ক্রমে শেষ হয়ে আসে। আম বাগানের শেষে একটা মাঠ কোনাকুনি পার হয়ে, একটা বড় পুরোনো দীঘির কালো জলে নিজেদের ছায়া ফেলে, উত্তরে কয়েকটা ঢিবি, গড়খাইয়ের মত জায়গা পেরিয়ে সুপুরি বাগান পায় তারা। সেই বাগান পেরলে একটা শ্যাওলা ধরা পুরোনো মন্দির দেখা যায়।

লোকটা নয়নের দিকে ঝুঁকে বলে—দেখেছেন! ঐ হচ্ছে মোনা ঠাকুরের অস্তানা।

নয়ন গম্ভীরভাবে বলে···হুঁ।

—লোকে কয় মাটির পুতুলা। কালী আমার মাটির পুতুলা। ঢ্যাস্ করে ফেলে দ্যান জলে, ভুস করে ডুবে যাবে। তো সব ঠিক। কিন্তু মায়ের গলার মালাখানা মোর ঘোরে কেন রে? বন বন করে ঘোরে কেন মালাখানা? হ্যাঁ? বলে মোনা ঠাকুর একটু হাসে।

মন্দিরের পাশে চৌকো ঘরখানা। সামনে বাঁধান চাতাল। সেখানে কয়েক জোড়া ছাড়া জুতো। চাতালের ওপাশে-বয়ঃসন্ধির মেয়েদের মত হিল্ হিলে শরীরের সুপুরিগাছের সারি। ঘেঁটুবন, আশশ্যাওড়া আর ভাটগাছের জঙ্গল। চারদিক কেমন ঠাণ্ডা, নিঝুম। শ্যামা আঁচলখানা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে বসে।

বাঁশের বেড়ার ওপর মাটির আস্তরণ, তাতে চুনকাম করে ঘরের দেয়াল তৈরী হয়েছে। ওপরে টিনের চাল, মেঝে বাঁধান। ছেঁড়াখোড়া শতরঞ্চি পাতা। কয়েকটা পাটির আসন। শতরঞ্চিতে মোনা ঠাকুর বসে আছে। গায়ের রঙ তামাটে, বড় বড় চুল, গালে ছাঁটা দাড়ি, তাতে সাদা ছোপ ধরে এসেছে। মুখখানা লম্বাটে, ভাঙা, কিন্তু তার একটা কমনীয় সৌন্দর্য আছে। হাসলে মোনা ঠাকুরকে খুব সরল মনের লোক মনে হয়, গম্ভীর হলে মনে হয় চিন্তাশীল। খালি গায়ে পৈতেটা খুব সাদা দেখায়। বুকে, হাতে, কাঁধে, কানে, নাকে প্রচুর লোম। শরীরের বাঁধুনি কৃশ, কিন্তু শক্ত। পরনে পরিস্কার একখানা ধুতি। পাশে বিড়ির বাণ্ডিল আর দেশলাই। মোনা ঠাকুরের মুখে বিড়ি নেভে না। একটা ফেলেই আর একটা ধরায়।

মোনা ঠাকুরের একেবারে সামনে দুটো পাটিতে বাবা আর মা বসে আছে। আশেপাশে আরও দু-চারজন গাঁইয়া লোক। তাদের মুখ চোখ হাবাগোবা, চোখে ভয় আর ভক্তি।

দরজার পাশে একটা পাটিতে বসে ছিল শ্যামা। তার মন ভাল নেই। একটু অন্যমনস্ক হয়ে সে মোনা ঠাকুরের দিকে চেয়েছিল।

মোনা ঠাকুর একটু দুলে বলে—লোকে বলে মাটির পুতুলা। তো তাই। তবু কালী আমার হাঁটে চলে, খায়-দায়, চুল ফেরায়, চান করে, আমার কালীর মন খারাপ হয়, কাঁদে হাসে। পাগুলি।

বাইরে একটা মেঘের ছায়া পড়েছে। চাপ বাঁধা গাছপালা আর জঙ্গল। দিনের বেলায়ও প্রবল ঝিঁঝি ডাকছে। গাছপালাগুলো অন্ধকার সব ছায়া ফেলেছে। ঐ আলো-আঁধারির কোথাও নয়ন লুকিয়ে আছে। সারা রাস্তা যত পাখির ডাক শুনেছে শ্যামা, যত দূরাগত শব্দ শুনেছে তত সে চমকে উঠেছে। মনে হয়েছে, পাখি নয়, নয়ন। সব শব্দই করছে নয়ন। সেই হরবোলা তার বিচিত্র সব শব্দ তুলে শ্যামার চারিদিকে একটা জাল তৈরী করছে। শ্যামার মন ভাল লাগে না।

মোনা ঠাকুর বাবার দিকে চেয়ে বলে...বাবুমশায়, আপনি কি ছেলের খবরের জন্য এসেছেন?

একটু চমকে ওঠে শ্যামা। লোকটা জানল কি করে? তারা যে দাদার খবরের জন্য এসেছে তা তো বলে নি।

বাবা একটু স্তব্ধ হয়ে তারপর ধরা গলায় বলে···আজ্ঞে হ্যাঁ ঠাকুর-মশাই। আপনি তো অন্তর্যামী।

মোনা ঠাকুর মাথা নেড়ে বলে···অষ্টসিদ্ধির দুটো সিদ্ধি হলেই এসব বলা যায়। কিছু না বাবুমশাই। লোকের চোখে মুখে সমিস্যের কথা লেখাই থাকে। সেটা পড়ার মত অক্ষরজ্ঞান থাকলেই হল। ওই মেয়েটি কি আপনারই?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মোনা ঠাকুর হেসে বলে···তা মেয়ের মুখ অত ভার কেন? এ জায়গা ভাল লাগছে না মা? ভয় করছে?

শ্যামা মাথা নেড়ে জানায়, না। তারপর একটু হাসে।

—ভয় নেই মা, আমার কালীমায়ের আওতায় বিপদ-আপদ নেই। সাপখোপের মুখে আপনা থেকেই বন্ধন পড়ে যায়, চোর বদমাশরা অসাড়

হয়। যাও মা, ঘুরে টুরে জায়গাটা দেখে এস। পশ্চিমে একটা সুড়ঙ্গ আছে, অনেকটা যাওয়া যায় ভিতরে, দক্ষিণে শিবমন্দির আছে। দাঁড়াও, সঙ্গে লোক দিচ্ছি। বলে মোনা ঠাকুর ভিতরবাড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকে...তারা, ওরে তারা···

ডাক শুনে উনিশ বছরের একটা লালপেড়ে শাড়িপরা লাজুক মেয়ে এসে ভিতরের দরজায় দাঁড়ায়।

—এই মাকে নিয়ে যা তো, সব দেখিয়ে আন। যাও মা ঐ আমার মেয়ের সঙ্গে যাও। কোন ভয় নেই।

শ্যামা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। উঠে পড়ে। অনেকক্ষণ ধরে তার মন থম ধরে আছে। মুখে কতকগুলি উষ্ণ স্পর্শ এখনও ফোস্কার মত লেগে আছে। মন ভাল নেই।

কোথায় একটা বেড়াল কাঁদছে। মেয়েটির সঙ্গে বাইরে যাবে বলে পা বাড়িয়েও থেমে গেল শ্যামা। নয়ন! নয়ন নয় তো? আতঙ্কিত মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল···ওটা কি ডাকছে?

মেয়েটি মুগ্ধ চোখে তাকে দেখছিল, হেসে বলল···বেড়াল। আমাদের বেড়ালের বাচ্চা হারিয়ে গেছে, কাঁদছে কাল থেকে।

চাতালে পা দিতেই বাতাস লাগল। বাতাসটা হিম। চারদিকে বেশী গাছপালার জন্যই বোধ হয়।

শ্যামা বলল ··তবে যে শুনলাম, মোনা ঠাকুর বললেন, এখানে কোন অমঙ্গল হয় না! বেড়ালটার বাচ্চা তাহলে চুরি গেল কেন?

মেয়েটি খুবই সাধারণ। গিন্নি-বান্নির মত ঢিলে করে ফেরতা ঘুরিয়ে শাড়ি পরেছে। কপালে তেল সিঁদুরের বড় একটা টিপ। সিঁথি সাদা। মুখে সরলতা আর বিস্ময়। শ্যামার সাজগোজ দেখছে বার বার। প্রশ্ন শুনে চোখ দুটো বড় করে বলে—মানুষকে সাহস দেওয়ার জন্য বাবা অনেক সময় ওরকম সব কথা বলেন। নইলে এখানেও কত ঘটনা হয়। আমারই এক ভাই তো চার বছর আগে কলেরায় মারা গেছে!

—তাহলে কি ওসব মিথ্যে কথা?

মেয়েটা ঠিক-ঠাক জবাব দিতে পারে না। কিন্তু সরল মুখে সে খুব হাসে। তারপর বলে...না, বাবা ঠিক মিথ্যে কথাও বলে না। যার বিশ্বাস আছে তার অমঙ্গল হয় না।

—তবে আপনার ভাই মারা গেল কেন? মোনা ঠাকুরের তো বিশ্বাস

আছে।

মেয়েটা হেসেই বলে···ওসব আমি ঠিক বুঝি না। বাবা আমাদের সঙ্গে তো বেশী কথা বলে না। কি করে জানব বলুন! আমরা শুধু জানি, বাবার কাছে অনেক লোক আসে, বাবা তাদের অনেক সমস্যার সমাধান করে দেয়।

শ্যামা চাতালের সিঁড়িতে পা দিয়ে বলে···কালীর গলার মালা সত্যিই ঘোরে?

মেয়েটা বলে···আমরা তো ওসব দেখতে পাই না। বাবা যখন পুজো করে তখন মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকে। আপনি কিন্তু খুব সুন্দর।

—যাঃ, আমি তো কালো।

—খুব কালো না। তবে ফর্সা হলে আপনি ঠিক রাণীর মত হতেন।

—আজকাল কলকাতায় গয়না পরার চল নেই, না?

—কেন?

—আপনি তো পরেন নি।

—আমার বেশী গয়নাই নেই। তাছাড়া দিনকাল তো ভাল না, গয়না পরলে যদি চোর-ডাকাত পিছু নেয়?

—আপনি যা সুন্দর! চোর-ডাকাত না হোক ছেলে-ছোকরা পিছু নেবেই।

শ্যামা একটু গম্ভীর হয়ে যায়।

—আপনি এটা কি শাড়ি পরেছেন? শিফন?

—না, এটা কমদামী শাড়ি। * রাসো।

মেয়েটার হাসি তার চোখেও উপচে পড়ে। সে মিটমিটে হাসিচোখে চেয়ে বলে...আমাদের কিন্তু ওসব জোটে না। পুজোর শাড়িই পরি আমরা। এই দেখুন না পরে আছি, লালপেড়ে। তার ওপর আবার খাটো।

বলে খুব হাসে। শ্যামার তক্ষুনি মেয়েটাকে ভাল লাগতে থাকে। সে সমবেদনার গলায় জিজ্ঞেস করে···কেন, ভাল শাড়ি আপনার পরতে নেই?

—বাবা পরতে দেয় না, কিনে দেওয়ারও লোক নেই।

—গ্রামদেশে ভাল শাড়ি পাওয়া যায় না?

মেয়েটা মাথা হেলিয়ে বলে···খুব যায়। কলকাতায় নতুন শাড়ি বেরোলে তিনদিনের মধ্যেই এদিকে চলে আসে। গাঁয়ের মেয়েরা সবাই পরে। আমরা ঠাকুরবাড়ির মেয়ে তো, আমাদেরই জোটে না।

—মন খারাপ লাগে, না ?

—লাগবে না ? সাজগোজ করার বয়সই তো এটা, নয় ?

শ্যামা একটু হেসে বলে···বিয়ে হলে পরবেন, তখন তো আর বাধা থাকবে না।

—বিয়ে কে দিচ্ছে !

—কেন ?

—বাবা তার কালী ছাড়া কিছু বোঝেই না। আমি কত বড়টা হয়ে যাচ্ছি কে খেয়াল রাখে ! মা ভয়ে বিয়ের কথা তোলে না। এই করেই আমার দিদি একটা বাজে ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেল।

শ্যামা একটু থমকে গিয়ে বলে···সে কী !

—সত্যিই।

শ্যামা একটু হেসে বলে···তবে তো মোনা ঠাকুরেরই সমস্যা অনেক !

মেয়েটা মাথা নেড়ে বলে···না। বাবার কোন সমস্যা নেই।

—এগুলোই তো সমস্যা। যার বেড়ালের বাচ্চা মরে যায়, মেয়ে পালিয়ে যায়, সে-ই তো সত্যিকারের দুঃখী লোক। সে কি করে অন্যের ভাল করবে ?

মেয়েটা একটু উদাস গলায় বলে···কিন্তু তবু বাবার কোনও সমস্যা নেই।

কেন ?

মেয়েটা মুখে আঁচল দিয়ে হেসে বলে···আসলে আমরা তিন বোন, আমার মা, আমাদের মরা ভাইটা, আমাদের বেড়াল···এরা আবার কেউ না। বাবা হচ্ছেন মোনা ঠাকুর···মস্ত ভক্ত সাধু। আর আমরা, তার পরিবারের লোকেরা হচ্ছি এই আপনাদের মতই বাইরের লোক, বদ্ধ জীব। বাবার কাছে আপন পর বলে ভেদ নেই। যেদিন আমার ভাই মারা যায় সেদিন বাবার পায়ে একটা কাঁটা ফুটেছিল। বাবা ঐ চালাতে বসে লেবু-কাঁটা দিয়ে সেই কাঁটা তুলছিল। দৌড়ে গিয়ে যখন বাবাকে খবর দিলাম তখনও কাঁটা তোলা হয় নি। বাবা খবরটা শুনল, তারপর আস্তে আস্তে

খ্যুটে কাঁটা তুলল, তারপর ভিতর বাড়িতে গেল।

শ্যামা বলে···সে কী!

মেয়েটা হাসে, বলে...সত্যি বলছি। বাবার কোন সমস্যা নেই। আপনাদের সঙ্গে যেমন সুরে কথা বলেন, আমাদের সঙ্গেও তেমন করেই কথা বলেন। আমরা বাবাকে মোনা ঠাকুর বলেই চিনি, বাবা বলে নয়।

চাতাল পেরিয়ে একটা মাঠ মত। দক্ষিণে দ্বাদশ শিবের মন্দিরের গা ভেদ করে অশ্বত্থ গাছ গজিয়েছে। মন্দিরের গায়ে শ্যাওলা।

—এসব মন্দির কি বহু দিনের পুরোনো?

—কয়েক শো বছর বোধ হয়। শিব মন্দিরে তক্ষক ডাকে। মেয়েটা হেসেই বলে।

—সুড়ঙ্গটা কোন্ দিকে?

—পশ্চিম দিকে। দেখবেন? নাকি এমনি বেড়াবেন?

শ্যামা মেয়েটির দিকে চায়। সরল সোজা মুখ, অকপট চোখ। কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু টের পাওয়া যায়, এই মন্দির, মোনা ঠাকুর, এ সবের ওপর মেয়েটির কোন টান নেই। মেয়েটা এই মন্দিরের দেবতা বা তার পুজারীকে গ্রহণ করে নি।

শ্যামা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে···আপনি আপনার বাবার সবকিছু বিশ্বাস করেন না?

মেয়েটা চোখ বড় করে হেসে বলে...করব না কেন? আপনাদের যেমন বিশ্বাস আমাদেরও তেমনই বিশ্বাস। তবে···মেয়েটা চুপ করে থাকে।

—তবে কি?

—বলছিলাম, আমার ভাই মরে যাওয়ার দিন ঐ যে বাবাকে পায়ের কাঁটা তুলতে দেখেছিলাম ওটা কখনো ভুলতে পারি না। একজন মরে যাচ্ছে, আর বাবা কাঁটা তুলছে, কেমন যেন মনে হয়। ঠিক যেন সংসারের একটা কাঁটা বাবা তুলে ফেলছে। এরকম করে ভাবলে ভয় করে।

শ্যামার বুকের ভিতরটা গুড়় গুড়় করে। সে আস্তে করে বলে—কিন্তু বাবার মুখ দেখে উনি কিন্তু ঠিকই বলেছিলেন আমরা কার খোঁজে এসেছি।

—মেয়েটা কিন্তু কোন কৌতূহল দেখায় না। কেবল বলে···বাবা তো সবই ঠিক বলে। আমরা জানি। নইলে লোকে আসবে কেন?

—অনেক লোক আসে ?

—অনেক। ছুটির দিন হলে এ সময়টায় লোক গিজ গিজ করে। কলকাতা থেকেই বেশী আসে।

শ্যামা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—আমার এক দাদা পাঁচ বছর হল হারিয়ে গেছে।

মেয়েটা উত্তর দেয় না মাথা নিচু করে হাঁটে। শ্যামার তখন মনে পড়ে, এ মেয়েটার ভাই মরে গেছে, একটা মাত্র ভাই। এর দুঃখ আরও বেশি হওয়ার কথা। তার দাদা বেঁচে থাকলেও থাকতে পারে। এ মেয়েটার ভাই নিশ্চিত ভাবে মারা গেছে।

শিব মন্দিরের পাশে একটা টিউবওয়েল দেখে শ্যামার তেষ্টা পায়। বলে…একটু জল খাব ?

—আমি বাড়ি থেকে এনে দেব ?

—না, না। ঐ তো টিউবওয়েল !

–আঁজলা করে খেতে অসুবিধে হবে না ?

—দূর।

—তবে চলুন আমি কল টিপে দিই। এখানকার জল খুব মিষ্টি।

জল খাওয়ার সময়ে নিচু হয়ে শ্যামা হঠাৎ শুনতে পেল, কোকিল ডাকছে। সারা গায়ে কাঁটা দিল তার। মুখ তুলে বলল…কি ডাকছে ?

—ওমা ! কোকিল। মেয়েটা হেসে গড়িয়ে পড়ে।

শ্যামা স্থির হতে পারে না ! প্রশ্ন করে…সত্যিকারের কোকিল।

—তা নয় তো কি ?

—অনেক সময়ে মানুষ কোকিলের মত ডাকতে পারে।

মেয়েটা মুখে আঁচল তুলে বলে…এখানে কে আবার মানুষ কোকিল ডাকতে আসবে ? আমি জন্ম থেকে কোকিলের ডাক শুনছি। এ সত্যিকারের কোকিলের ডাক।

শ্যামা জল খেয়ে আঁচলে মুখ মুছে বলে…আমি একজনকে জানি যে হুবহু কোকিলের মত ডাকে। ধরা যায় না যে মানুষ ডাকছে।

মেয়েটা শ্যামার দিকে চেয়ে বলে…কিন্তু এ মানুষের ডাক নয়। ঐ শিমুল গাছে কোকিল বসেছে। সারা দিনই ডাকে। আমি চিনি ঐ ডাক।

চারদিকে ঝোপ-ঝাড় আর গাছে বাতাস বয়ে যাওয়ার শব্দ হয়। রোদের মুখ থেকে মেঘ সরে গেছে। তবু এইখানে রৌদ্রের ততদূর

উজ্জ্বলতা নেই। গাছের ছায়ারা পড়ে আছে। শ্যামা তার মুখে গালে নয়নের স্পর্শ ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করে।

—সুড়ঙ্গটা দেখবেন? মেয়েটা জিজ্ঞেস করে।

—চলুন, দেখি। কখনো দেখিনি।

দেখার কিছু নেই। মেয়েটা উদাসভাবে বলে···আমরা তো জন্ম থেকে দেখছি।

—এ সবই কি আপনাদের সম্পত্তি?

—না। দেবত্র। এক জমিদার দেবত্র করেছিল। তার আর বংশ নেই। আমাদের কিছু ব্রহ্মত্র জমি আছে। আমরা এই মন্দিরের চার পুরুষের পুরুত।

—এখানেই জন্মেছেন?

মেয়েটা হেসে বলে—তবে আর কোথায় ব

—ভাল লাগে এ জায়গা?

মেয়েটা মাথা নেড়ে বলে···একদম না। অন্য কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে। কেউ যদি নিয়ে যেতে চায় চলে যাব।

শ্যামা হেসে ফেলে। বলে···এ জায়গার ওপর আপনার এত রাগ কেন?

মেয়েটা হেসে বলল···আপনার মত একটা রঙীন সুন্দর শাড়ি পরতে ভীষণ ইচ্ছে হয়, জানেন!

শ্যামা একটা শ্বাস ফেলে। তারা নরম ঘাসের ওপর দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে হাঁটে।

মেয়েটা বলে··খুব সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করে। বাসে-ট্রামে মোটরগাড়িতে চড়তে ইচ্ছে করে, রেডিও শুনতে ইচ্ছে করে।

—এখানে কিছু নেই?

মেয়েটা অন্যমনস্ক ভাবে বলে···মাঝে মাঝে অমাবস্যার পুজোয় এই মাঠে সিনেমা দেখান হয়। যাত্রাওলারা আসে। অনেক বছর আগে একটা সার্কাসও এসেছিল। এই সার্কাসের একটা লোক খেলা দেখাত, তাকে সিংহে থাবা দেয়। সার্কাসের লোকেরা তাকে এইখানেই ফেলে গেল। সে এখনও আছে। ঐ দিকে মন্দিরের উত্তরে বাঁশঝাড়টার পিছনে থাকে। বাবা দেখতে পারে না।

—কেন পারে না?

—এই গাঁয়ের সে-ই একমাত্র লোক যে এ মন্দিরে আসে না।

—কেন ?

মেয়েটা ম্লান একটু হাসে। বলে···তার একটা ছেলে আছে। তার বৌ ছেলের জন্ম দিয়েই মারা যায়। বাবা বলে, ছেলেটা ঐ লোকটার নয়! কী ঘেন্নার কথা বলুন! কিন্তু লোকটা বলে যে ছেলেটা তারই। এই নিয়ে ঝগড়া। বলে মেয়েটা আবার হাসে মুখে আঁচল দিয়ে।

তারপর আবার বলে···এখানে কিছু নেই। কেবলই মনে হয়, আমাদের একটা আদ্যিকালের পোড়ো অন্ধকার জায়গায় ফেলে রেখে চারদিকে পৃথিবীটা এগিয়ে যাচ্ছে। কলকাতা থেকে কত লোক আসে, তাদের যত দেখি তত ঐ কথা মনে হয়। বাবা তাদের দুঃখের কথা শোনে, আর আমি দেখি তাদের পরনে কত রঙীন কাপড়ের পোশাক, কী রকম ঝলমলে মুখ চোখ, কেমন দূর মাখানো তাদের চেহারায়!

শ্যামা হাসি চেপে বলে···কিন্তু এ তো কলকাতা থেকে খুব দূর নয়।

মেয়েটা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে···দূর কেন হবে। কত লোক এখান থেকেও চাকরি করতে যায় রোজ, কিংবা সিনেমা দেখে আসে, কেনাকাটা করতেও যায়। কাছেই একটা দুটো শহরও তো আছে। কিন্তু আমরা ঠাকুরবাড়ির মেয়ে বলেই কোথাও যাওয়া হয় না।

মেয়েটা থেমে গিয়ে বলে—ঐ হচ্ছে সুড়ঙ্গের রাস্তা।

একটা উঁচু বেদীর মত বাঁধানো জায়গা! চারটে থাম, ওপরে সুন্দর একটা চুড়োওয়ালা ছাদ। ছাদের নিচে একটা ছোট ঘর, তার দরজাটা খোলা। মেয়েটা সেদিকে চেয়ে বিস্বাদ মুখে বলে···ঐ। যাবেন ?

—কতদূর গেছে সুড়ঙ্গটা ?

—বেশি দূর নয়। একটু গিয়েই দেখবেন ছাদ ভেঙে পড়েছে, ইঁটের ডাঁই, আর আগাছা। বাঁশবেড়ের হংসেশ্বরীর মন্দিরে এরকম সুড়ঙ্গ আছে, শুনেছি।

—সাপখোপ নেই তো।

মেয়েটা মুখে আঁচল তুলে হেসে বলে···কত কী আছে! আমরা ছেলেবেলায় চোর-চোর খেলতে যেতাম ওর ভিতরে। বড় হয়ে আর যাই না। অনেকে গুপ্তধনের লোভে খুব খোঁড়াখুঁড়ি করত একসময়ে। কেউ কিছু পায় নি।

শ্যামা হেসে বলে···আমরা যদি কিছু পেয়ে যাই ?

মেয়েটা হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ে।

ঘরে ঢুকে প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়েই শ্যামা থেমে পড়ে। সামনে গভীর অন্ধকারে নেমে গেছে সিঁড়ি। একটা চামচিকে ডেকে ওঠে।

—অন্ধকার যে!

—কোন ভয় নেই। আমি আগে যাচ্ছি।

মেয়েটা শ্যামাকে পেরিয়ে আগে আগে নামে। শ্যামা পিছনে। আবার হঠাৎ চামচিকে ডেকে ওঠে। এবার একটু দূর থেকে।

মেয়েটা থমকে মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে—আপনার নাম কি?

—শ্যামা।

মেয়েটা হাসে, বলে···আমার নাম তারা।

—জানি।

—আমাদের নামের একই অর্থ।

শ্যামা মাথা নাড়ে হাসে।

—শ্যামার মন্দিরেই আপনি এসেছেন। অন্ধকারকে কি খুব ভয় শ্যামাদি?

শ্যামা অপ্রতিভ ভাবে হেসে বলে···আমরা তো ভাই শহরের মানুষ, অন্ধকারকে একটু ভয় পাই।

—তবে থাক, গিয়ে কাজ নেই।

—কেন?

—আমার কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে। অনেকদিন নামি নি কিনা!

গভীর অন্ধকার তলদেশ থেকে হঠাৎ একটা টিকটিকি ডেকে ওঠে। শ্যামা উৎকর্ণ হয়ে শোনে।

তিন চার ধাপ সিঁড়ি নেমে গলা পর্যন্ত অন্ধকারে দুজনে একটু দাঁড়িয়ে রইল। সামনে তারা, পিছনে শ্যামা।

তারা একটা শ্বাস ফেলে বলল···আপনার কি নামতে খুব ইচ্ছে করছে?

শ্যামা মাথা নেড়ে বলল···না। বলে সে উঠতে লাগল।

ওপরে এসে, ফাঁকা জায়গায় এবং আলোতে মেয়েটাকে বিমর্ষ দেখাল। শ্যামার দিকে চেয়ে সে বলল···জানেন, আমার সেই ভাইটা মরে যাওয়ার পর থেকেই আমি কেমন যেন ভয়-ভয় পাই। নির্জনে বা অন্ধকারে থাকতে পারি না! কিছু মনে করলেন না তো শ্যামাদি?

সুড়ঙ্গটা দেখার খুব ইচ্ছে ছিল আপনার।

শ্যামা অন্যমনস্ক ছিল। খুব অন্যমনস্ক। আসল ডাক আর নকল ডাকের পার্থক্য বোঝা যে কী মুশকিল! সে তারার কথার উত্তর দিল না।

এখনও বেলা আছে। সূর্যের আলো আরও কিছুক্ষণ থাকবে। কেবল পশ্চিমের আকাশে একটা ধোঁয়াটে অস্বচ্ছতা ঘুলিয়ে উঠছে। নিবিড় গাছপালার ওপর দিয়ে একটা বিবর্ণ আকাশ দেখা যায়। এই ঋতুতে এ রকম হয়। মাটির তাপ ওঠে, কুয়াশা জমে, স্থির বাতাসে ধুলো ভেসে থাকে। সেই অস্বচ্ছতার আড়ালে সূর্যকে পরিষ্কার গোল চাঁদের মত দেখা যায়। উজ্জ্বলতা নেই তার। চারপাশে আকাশের সেই অস্বচ্ছতা এক রকম ছায়া ফেলেছে।

মোনা ঠাকুর তার আসন ছেড়ে উঠে গেছে। মা আঁচলে চোখ মুছছে। বাবা স্তব্ধ হয়ে বসে। শ্যামা গিয়ে তার মায়ের পাশে বসল।

—কি হল মা?

মা বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে ধরল তাকে···যদি সত্যি হয় শ্যামা, তবে আমি কালীর সোনার চোখ গড়িয়ে দেব।

—কী হয়েছে বল না!

মা মোনা ঠাকুরের শূন্য আসনটার দিকে চেয়ে ধরা গলায়···ঘলে ও নাকি বেঁচে আছে। হৃষিকেশ বা হরিদ্বারের দিকে আছে। সন্ন্যাসী হয়েছে, মাথার অসুখ নেই।

বাবা একটা শ্বাস ফেলে বলে—আমি ডেফিনিট্ হতে পারছি না!

মা চোখ থেকে আঁচল সরিয়ে ঝেঁঝে উঠে বলে···আমরা কিছু বলার আগেই উনি কি করে বুঝলেন যে আমরা ছেলের কথা জানতে এসেছি। তুমি তোমার ডেফিনিট্ নিয়ে থাকো গে। আমি হৃষিকেশ যাবো।

বাবা মৃদু স্বরে বলে—এসব বিষয়ে সিওর হওয়া যে কী মুশকিল তা তুমি পুরুষ হলে বুঝতে। এত বছর অপেক্ষা করার পর আশা করতে ভরসা পাই না।

মা বলে···তুমি না পাও আমি পাচ্ছি।

বাবা চুপ করে থাকে।

শ্যামার ভিতরটা মুচখে ওঠে ব্যথায়। আবার আনন্দেও। দাদা কি

আবার ফিরে আসবে ! দাদা কি বেঁচে আছে ! আবার ফিরে যদি আসে, যদি আবার প্যাণ্ট-শ্যার্ট পরে, আড্ডা মারতে বেরোয়, যদি আবার খাওয়া নিয়ে মার সঙ্গে ঝগড়া করে ! যদি আবার আগের মত তারা চারজন রাতের খাওয়ার পর লুডো বা তাস নিয়ে বসে ! কত চাল চুরি করত দাদা, মা দেখেও দেখত না । আবার কি সে সব হবে ঠিক আগেকার মত ! ঠিক বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না । শ্যামা মনে মনে ধরেই নিয়েছিল, দাদা নেই । কোন নদীর পাড়ে, বা রেললাইনের ধারে, কিংবা বড় মাঠের মধ্যে সেই পাগল মানুষটা শেষ হয়ে পড়ে আছে···এ রকমটাই মনে হত তার, মাঝরাতে ঘুম ভেঙে ধক্ করে কেঁপে উঠত বুক ! বাবা প্রায় সময়েই বলত···দ্যাখো গে, কোথাও ভিক্ষে-টিক্ষে করছে বোধ হয় । মার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, দাদা সন্ন্যাসী হয়ে গেছে । মায়ের কথা, বাড়ির কথা সে ভুলে গেছে বলেই আসছে না । একদিন ঠিক ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মত ফিরে আসবে । আবার 'মা' বলে ডাকবে, বিয়ে করবে, চাকরি করবে··· । শ্যামার ঠিক বিশ্বাস হয় না । এ সব তো সিনেমায় হয়, গল্পে হয়, কিন্তু তার দাদার বেলায় হবে কি ?

তাকে কাছে টেনে, আদর করে, কপালের চুল সরিয়ে দিয়ে গাঢ় আনন্দের স্বরে মা বলল···শ্যামা, একটু পরেই সন্ধে লেগে যাবে মা, আমরা আরতিটা দেখে যাব ।

—দেরি হয়ে যাবে না ?

—হোক গে । এ বড় জাগ্রত দেবতার স্থান ! একটু থাকি ।

বাবা বিড় বিড় করে বলে···দিনকাল ভাল নয় ।

মা বড় চোখে বাবার দিকে চায় । বাবা মুখ ফিরিয়ে নেয় ।'

২

উদাস একখানা মাঠ । শেষ বেলার বার্লিরঙের আলো পড়ে আছে । একখানা টিনের দোচালার দাওয়ায় বসে বাপ-ব্যাটা ।

ছেলে মুখে তুলে বলে···বাবা, দাদুবুড়ো কেমন করে হাঁটে ।

—দাদুবুড়োর কোমর বাঁকা, কুঁজো হয়ে মাজায় হাত রেখে হাঁটে ।

—কামড়ায় না ।

—কামড়ায় ।

—কেমন লাগে ?

—লাগে না । দাদুবুড়োর দাঁত নেই তো, কেবল মাড়ি !

কামড়ালে কাতুকুতু লাগে।

সুকুল হেসে গড়িয়ে পড়ে। তার বাবা হাসতে গিয়ে দেখে, কোনাকুনি মাঠ পার হয়ে নয়ন আসছে। কোকিল ডাক। কোকিলের ডাকই নয়নের বেশি প্রিয়।

সে কাছে আসতেই ছেলের বাপ হাসে, বলে…শ্যামাপাড়ির ডাক পারেন না?

নয়ন খুব গম্ভীর। মাথা নাড়ে। না।

—কি হল ওখানে?

—কিছু না। এখানে আরতি হবে।

—বসুন।

নয়ন দাওয়ার একধারে বসে। সুকুল উঠে তার দিকে চায়।

—কোথায় গিয়েছিলে?

কল্পতরুর মন্দিরে।

মোনা ঠাকুর ভীষণ রাগী। কামড়ায়।

নয়ন কেবল মৃদু একটু হাসে।

—তুমি আমাকে কখন পাখীর ডাক শেখাবে?

—কাল থেকে শেখাব।

—আমি ঘুমোলে চলে যাবে না তো?

—না।

সুকুল নিশ্চিন্ত মনে তার বাবার দিকে চেয়ে বলে…বাবা, সিংহটা তোমাকে কেমন করে থাবা দিয়ে মেরেছিল বল।

লোকটা নয়নের দিকে চেয়ে হাসে। বলে…এই গল্প ও কতবার শুনেছে, তবু রোজ শুনবে?

নয়ন ঝুঁকে বলে…কি গল্প?

—গল্প না। একটা ঘটনা।

—আপনাকে সিংহ থাবা দিয়েছিল?

লোকটা উদাস গলায় বলে…সিংহ কি না কে জানে। আদুবুড়ো বলত, সেটা কেশরী বাঘ।

—সেটা কি?

—সিংহই আসলে। তবে গাউস সাহেবের গরিব সার্কাসে আর কত বড় সিংহ হবে! আদুবুড়ো বলত…আসল সিংহ হয় গহীন

জঙ্গলে সেখানে মানুষ যেতে পারে না। গাউস একটা কেশরী বাঘ ধরে এনে সিংহ বলে চালাচ্ছে। আমাদেরও সেই ধারণাই ছিল।

—আপনি সার্কাসে ছিলেন? খেলা দেখাতেন?

দেখাতাম। প্রথম প্রথম। চুল দিয়ে লোহা তুলতাম, কিলিয়ে পাথর ফাটাতাম। গায়ের জোর ছিল খুব। একদিন তাঁবুর দড়ি খাটাতে গিয়ে পড়ে যাই। মাজা ভেঙে শেষ হয়ে গেলাম। গাউস অবশ্য লোক খারাপ ছিল না দলে রেখে দিল। ফাই-ফরমাস তামিল করতাম, বাঘ সিংহকে খাবার দিতাম, হাতীর জন্য কলাগাছ কেটে আনতাম। এই সামনের মাঠে একবার গাউস সাহেব তাঁবু ফেলল। নির্জন জায়গা বাঘ সিংহের ডাকে কেঁপে উঠল। তা এইখানেই সেই ঘটনাটা ঘটে। দুপুরবেলা খাবার দিতে সিংহের খাঁচায় নেমেছি। বুড়ো আধমরা সিংহ, নড়াচড়া করত না বড় একটা, খাঁচায় ঢুকলে হাই তুলে নিরীহ চোখে চাইত। দেখেশুনে মনে হত, আদুবুড়োর কথাই ঠিক। এটা সিংহ নয় বটে, কেশরী বাঘই হবে। সেদিন কী খেয়াল হল, মাংসের একটা বড় টুকরো সিংহের নাকের সামনে নেড়ে সরিয়ে নিচ্ছিলাম। দেখি ব্যাটা করে কী। এইরকম পাঁচ-সাতবার করবার পরও সে ব্যাটা কেবল হাই তুলল, আর চোখ পিট পিট করল। মজা পেয়ে আবার তার নাকের সামনে মাংস দুলিয়ে সরিয়ে নিই। ঠিক বুঝতে পারি নি। হঠাৎ বেমক্কা সব আলসেমি ঝেড়ে ফেলে সিংহটা লাফিয়ে উঠল। সে কী ডাক। ভিতরটা আমার ফেটে গেল যেন। সেই ডাক সামলাবার আগেই উপর্যুপরি কয়েকটা থাবা। তারপর এক ঝটকায় আমাকে পেড়ে ফেলে আমার পিঠের ওপর দাঁড়াল সে। পাঁজরার একটা হাড় গেল মট্ করে ভেঙে। সময়মত গাউস সাহেব চাবুকের শব্দ না করলে আজ আর আমাকে সুকুলের বাবা হতে হত না। বলে লোকটা তার ছেলের দিকে ঝুঁকে পড়ে হাসতে থাকে।

সুকুল বলে—দেখি দাগ।

লোকটা জামা সরিয়ে পিঠ দেখায়। নয়ন দেখে, সেখানে গভীর এবং লম্বা ক্ষতের চিহ্ন। সে জিজ্ঞেস করে—তারপর কি হল?

—কি আবার হবে! একটু দূরে মহকুমার হাসপাতালে মাস চারেক পড়ে রইলাম। ততদিনে গাউস পাততাড়ি গুটোল। আমারও সার্কাস ভাঙ্গ

লাগছিল না বলে পিছু নিলাম না। এই গাঁয়ের একজন লোক তখন আমাকে ধরেছিল তার মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য। বিয়ে করলে বিশ বিঘে জমি দেবে, ঘর দেবে, নগদ বিদায়ও দেবে কিছু। মেয়েটাও মন্দ ছিল না। বিয়ে করে থেকে গেলাম। সেই মেয়েই সুকুলের মা। বেশিদিন বাঁচে নি।

লোকটা চুপ করে মাঠের বালিরঙের আলোর দিকে চেয়ে রইল। একটু অনামনস্ক। কী যেন ভাবল। তারপর হঠাৎ সম্বিৎ পেয়ে বলল—বাবা সুকুল, তুমি বই নিয়ে একটু বস। আমি রান্না চাপাই। ঘরে অতিথি আছে।

ঘরে সবকিছুই সুন্দর সাজানো। একদিকে বাপ ব্যাটার খাট, অন্য-ধারে একটা ন্যাংটো চৌকি। চতুর্দিকেই সুকুলের খেলনা। চাল থেকে বেলুন ঝুলছে, দেয়ালে পেরেকে লটকানো ঘুড়ি লাটাই, কাচের আলমারি বোঝাই পুতুল, খেলনা-পিস্তল, ভেপু, লাট্টু, কলের ঘোড়া। আলনায় সুকুলেরই রঙ-বেরঙের জামাকাপড়। একধারে সুকুলের পড়ার টেবিল, তাতে পড়ার বইয়ের পাশে রাজ্যের ছবির বই। পরিষ্কার করে মোছা একটা ঝকঝকে লণ্ঠন রাখা।

লোকটা নয়নকে ঘরটা দেখিয়ে বলে…এ হচ্ছে সুকুলেরই ঘর। সুকুল যখন বড় হবে, তখন ওর বিয়ে দিয়ে আমি চলে যাব।

সুকুল ঝাঁপিয়ে গিয়ে বাবাকে ধরে, কিল মারে নীরবে।

লোকটা হাসে, ছেলেকে সামলাতে সামলাতে বলে...আচ্ছা, আচ্ছা যাব না। তুমি বই খুলে বস। আমি ভিতরের বারান্দায় বসে রান্না করি।

ভিতরে অন্ধকার উঠোন। তাতে জোনাকি পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। নয়ন চুপ করে বসে চেয়েছিল। দূরে আরতির ঘণ্টা বাজছে। তার কান সেইদিকে।

লোকটা ভাত চাপিয়ে এসে পাশে বসে বিড়ি ধরায়।

—কিছু হল ?

—না।

—সুড়ঙ্গে নেমেছিলেন নাকি ? মাথার চুলে ঝুল লেগে আছে।

—নেমেছিলাম। কিন্তু ও নামে নি।

—নামল না কেন?

—নয়ন ঠোঁট উল্টে বলে—কী জানি! বোধ হয় আপনাদের মোনা ঠাকুর আগেভাগে সব জেনে ওকে সাবধান করে দিয়েছে।

—ঠাকুরকে দেখলেন?

নয়ন মাথা নেড়ে বলে—দেখেছি! দূর থেকে।

—কেমন মনে হল?

—যেমন হয়।

—পারবেন?

—কি?

—উচ্ছেদ করতে?

নয়ন একটু হাসে। তারপর আস্তে করে বলে···একটা বোমা মারলেই উড়ে যায়।

লোকটা ধীরে ধীরে বিড়িটা টানে। তারপর চিন্তা করে বলে··· শত্রুকে দুর্বল ভাবতে নেই।

নয়ন একটু নড়ে। গালে একটা মশা মারে ঠাস করে। পায়ের পাতা খস্ খস্ করে চুলকোয়। কান খাড়া করে আরতির ঘণ্টা শোনে। হঠাৎ বলে···আপনার টর্চ আছে?

—আছে একটা। আমার নয় সুকুলের। ছোট্ট টর্চ, তেমন জোরাল নয়।

—দিন তো। বলেই উঠে দাঁড়ায়।

—চললেন কোথায়?

—ওদের এগিয়ে দিয়ে আসি।

—চিনতে পারবে না?

—না। অন্ধকার আছে। টর্চটা নিচু করে ফেলব।

—গলার স্বর?

নয়ন হেসে বলে—আমি হরবোলা।

লোকটা নিঃশব্দে উঠে গিয়ে ছোট্ট টর্চটা এনে দেয়। নয়ন কয়েকবার চারদিকে আলো ফেলে দেখে নেয়। বলে—চলবে।

ঘর দিয়ে বাইরে যাওয়ার সময়ে সুকুল তাকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে··· এ কি চলে যাচ্ছ?

—না সুকুল। ফিরব।

—কখন?

—তুমি একটু জেগে থাক। তোমার ঘুমোবার আগেই ফিরব।

—যদি না ফের?

নয়ন টর্চটা উঁচু করে দেখিয়ে বলে—তোমার বাতি নিয়ে যাচ্ছি তো, এটা ফেরত দিতেও ফিরব।

—ফিরো কিন্তু। কাল থেকে ডাক শিখব।

আরতির ঘণ্টা এখনও বাজছে। মাঠটা কোনাকুনি দ্রুত পার হতে থাকে নয়ন। জোনাকি পোকার মত আলো জ্বালে আর আলো নেভায়।

মোনা ঠাকুরের শরীর ছন্দে দুলে যায়। কী সুন্দর তার শরীরের কারুকাজ। যে-কোন নর্তকের চেয়ে নমনীয় তার শরীর···বেতের মত। কখনো পিছনে হেলে, কখনও সামনে ঝুঁকে নাচে। আলোয় দেখা যায়, মোনা ঠাকুরের মুখে এক বিহ্বল হাসি, চোখে জল, দৃষ্টি সম্মোহিতের মত মোহাচ্ছন্ন। তার প্রকাণ্ড ছায়া দেয়াল জুড়ে এক অপ্রাকৃত ছায়ার সঞ্চার করে। সেই দৃশ্য দেখে শ্যামার ভয় করে! এ যেন এক অন্য জগতে চলে এসেছে সে। ধুনো আর গুগ্‌গুলের গন্ধের সঙ্গে ঘষা চন্দন আর ফুলের গন্ধ মিশে গেছে। মন্দিরের বদ্ধ বাতাসে শতাব্দী ধরে সঞ্চিত শীতলতা! এ যেন এই জগৎ নয়।

মা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। বাবা চোখের জল মোছে। শ্যামার হাত-পা আড়ষ্ট লাগে, পিপাসা পায়। তার মাথা ঝিম্‌-ঝিম্‌ করে। মনে হয়, সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। সে স্পষ্ট দেখতে পায় আরতির ঘণ্টার সঙ্গে নাচতে নাচতে, কেঁদে হেসে মোনা ঠাকুর কালীর সঙ্গে কথা বলছে। বিপুল কালীমূর্তির দুই চোখে ভয়াল দৃষ্টি, লোল জিহ্বায় আলো পড়ে ঝিকিয়ে ওঠে হিংস্রতা। ঘাম-তেল গড়িয়ে নামছে মুখ বেয়ে। শ্যামা চোখ ফিরিয়ে নেয়। অনেকক্ষণ অসাড় লাগে তার মন। মনে হয়, মোনা ঠাকুরের কথার উত্তরে ঐ মূর্তি এক্ষুনি হেসে উঠবে, কথা বলবে।

আরতি শেষ হতে হতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল। তখনও মোনা ঠাকুর মাটিতে পড়ে আছে। কাঁদছে। তারপর অসাড় হয়ে গেল। মোনা

ঠাকুরের রোজ আরতির শেষে ভর হয়।

দৃশ্যটা দেখে বাবা স্তব্ধ হয়ে থাকে! মা শব্দ করে কাঁদে। শ্যামার শরীরে ঘাম দেয়।

ঘোর ঘোর একটা মানসিক অবস্থা বহু দূর পর্যন্ত তাদের সঙ্গে সঙ্গে যায়। রওনা হতে হতে পৌনে আট। রাস্তা অন্ধকার। গাঁয়ের লোকেরা কিছুদূর সঙ্গে সঙ্গে এল, তারপর তারা তিন জন। আর কেউ নেই। কেউ কথা বলতে পারছে না এখনও।

আমবাগানের সামনে এসে বাবা থমকে দাঁড়ায়, মুখ ফিরিয়ে বলে… এ যে ভীষণ অন্ধকার! কি করে যাবে?

মার এখনও সঠিক জ্ঞান ফেরে নি যেন। মা কাঁদছে এখনও। ধরা গলায় বলে…ভয় কি! চল ঠিক চলে যাব।

—যেতে তো হবেই। কিন্তু এই অন্ধকারে খুব রিস্ক। বেলাবেলি চলে গেলে কোন ঝামেলা ছিল না।

—তোমার কেবল পিছু টান। কোথাও তোমার সঙ্গে গিয়ে শান্তি নেই। ঠাকুর দেবতার ব্যাপার, সেখানে দু দণ্ড মনটাকে রাখতে হয়, ঘরের চিন্তা করলে কি চলে?

বাবা বিড় বিড় করে বলে…সাপখোপ কত কী আছে হয়ত।

তবু যেতেই হবে। বাবা শ্যামাকে ডেকে বলে…তোকে নিয়েই ভয়, আমরা দুনিয়ার বার। তুই মাঝখানে থাক, সামনে আমি পিছনে তোর মা। বলে বাবা গলা খাঁকারি দেয়। দু তিনবার হাতে তালি বাজিয়ে শব্দ করে।

শ্যামা এই সময়েও ঐ কাণ্ড দেখে হেসে ফেলে বলে…ও কি করছ?

দেশ-গাঁয়ে অন্ধকারে এভাবে শব্দ করে হাঁটতাম। জীবজন্তু সব শব্দ পেয়ে সরে যায়।

বাবা বার বার গলা খাঁকারি দিয়ে হাঁটে। সামনের পথ খুবই আবছা। রাস্তা উঁচুনিচু। বার বার পায়ে ঠক্কর লাগে। কয়েক পা হেঁটেই বাবা বলে… কি করে যাবে? হাঁটাই যাচ্ছে না।

—চল তো, যা হবার হবে। মা কালী আমাদের দেখবেন। মা ধমকে বলে।

তবু বাবা সাহস পায় না। সাবধানে হাঁটে। পা দিয়ে রাস্তা হাতড়ে।

নয়ন কি চলে গেছে! শ্যামা উৎকর্ণ হয়ে চারদিককার শব্দ শুনবার চেষ্টা করে। ঝিঁঝির শব্দ ছাড়া কোন শব্দ নেই। এক-আধটা প্যাঁচার ডাক দূর থেকে শোনা যায়। ঐ কি নয়ন? কে জানে।

—এদিকে রাতে লোক চলাচল নেই দেখছি! বাবা চিন্তিত গলায় বলে।

মা ঝংকার দিয়ে বলে···তোমার অত ভয় থাকলে তুমি পিছনে এসো। আমি সামনে যাচ্ছি।

বাবা একটু রেগে গিয়ে বলে···তুমি বড় সাহসী কিনা! মেয়েছেলের এগারো হাতে কাছা হয় না, বড় বড় কথা।

তোমাদেরই কাছা দেওয়া উচিত নয়। ঘোমটা দাও। তখন থেকে কেবল চোর-ডাকাত সাপ-খোপের কথা বলে যাচ্ছ।

—তোমাদের আর কি? সঙ্গে পুরুষ মানুষ রয়েছে। সব হ্যাপা সে সামলাবে। তোমাদের গা আলগা দিয়ে থাকলেই হল।

কথা বেশিদূর গড়াল না। সামনের অন্ধকারে জোনাকি পোকা জ্বলছিল। তার মধ্যে একটা জোনাকি যেন একটু বড়। একবার অনেকক্ষণ জ্বলে নিভে গেল। লক্ষ্য করে শ্যামা বাবাকে ডেকে বলে··· বাবা, সামনে টর্চ, তাতে কেউ যাচ্ছে। দ্যাখো।

বাবাও দেখল। বলল···মনে হচ্ছে। তোরা পা চালিয়ে আয় তো!

মা ঝংকার দেয়···কী বুদ্ধি! যদি ছেলে-ছোকরা হয় তবে কি আমরা হেঁটে তাকে ধরতে পারব? ডাকো না লোকটাকে, দাঁড়াতে বল।

বাবা বিড় বিড় করে একবার বলে···কেমন লোক কে জানে! তারপরই গলা ছেড়ে ডাকাডাকি শুরু করে···ও মশাই, শুনছেন, এই যে···

সামনের বাতিটা থামে। একটা টর্চের মুখ চক্ চক্ করে ওঠে। তারা এগোয়।

লোকটাকে দেখা যায় না। টর্চটা নিচু করে ধরা। একটু মোটা ভাঙা গলায় লোকটা বলে—কিছু বলছিলেন আজ্ঞে?

বাবা বলে···কোন্ দিকে যাবেন? বড় রাস্তা পর্যন্ত?

—ওদিকেই।

—আমরাও যাব। অন্ধকারে বড় বিপদে পড়েছি।

—চলুন না, আমার সঙ্গে চলুন। কোথায় এসেছিলেন, কল্পতরুর মন্দিরে নাকি?

—হ্যাঁ। বড় জাগ্রত দেবতা। যা দেখে গেলাম ভোলবার নয়। আপনি কি এদিককার লোক? বাবা জিজ্ঞেস করে।

—পাশের গাঁ। মোনা ঠাকুরকে ছেলেবেলা থেকে দেখছি।

—কেমন লোক?

—কি আর বলি বলুন। তবে উনি আমাদের এই এলাকার গৌরব।

শ্যামা টর্চের আলোর আভায় প্রথমে প্যাণ্টের রঙটা চিনতে পারে। তারপর হলুদ শার্টটার আভাস পায়। গায়ে কাঁটা দেয় তার। শীত করে। নয়ন আড়ালে থাকলে যত ভয়, কাছে এলে এত ভয় করে না শ্যামার। কিন্তু বাবা মার সামনে এভাবে আসা ভীষণ বিপদজনক! যদি ধরা পড়ে যায় নয়ন! হাত পা শিরশির করতে থাকে তার।

তারা হাঁটে। আগে নয়ন, তার পিছনে তারা তিনজন সারিবদ্ধ।

বাবা নানা কথা বলতে থাকে। নয়ন মোটা ভাঙা গলায় উত্তর দেয়।

—এদিকের কোন ডেভেলপমেণ্ট হয় নি, না? বাবা বলে।

—কোন্ দিকটারই বা হয়েছে বলুন?

—রাস্তাঘাট কেমন এখানে?

—যেমন দেখছেন। এই সব রাস্তায় হেঁটেই আমরা বড় হলাম।

—বিপদ আপদ?

—সাপখোপ আছে।

—চোর ডাকাত?

—শুনি না তো বড় একটা।

বাবা একটু গম্ভীর থেকে বলে—চোর ডাকাত না থাক, অভাব তো আছে। অভাবী মানুষ, দুঃখী মানুষ যত বাড়বে ততই অমঙ্গল। সেই সব মানুষই রঙ পাল্টে চোর ডাকাত হয় কিনা! তা ছাড়া লাশ-ফেলা পলিটিক্স আছে। কাজেই ভয়-ভীতি এখন সর্বত্র।

—তা অবিশ্যি ঠিক। তবে এদিকে কখনও কিছু হয়নি। তবে হবে।

—কি করে বুঝলেন?

দেশের অবস্থা দেখে বুঝছি। শিগ্‌গিরই দেখবেন, এদিকেও লাশ পড়ছে।

শ্যামা অন্ধকারে আপন মনে একটু হাসে। কোথায় যেন বুনো ফুল ফুটেছে। তার গন্ধ পায় শ্যামা। মনটা চনচন্ করে ওঠে। ভাল লাগে।

ঐ তো টর্চ হাতে নয়ন সামনে চলেছে। এখন আর কোন ভয় নেই। তারা ঠিক বাস-রাস্তায় পেঁছে যাবে।

একটা আলু টপ্‌কে দিলেই মোনা ঠাকুর ফিনিশ। তার মা কালীর পায়ের তলায় শুয়ে রক্ত-বমি করতে করতে চোখের পটল ওল্টাবে। নয়ন সব জানে। তবে কিনা নয়নের সঙ্গে মোনা ঠাকুরের কোন ঝগড়া নেই। কিন্তু লেগে যাবে একদিন।

মন্দিরের আরতি হয়ে গেছে। শিকের দরজা পড়ে গেছে মন্দিরে। শিকের ফাঁক দিয়ে বিগ্রহ দেখা যায়। কালীমূর্তি বাঙালী মাত্রেরই আজন্ম চেনা। সেই জিভ-বের করা আধ-ন্যাংটো নৃমুণ্ডমালিনী। কোন ভক্ত যেন সোনার চোখ গড়ে দিয়েছিল, সেই সোনালী চোখে প্রদীপের আলো ঝলসাচ্ছে, আর গায়ের ঘাম তেল! নয়নের কোন আগ্রহ ছিল না, কেবলমাত্র মন্দিরটার কারুকাজ আর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কিছু কৌতূকবশতঃ সে জুতো ছেড়ে মন্দিরের বারান্দায় উঠে এল। ফুল বেলপাতা ধুনো ঠাণ্ডা গুগ্‌গুল এসব গন্ধ তো আছেই, কিন্তু সব ছাপিয়ে ওঠে এক-দেড়শো বছরের ছায়ায় ঢাকা শ্যাওলা-পড়া স্যাঁতসেঁতে গন্ধ। মন্দিরের বারন্দাটা ঠাণ্ডা হিম। চামচিকে আর কবুতরের শব্দ পাওয়া যায়। কেউ কোথাও নেই। নয়ত ঝুলন্ত ঘণ্টাটায় একবার টং শব্দ করে, তারপর শিকের দরজাটা নেড়ে দেখে। তালা দেওয়া। বারান্দার দিকে দু পাট ভারী, লোহার গুল মারা দরজা খোলা রয়েছে, সে দুটো আরও রাতে বন্ধ করে দেওয়া হবে। দুটো শিক দু হাতে ধরে নয়ন মন্দিরের আধো-অন্ধকার ঘরখানা দেখল। এই ঘরে মোনা ঠাকুরের ভাব হয়, দৈববাণীও নয় নাকি, কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে ভূতের গায়ের গন্ধে ম ম করে চারদিক। দুটো শিক দু হাতে চেপে নয়ন কালীর সোনার দুটো চোখের দিকে স্থির চেয়ে রইল একটুক্ষণ। এই চোখে প্রাণসঞ্চার হতে কেউ কেউ দেখেছে। নয়ন চেয়ে থাকে। আলো-আঁধারির ভিতর থেকে দুখানা নিষ্প্রাণ সোনার চোখও চেয়ে থাকে তার দিকে। কালীর গায়ে কিছু খাঁটি, নিরেট সোনার গয়না লক্ষ্য করে নয়ন। বিগ্রহের বেদী পুরোটা রুপো দিয়ে মোড়া। এই হচ্ছে মোনা

ঠাকুরের স্টেজ। সঠিক আলো গন্ধে শব্দে রহস্যময় আবহ, দর্শকরা নিরক্ষর গরীব ভবিষ্যৎ-ভীরু মানুষ, এই মঞ্চে মোনা ঠাকুর ভর হওয়া রামকৃষ্ণের অভিনয় করে। দর্শকরা রোমাঞ্চিত হয়। চোখের জল ফেলে। তবু মোনা ঠাকুরের ওপর কোন আক্রোশ ছিল না নয়নের। কারণ এ অঞ্চলে সে আজই প্রথম এসেছে। এসেছিল শ্যামার পিছু নিয়ে। শ্যামা কোনদিনই পাত্তা দিল না তাকে। নয়ন সবই বোঝে। তবু ছাড়তে পারে না। শ্যামা তাকে ভালবাসে না হয়ত। তাতে নয়নের খুব বেশী কিছু যায় আসে না। হৃদয়ের খেলা পৃথিবীতে শেষ হয়ে গেছে। এটা প্রয়োজনের যুগ। কাউকে কাউকে কারও কারও প্রয়োজন হয় মাত্র। যেমন, নয়নের প্রয়োজন শ্যামাকে। যদি সারা জীবনের জন্য নাও হয় ক্ষতি নেই, অন্তত কিছুদিনের জন্য শ্যামাকে তার পেতেই হবে।

ঘটনাটা ঘটেছিল এইভাবে। শ্যামা আজ তার মা বাবার সঙ্গে এইখানে মোনা ঠাকুরের মন্দিরে আসবে এই খবরটা নয়ন শ্যামাদের বাচ্চা চাকটার কাছে আজ সকালেই পেয়ে যায়। সময়টা জানা ছিল না। তবু অনেক সকালেই সে জাতীয় সড়কের ধারে বাস থেকে নেমে গাঁয়ের হাটে অপেক্ষা করছিল। তখনই হাটের লোকজনের কাছে সে মোনা ঠাকুরের সব কাহিনী জেনে নেয়। শ্যামারা এসেছিল হেমন্তের বিকেল যখন মানুষজনের ছায়া দীর্ঘতর করেছে, ধানের রূপসী মুখে কনে দেখা আলো তখন। শ্যামাকে সে একবার দেখেছিল মাত্র, তারপরই ভীড়ে ডুব দেয়। কারণ শ্যামার বাবা মা তাকে দেখলে স্ট্রোক হওয়ার ভয় আছে। নয়ন জানত, শ্যামারা যাবে আমবাগানের ভিতর দিয়ে। সেটা দীর্ঘ পথ। নয়ন হাটের লোকজনের কাছে জেনে নিয়েছিল মোনা ঠাকুরের কালী মন্দিরে যাওয়ার একটা জঙ্গুলে ছোট পথ আছে। ভাঙা বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে যাওয়া যায়। খানিকটা তাড়ি গিলেছিল সে তারপর। যখন হাঁটা দিয়েছে তখনই মাথাটা এলোমেলো, ঠিক মনে নেই, আবছা মনে পড়ে একটা ভাঙা বিপজ্জনক সাঁকো বুক হেঁটে পেরিয়ে জঙ্গল ভেদ করে আমবাগানের ভিতর একটা ভাঙা বাড়িতে শ্যামার পথ চেয়েছিল সে। পেয়েও ছিল শ্যামাকে। কি সব উল্টোপাল্টা কাণ্ড করেছিল যে! শ্যামার বাবা মা একটু এগিয়ে গেছে তখন, আর শ্যামা পোড়ো বাড়িটার হাতায় ভাঙা ফোয়ারার পাশে একটা লতানে গোলাপ গাছ থেকে একটি গোলাপ তুলছিল। সে সময়ে নয়ন তাকে আক্রমণ করে।

উল্টোপাল্টা কী সব বলছিল যেন, বিয়ে করতে চেয়েছিল শ্যামাকে। তারপর জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করেছিল। সবটাই তাড়ির ঘোরে। নইলে অতটা যেন হয়ত করত না। ঠিক সেই সময়ে একটা লোক তার বাচ্চা ছেলেকে এক হাত ধরে, অন্যহাতে একটা জীবন্ত গোখরো সাপ নিয়ে তাদের পথে এসে পড়েছিল। ছেলেটা চীৎকার করে ওঠায় তার ঐ উন্মত্ত আবেগ কেটে গিয়েছিল।

নয়নের একটা দোষ এই যে কোন একটা ব্যাপারে তার মন বেশীক্ষণ লেগে থাকতে পারে না। তার মনটা টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সুইচবোর্ডের মত। মুহুর্মুহু লাইন পাল্টে কানেকশন্ নেয়। লোকটার হাতে ঐ সাপ দেখে সে শ্যামাকে ভুলে লোকটার পিছু নেয়।

এই জায়গার কিছুই নয়ন চেনে না। শ্যামারা শেষ বাসে চলে গেল। শ্যামার বাবা মা টের পায়নি যে নয়ন এতদূর এসেছিল। সবই ঠিক আছে। কিন্তু এখন বড় একা লাগছে তার। নিঃসঙ্গ অবসাদগ্রস্ত।

কালীর সোনার চোখের দিকে চেয়ে সে খুব গভীরভাবে শ্বাস নিল। দেড়শো বছরের পুরোনো একটা গন্ধে ভরে গেল বুক। তাড়ির কিছু নেশা এখনও তার মাথার মধ্যে রয়ে গেছে। টলমল করছে মাথা। ঠিকমত চিন্তাশক্তি এখনও ফিরে আসছে না। হরবোলা নয়ন দুটো শিস দিল। অবিকল তিতিরের মত। তারপর পুরোনো মন্দিরের গাছ শুঁকে শুঁকে বারান্দায় ঘুরে বেড়াল খানিকটা। অন্ধকার চারদিক। মোনা ঠাকুরের বাড়ির বাইরের ঘরে লণ্ঠনের আলো দেখা যায়। সে শুনেছে আরতির পর ঐ ঘরে একটা ধর্মসভা হয়। গাঁয়ের চাষীরা আসে, সাধারণ মানুষেরা আসে, বুড়ো-বৌ-বাচ্চারা ঘিরে বসে। মোনা ঠাকুর তাদের ধর্মের কথা শোনায়। শ্যামারা এখানে কেন এসেছিল তা ঠিক জানে না নয়ন। তবে আন্দাজ করতে পারে, শ্যামার দাদা বছর পাঁচেক আগে পাগল হয়ে নিরুদ্দেশ হয়। বহুকাল ধরেই শ্যামাদের পরিবারের ঐ একটা দুঃখ, বহু সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে ওরা যায় পাগল ছেলের খোঁজ পাওয়ার জন্য। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে শ্যামা নিজেই। রঙটাই যা ময়লা শ্যামার, নইলে শ্যামার চটক আছে। ঐ কালো রঙ উপেক্ষা করে পুরুষেরা ওর জন্য পাগল। তাদের কাউকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা শ্যামার নেই। সর্বোপরি রাহুর মত নয়ন লেগে আছে পিছনে। শ্যামাকে নিয়েও ওদের ভয় কম নয়। কে যেন কবে টান দিয়ে শ্যামাকে নিয়ে

যায়। তার সঙ্গে কবে শ্যামার বিয়ে হবে এটা জানাও ওদের দরকার। সেই কারণেই মোনা ঠাকুরের কাছে আসা।

মোনা ঠাকুরকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাববে কি না ঠিক বুঝতে পারে না নয়ন। প্রতিদ্বন্দ্বী তার অনেক, প্রতিদিনই এক-আধজন বেড়ে যায়। মন্দিরের ঘণ্টায় আর একবার টং করে শব্দ করে সে অন্যমনস্কভাবে। মোনা ঠাকুরের বাইরের ঘর থেকে একটা লোক লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে দূর থেকেই প্রশ্ন করে···কে ?

নয়ন উত্তর দেয় না, লোকটা এগিয়ে আসে, জবুথবু বুড়ো একটা লোক। হেমন্তের শীতেই মাথা-মুখ ঢেকে চাদর জড়িয়েছে। কুঁজো হয়ে মাঠটা পেরিয়ে এসে লণ্ঠনটা তুলে ধরে বলে···কে আজ্ঞে ?

—কেউ না। মন্দির দেখতে এসেছি। আমাকে চিনবেন না।

লোকটা গলায় কফের শব্দ করে বলে—এত রাতে কোথা থেকে এলেন আজ্ঞে ?

—যেখান থেকেই আসি না, আপনার কি ?

লোকটা স্তম্ভিত এবং ভীত মুখে চেয়ে থাকে একটুক্ষণ। নয়ন একটা সিগারেট ধরায়, মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়িয়েই লোকটা লণ্ঠন তুলে ধরে আছে। নয়ন লোকটার মুখ দেখে। সর্বভারতীয় মুখ একখানা, পথে-ঘাটে বাজারে হাটে গঞ্জে একরকম একই রকম বৈশিষ্ট্যহীন মুখ যে নয়ন কত দেখেছে। এসব মানুষকে একজনের থেকে আর একজনকে আলাদা করে চেনাই মুশকিল।

লোকটা লণ্ঠন নামিয়ে নিয়ে বলে—দেখুন আজ্ঞে। মন্দির দেখতে বাধা কি ? মায়ের মূর্তিখানা বুক ভরে, নয়ন ভরে দেখে নিন। তবে কিনা দিনকাল খারাপ ?

নয়ন ঝেঁঝে উঠে বলে—কিসের খারাপ ?

লোকটা নরম সুরেই বলে···গাঁয়ে অচেনা লোক এলে মানুষের একটু গন্ধ লাগে। ছেলে-ছোকরারাও সজাগ। গাঁ চৌকী দেয়। আপনি নতুন নাকি আজ্ঞে ? কলকাতার লোক ?

—তা দিয়ে আপনার কি ?

—জিজ্ঞেস করি আর কি! এত রাতে নতুন লোক বলেই বলছি। অচেনা জায়গা।

নয়ন একটু হাসে···তা মায়ের স্থান যখন, ভয় কি ?

লোকটা কিছু বলে না। চেয়ে থাকে একটু। তারপর বলে—ঠাকুর তো আসরে বসে গেছেন। যদি যেতে চান তো চলে আসুন।

চকিত একটা লাফ দিয়ে নয়ন উঁচু বারান্দা থেকে বেড়ালের মত নিঃশব্দে মাঠে নামে। লোকটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে—ঠাকুর কে ?

—মোনা ঠাকুর আজ্ঞে আর কে হবেন! মনোময় দেবশর্মা তিন পুরুষে এই মন্দিরের পুজারী। ওঁর ঠাকুর্দা নরবলি দিতেন। দু হাতের দশ আঙুলে ওঁদের যা শক্তি তা দিয়ে গ্রহ-নক্ষত্র এধার ওধার করে দেন। নাম শোনেন নি ?

তাড়ির নেশাটা এখনও ফিকে হয়ে লেগে আছে। নয়ন নইলে একটা উত্তর দিত ঠিক। দিল না। কেবল একটু হাসল। অবশ্য উত্তর দিলেও লাভ ছিল না। এরা যা একবার বোঝে তা সহজে ভোলে না। সে শুধু বলল…মোনা ঠাকুরের কাছে গেলে বশীকরণ করবে না তো ?

—কি বললেন ?

—বলি ভেড়া বানিয়ে রাখবে না তো ?

লোকটা হাসে…ঠাকুর কত কী করে তার আমরা কী জানি! তবে ভয় পাই না। উনি কাউকে ভয় দেখান না বড় একটা। ক্ষতিও করেন না।

—আপনি যান। আমি সময় হলে যাব।

লোকটা বিনীত ভাবে বলে—রাতে ঘণ্টার শব্দ করলে মায়ের বিশ্রাম ভেঙে যায়। মায়ের শয়ন হয়ে গেছে।

নয়ন চুপ করে থাকে। লোকটা তেমনি কোলকুঁজো হয়ে অন্ধকারে ফিরে যায় লণ্ঠন হাতে।

পকেট থেকে সুকুলের দেওয়া টর্চটা বের করে কুয়াশামাখা অন্ধকারে এধারে ওধারে ফেলে নয়ন। মন্দিরের ওপাশে একটা পুরোনো সুড়ঙ্গ আছে। বেশীদূর যাওয়া যায় না। রাস্তা বুজে গেছে। প্রাচীনকালে মানুষেরা সুড়ঙ্গ তৈরী করত। সব প্রাচীন সুড়ঙ্গই বোধ হয় এখন বন্ধ হয়ে গেছে। প্রাচীন সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে একদিন। নয়ন তা জানে। একটা আলু টপ্‌কালে কোথায় যাবে মোনা ঠাকুর!

কিন্তু মোনা ঠাকুরের ওপর তেমন কোন রাগ নেই তার। বলতে কী একজন মোনা ঠাকুর এখানে আছে বলেই শ্যামারা এইখানে এসেছিল আর এসেছিল বলেই আমবাগানে একপলকের জন্য শ্যামার দেহের স্বাদ পেয়েছিল সে। অবশ্য মোনা ঠাকুরের সঙ্গে একটা লড়াই শেষ পর্যন্ত

তাকে লড়তেই হবে। ধর্মকে উচ্ছেদ করাই হবে শেষ কাজ। মন্দির ভেঙে চৌরস করে যাবে রাজপথ, মসজিদ-গীর্জা ভেঙে তৈরী হবে ক্ষেত। তাতে সোনার ধানে ঢেউ খেলবে, কিংবা তৈরী হবে শিশুদের জন্য বাগান, যুবক-যুবতীদের মিলন-ক্ষেত্র। কী যে হবে তা নয়ন জানে না। কিছু একটা হবেই। হয়ত সেই সুদিন দেখার জন্য সে বেঁচে থাকবে না।

নয়ন বারান্দাটায় আবার ওঠে। উঁচু হয়ে বসে সিগারেটে শেষ কয়েকটা টান দেয়। তার আজকাল কেন যেন মনে হয়, আর খুব বেশীদিন সে পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে না। তার দিন ফুরিয়ে এসেছে।

উত্তুরে একটা বাতাস এল হঠাৎ। নয়নের শীত করে ওঠে। সে জবুথবু হয়ে বসে। চারদিকের নিস্তব্ধ শীতলতা অনুভব করে। আর শ্যামার কথা ভাবে। কালো, সুন্দর এবং দুর্লভ শ্যামার কথা, এই মন্দিরে আজ শ্যামা এইখানে এসেছিল।

থুতু ফেলে নয়ন উঠল। গায়ের পাতলা শার্টটা ভেদ করে বাতাস লাগছে। শ্যামার পিছু পিছু ফিরে যায় নি নয়ন। যায় নি ঐ সাপওলা লোকটার জন্য, হয়ত মোনা ঠাকুরের জন্যও। শ্যামাকে ঠিকই পেয়ে যাবে নয়ন, চিন্তা নেই। আপাতত মোনা ঠাকুর আর সাপওলা লোকটার রহস্য ভেদ করে যাওয়াটাই তার কাছে দরকার।

মোনা ঠাকুরের বাইরের ঘরে কয়েকটা ঝকঝকে লণ্ঠন জ্বলছে। কয়েকজন লোক এধার ওধার বসে আছে। দেয়ালে পিঠ দিয়ে মোনা ঠাকুর। তেমন কিছু চেহারা নয়। শরীরটা মেদহীন ঝরঝরে, গায়ের রঙ তামাটে, শুধু চোখ খুব উজ্জ্বল। খালি গায়ে একটা সাদা উড়ুনী মাত্র জড়ান। হাঁটু দুটো বুকের কাছে তোলা। পাশে বিড়ির বাণ্ডিল, দেশলাই।

নয়ন খোলা দরজায় দাঁড়াতে মোনা ঠাকুরই তার দিকে প্রথম তাকাল। সেই তাকানোর মধ্যে কোন বিস্ময় বা কৌতূহল নেই। প্রতিদিনই বহু মানুষ আসে তার কাছে, সুতরাং মোনা ঠাকুর আর বিস্মিত হয় না। কেবল ঘরের অন্য লোকেরা ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। বুড়োটা এসে বোধ হয় তার কথা আগে ভাগে বলে রেখেছে।

—আসতে পারি? নয়ন জিজ্ঞেস করে।

মোনা ঠাকুর শুধু ঘাড় নাড়ল। উত্তর দিল না।

নয়ন ঘরে ঢুকে চারদিকে একবার তাকায়। তার ভাবভঙ্গী সহজ এবং উদ্ধত। এই লোকগুলোর চেয়ে সে যে সব বিষয়ে উন্নত, এরকম একটা তাচ্ছিল্যের ভাব সে ইচ্ছে করেই ফুটিয়ে তোলে। চারদিকে কয়েকটা ছোট পাটির আসন পাতা। সে একটু পিছনের দিকে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল। ঘরে কোন কথা নেই। সবাই চুপ। যেন তার উপস্থিতিই ঘরের আবহাওয়াকে অস্বাভাবিক করে দিয়েছে। কেউ কথা বলছে না, সবাই অলক্ষ্যে নিঃশব্দে তার দিকে লক্ষ্য রাখছে। যেন এক্ষুনি কিছু একটা ঘটাবে নয়ন, কিছু অদ্ভুত কথা বলবে। সবাই তাই অপেক্ষা করছে।

মোনা ঠাকুর আস্ত একটা বিড়ি শেষ করে ফেলল। ততক্ষণ কেউ কথা বলল না। নয়ন দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে বসে চেয়ে আছে। আক্রমণ ইচ্ছে করলেই সে করতে পারে, কিন্তু মুড নেই। আপাতত, সে কেবল দেখে নিচ্ছে। হাটে মানুষজনের কাছে সে শুনেছে মোনা ঠাকুর এ অঞ্চলের প্রধান মানুষ। কয়েকটা গাঁ জুড়ে অখণ্ড রাজত্ব। হাত দেখা, কোষ্ঠী বিচার, সাপের বিষ নামান, মারণ বশীকরণ সবই মোনা ঠাকুরের হাতের পাঁচ। সম্মোহন বিদ্যায় ওস্তাদ। কলকাতা থেকেও ছুটির দিনে বিস্তর মানুষ আসে তার কাছে।

এরকম কোন মানুষের কথা শুনলেই নয়ন ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পাড়ার গুণ্ডা কিংবা রাজনৈতিক নেতা কিংবা যে কোন লাইনেই কেউ প্রধান হয়েছে শুনলে নয়নের ভিতর একটা স্বাভাবিক আক্রমণ করার ইচ্ছে জেগে ওঠে। হাত বাড়িয়ে লোকটাকে তার জায়গা থেকে ছিঁড়ে এনে ধুলোয় পিষে দিতে ইচ্ছে করে। এই পৃথিবীতে তার তুল্য বা তার চেয়ে বড় কেউ আছে, এই চিন্তাটাই সে সহ্য করতে পারে না।

বিড়িটা শেষ করে মোনা ঠাকুর তার দিকে তাকায়। নয়ন একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। চোখাচোখি তাকিয়ে মোনা ঠাকুর নরম গলায় জিজ্ঞেস করে···বাবুমশাই, জায়গাটা কেমন লাগল?

নয়ন ঘাড়টা পিছনে হেলিয়ে অবহেলায় বলল—খারাপ কি?

—এদিকেই কি কদিন থাকার ইচ্ছে?

—থাকতে পারি। ঠিক নেই।

—জায়গাটা ভালই। তবে কিনা আপনারা শহর-গঞ্জের মানুষ।

—আমি শহর-গঞ্জের মানুষ একথা কে বলল?

—নন ?

নয়ন একটু হেসে বলে···না। আমি সব জায়গার মানুষ। গ্রামেরও।

মোনা ঠাকুর একটু চুপ করে থাকে। অনেকক্ষণ পরে বলে—আসলে গাঁ আর শহর জুড়েই তো মানুষের জীবন। কোন্ ঠাঁইয়ে তার বাস তা থেকে বিচার হয় না। তা এখানে উঠেছেন কোথায় ?

—সাপওলা একটা লোক আছে, তার বাড়িতে রাতটা থাকব।

সাপওলা লোক শুনে আবার সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখে।

মোনা ঠাকুরের মুখে কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না, সাধারণ গলায় বলে—সাপওলা লোক তো একমাত্র জগদীশ। তা তার সঙ্গে আত্মীয়তা আছে না কি ?

—থাকলেই কি ?

—কিছু না। জিজ্ঞেস করলাম। মানুষজনের পরিচয় জেনে রাখাটা আমাদের অভ্যাস। তাহলে আপনি তার আত্মীয় নন ?

নয়ন দেয়ালে মাথাটা হেলিয়ে অবহেলায় বলল—না। আমি একটা মেয়ের পিছু নিয়ে এখানে এসে পড়েছিলাম। পথে সাপওলা জগদীশের সঙ্গে আলাপ।

মেয়ের পিছু নেওয়ার কথা শুনে দু-একজন তার দিকে তাকাল। মোনা ঠাকুরের মুখ তেমনই ভাবলেশহীন। নয়ন গ্রাহ্য করল না।

—থাকবেন ?

—দেখি। আমার কিছু ঠিক নেই।

মোনা ঠাকুর কথার মাঝখানে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। হাতড়ে বিড়ির বাণ্ডিল থেকে একটা বিড়ি নিয়ে ধরায়। তারপর হঠাৎ একটু হাসে। নয়নের দিকে চেয়ে বলে—সে আমাকে দেখতে পারে না।

—কে ?

—জগদীশ।

নয়ন চুপ করে থাকে।

মোনা ঠাকুর নিজেই বলে—জগদীশ এ গাঁয়ে আসে সার্কাসওয়ালাদের সঙ্গে। তোমার মনে আছে হরিপদ, সিংহের থাবা খেয়ে জগদীশের সেই যে পাঁজর ভেঙেছিল ?

লণ্ঠনওলা লোকটা বোধ হয় আফিং খায়। উড়ুনী জড়িয়ে উবু হয়ে মাথা ঝুলিয়ে বসে আছে। নিজের নাম শুনে মুখটা তুলে গলায় কফের

ঘড়্ঘড়ে একটা শব্দ করল মাত্র।

মোনা ঠাকুর নয়নের দিকে চেয়ে বলে—জগদীশ বড় কালীভক্ত ছিল। মায়ের থানে রোজ আসত। আমি একদিন তাকে বলি যে আমি কালী-টালী কিছু জানি না। আমি গুরু জানি। আমার পুজো হচ্ছে আসলে গুরুর পুজো। সে তখন উল্টে বলল—তাহলে আপনি ভণ্ড, কালী মানেন না তো পুজো করেন কেন? আমি উল্টে বললাম—তো রামকৃষ্ণদেব পুজো করত কেন? বেদান্ত মানলে তো মূর্তি পুজো চলে না! রামকৃষ্ণ ঠাকুরও আসলে যার পুজো করত সে দক্ষিণা কালী নয় গো, সে হচ্ছে গুরু। ঠাকুর নিজেই বলেছেন—মেয়েরা ততদিনই পুতুল খেলে যতদিন তাদের বে না হয়। সেই থেকে জগদীশের সঙ্গে আমার বখেরা। তা বাবুমশাই, বলেন তো কোন্টা ঠিক! এই মূর্তি-পুজো না গুরুপুজো?

নয়ন ঠিকমত শুনছিল না। শুধু বলল—কে জানে! মানুষের কত বাতিক থাকে?

—আপনি গুরু মানেন না?

—না!

মোনা ঠাকুর একটু, খুব সামান্য মাত্র, একপর্দা উত্তেজিত গলায় বলে—আপনি কখনও কারও কাছ থেকে কিছু শেখেন নি? এমন কি অ-আ-ক-খ-ও নয়?

নয়ন বিরক্ত হয়ে বলে—শিখব না কেন?

—তবে?

—তবে কি? কারও কাছ থেকে কিছু শিখলেই সে গুরু হয়ে যায় না কি?

—না মানলে হয় না, মানলে হয়।

—তাহলে তো আমার গুরু অনেক। যার কাছে যা শিখেছি, সবাই গুরু!

তাই তো। আপনার চেয়ে যার জ্ঞান-গুণের ওজন বেশী সে-ই গুরু। ওজনওলা লোক চাই। যার যেমন ওজন সে তেমন গুরু। আপনার গুরুদের মধ্যে কার ওজন সবচেয়ে বেশী বাবুমশাই?

নয়ন একটু হাসে! তারপর বলে—কার্ল মার্ক্স্।

মোনা ঠাকুর একটুও চমকায় না। বলে—তো সে-ই আপনার

সবচেয়ে বড় গুরু।

—আপনি মূর্তি মানেন না? তবে যে হাটে শুনলাম আপনার কালীমূর্তি নড়ে-চড়ে, কথা কয়?

মোনা ঠাকুর নিভন্ত বিড়িটায় আর একবার আগুন দেয়। নয়নের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বলে···বাবুমশাই, মেয়েটা কে?

নয়ন উদাস গলায় বলে··ওই মেয়েটিকে আমি বিয়ে করব।

শুনে লোকজন নড়ে চড়ে বসে। লণ্ঠনওলা লোকটারও ঝিমুনি চোট খায়।

মোনা ঠাকুর ঠাণ্ডা গলাতে বলে···ও, তারপর একটু চুপ থাকে, তারপর ধীরে বলে···একটা মেয়ে তার বাপ মার সঙ্গে এসেছিল বটে আজ বিকেলে। শ্যামলা রঙ, মুখে-চোখে শ্রী আছে। সে-ই কি?

—সে-ই। ওরা আপনাকে কি বলেছে?

মোনা ঠাকুর একটু অন্যমনস্ক চোখে শূন্যে চেয়ে থাকে। তারপর বলে···ঐ মেয়েটার বড় ভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করেছিল। সে বছর পাঁচেক ধরে নিরুদ্দেশ। মোনা ঠাকুর আবার বিড়ি ধরায়, তারপর বলে··· এমনিতে তো সংসারটা সুখেরই হওয়ার কথা ছিল। বুড়ো-বুড়ি, একটা ছেলে, আর একটা মেয়ে, ঝুট-ঝামেলা কিছু নেই। তবু একটা গাঁট পড়ে গেল। ভারী দুঃখ ওদের।

নয়ন অধৈর্যের গলায় বলে···শুধু ওদের ছেলের কথা জিজ্ঞেস করল? আর কিছু না।

মোনা ঠাকুরের মুখে একটা কুটিল হাসি ফুটে ওঠে, বলে?···আর তো মনে পড়ছে না। হাসিটা ঠোঁটে রেখেই মোনা ঠাকুর তার দিকে চেয়ে থাকে একটুক্ষণ, তারপর বলে···তা পাত্রী তো ভালই বাবুমশাই। লেগে যান।

বিদ্রুপটা ধরতে কষ্ট হয় না তার। ভিতরটায় দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে। কিন্তু তবু বাইরে সে শান্তই থাকে। স্থির ও কঠিন চোখে মোনা ঠাকুরের দিকে চেয়ে সে বলে···আমাদের বিয়ে কোন শালা আট-কাতে পারবে না।

মোনা ঠাকুর একটু নরম, যেন বা সান্ত্বনার সুরে বলে···আটকানোর কি। করবেন বিয়ে। গরীব-গুর্বো, কুষ্ঠে-ভিখিরিও বিয়ে করে। ও

আর এমন কি ? করলেই হয়।

—তার মানে ?

—বললাম বিয়ে তো আখছারই হয়। অঘোন পড়ল তো শানাই ধরল পোঁ। কান ঝালাপালা, বিয়ের মাসে এই মায়ের থানেই কত নতুন বর-বৌ আসে। বিয়ে সবাই করতে পারে। কলকাতার ফুটপাতে ভিখিরিদের বিয়ে দেখেন নি ?

নয়নের ভ্রূ কুঁচকে আসে, ভ্রূর তলা দিয়ে সে মোনা ঠাকুরকে নিরীক্ষণ করে বলে...বিয়ে যে হয় তা আমিও জানি। কিন্তু বিশেষ একজনের সঙ্গে বিশেষ আর একজনের বিয়ে হয় কি না সেটাই সমস্যা।

—আপনার বাধা কি ?

—আমরা তেলী, ওরা বামুন। ওর বাবা মা এ বিয়ে চাইছে না।

মোনা ঠাকুর সকৌতুকে তার দিকে চেয়ে বলে···আর মেয়েটা ?

—সে-ও চাইছে না। কিন্তু জাতের জন্য নয়, বাবা মার জন্য। কিংবা অন্য কারণ থাকতে পারে।

—তাহলে ?

—তাহলেও কিছু যায়-আসে না। আমি ওকে জোর করে কেড়ে আনব। কোন শালা কিছু করতে পারবে না।

—কে কি করবে বাবুমশাই ?

নয়ন স্থির দৃষ্টিতে মোনা ঠাকুরের দিকে চেয়ে বলল···ওরা ওদের ছেলের কথা ছাড়া আর কিছু বলে নি ?

—কি বলবে ?

—আমার কথা ? বলে নি যে নয়ন নামে একটা লক্কড় ছেলে শ্যামার পিছনে ছায়ার মত ঘোরে ? বলে নি সেই ছেলেটার জ্বালায় ওদের মেয়ে রাস্তা হাঁটতে পারে না ?

মোনা ঠাকুর মাথা নেড়ে বলে···না।

নয়ন একটু হাসে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করে···আপনি বাণ মারতে পারেন ?

মোনা ঠাকুর নয়নের চোখে চোখে চায়। তারপর মাথা নেড়ে বলে ...ওসব আমি জানি না।

নয়ন অবাক গলায় বলে···জানেন না ? কিন্তু লোকে বলে, আপনার বিজনেস-ই হচ্ছে বাণ মারা। সেই যে মাটিতে ছবি এঁকে ছোরা বসিয়ে

দিলে যার ছবি আঁকা হয়েছে সে মুখে রক্ত তুলে, হাত পা ছুঁড়ে দাপিয়ে মরে যায়? ওরা আপনাকে বলে নি নয়ন রায়কে বাণ মারতে হবে?

মোনা ঠাকুর দুঃখিত মুখ করে বলে…না বাবুমশাই।

নয়ন একটা কৃত্রিম স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলে—যাক, বাঁচা গেল।

মোনা ঠাকুর তার দিকে মিট মিট করে চেয়ে থেকে বলে—বাণ মারার চিন্তা করে খুব কি ভয় পেয়েছিলেন বাবুমশাই?

নয়ন কৃত্রিম গাম্ভীর্যে বলে…ভীষণ।

—আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না।

—কি মনে হয় না?

—যে আপনার ভয়-ডর আছে।

নয়ন একটু হাসে। তারপর শান্ত বিদ্রূপের গলায় বলে—আপনি তো ছবিতে বাণ মারেন! কিছু লোক আছে যারা সত্যিকারের মানুষটাকেই বাণ মারে, সামনা-সামনি। আপনার বাণের চেয়ে এই বাণ আরও বিপজ্জনক। দেখবেন? বলে নয়ন তার শার্টটা কোমরের কাছ থেকে টেনে তোলে, তারপর হাত দিয়ে পেট আর তলপেটের মাঝামাঝি দু-আড়াই ইঞ্চি একটা গভীর ক্ষত দেখায়। কয়েকজন লণ্ঠন তুলে ঝুঁকে পড়ে। দেখে। মোনা ঠাকুর উদাস মুখে বসে থাকে।

বছর চল্লিশ বয়সের ধূর্ত চেহারার একটি লোক ঝুঁকে দাগটা দেখে মুখে চুক্‌চুক্‌ শব্দ করে বলে—কি হয়েছিল?

—স্ট্যাব্‌। ঠাণ্ডা গলায় বলে নয়ন।

—জোর বেঁচে গেছেন, ছোরাটা ঠিকমত টানতে পারে নি। পারলে বাঁচতেন না।

মোনা ঠাকুরের দিকে চেয়ে নয়ন বলে—যারা আমাকে হিন্দু হোস্টেলের পাশের গলিতে এক রাতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তারা আপনার চেয়ে অনেক ভাল বাণ মারতে পারে। তাদের বাণে ভুলচুক হয় না। কলকাতায় এবং অন্য জায়গায় এরকম বিস্তর লোক নয়ন রায়কে বাণ মারার সুযোগ খুঁজছে। ভয় পেলে আমার চলে না মোনা ঠাকুর।

মোনা ঠাকুর উত্তর দেয় না। চিন্তিত মুখে অন্যমনস্ক হাতে হাতড়ে বিড়ির বাণ্ডিলটা খোঁজে। নয়ন তার চারদিকে চায়। লণ্ঠনওলা বুড়োর ঝিমুনি পুরোপুরি কেটে গেছে, হাঁ করে চেয়ে আছে নয়নের দিকে, গলায় অবিরল কফের শব্দ হচ্ছে ঘড়্‌ঘড়্‌। একজন প্রৌঢ় মানুষ

নস্যি রঙের খদ্দরের চাদর গায়ে সামনে বসে আছে, কালো হাতে সাদা একটা ঘড়ি, চোখে চশমা, বোধ হয় গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টার, নাড়ু-গোপালের মত থলথলে মুখ। লোকটা মোনা ঠাকুরের দিক থেকে ইতিমধ্যেই অর্ধেক ঘুরে বসেছে নয়নের দিকে। মুখে একটা বিস্মিত বোকা হাসি। চল্লিশ বছরের ধূর্ত চেহারার লোকটা নিশ্চিত পঞ্চায়েতের লোক, রোগা রোগা হাত-পা, মাথার চুলে প্রচুর তেল, গায়ে বিয়ের শালটা আধময়লা ধুতির ওপর বেমানান। লোকটা অনেকখানি ঘেঁষে নয়নের কাছাকাছি এসে গেছে। তার চোখে-মুখে চঞ্চল কৌতূহল। মোনা ঠাকুরের বাঁ ধারে আরও দুজন লোক বসে আছে। তারা চাষীবাসী শ্রেণীর, ভাবলেশহীন এবড়ো-খেবড়ো মুখ। চোখে নির্বুদ্ধিতার নিষ্প্রভতা। তারা নয়ন আর মোনা ঠাকুরের চাপান-ওতরটা ঠিকমত বুঝতে পারছিল না এতক্ষণ। ছুরি-ছোরার কথায় একটু চাঙ্গা হয়ে চেয়ে দেখছে নয়নকে। খুন-খারাপী যে তারা কিছু না দেখেছে এমন নয়, তবে নয়নের চোটপাটের কথাবার্তা যে তারা পছন্দ করছে তা তাদের মুখে সম্ভ্রমের ভাব দেখেই বোঝা যায়। মোনা ঠাকুরের ডান ধারে পুঁটুলির মত তিন চার জন মেয়েছেলে। তাদের রি-অ্যাকশন নয়ন এই অল্প আলোতে ঠিক বুঝতে পারল না। তবে এটা ঠিক, মোনা ঠাকুরের দিক থেকে সকলের মনোযোগ নিজের দিকে এনে ফেলেছে। সেটা পেরেছে বলে একটু তৃপ্তি বোধ করে নয়ন। এখন ইচ্ছে করলেই সে মোনা ঠাকুরের আসনটিকে একটি ধাক্কা দিতে পারে, কিন্তু তা দেবে না নয়ন। সময়ের অপেক্ষা করা ভাল। তাছাড়া, মোনা ঠাকুরের ওপর নয়নের যথেষ্ট রাগ হচ্ছে না।

অনেকক্ষণ বাদে মোনা ঠাকুর একটা শ্বাস ফেলে। নয়নের দিকে চায়। তারপর জিজ্ঞেস করে···আপনার কি অনেক শত্রু ?

নয়ন আত্মবিশ্বাসের হাসি হেসে বলে···অনেক।

—কেন বাবুমশাই ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে নয়ন হঠাৎ বলে—আপনি আমাকে বাবু-মশাই-বাবুমশাই বলছেন কেন ?

—শহরের মানুষ আপনারা, সম্ম-সম্মান করা ভাল।

—শহরের মানুষ কি আলাদা কিছু ? আমি শহর-গ্রাম আলাদা করে বুঝি না। এই যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা যেমন, আমিও তেমনি।

—তাই কি হয়। জায়গা বুঝে আমরা মানুষ চিনি।

—শহরের মানুষকে আপনারা বেশী সম্মান করেন কেন?

—তারা যে তাই চায়। গাঁয়ের লোকরা তাদের সমকক্ষ তো নয়।

—ওটা ছেঁদো কথা! আসলে আপনারা নিজেদের খাটো ভাবেন।

—তা হোক বাবুমশাই, তা হোক। লোককে শ্রদ্ধা-সম্মান করার শিক্ষা ভালই। ওতে ক্ষতি হয় না।

নয়ন ধরতে পারে কথাটার দ্বিতীয় অর্থ আছে, যা তাকেই বলা। নয়ন গায়ে মাখল না। কেবল বলল...আমার শত্রুর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না?

—আজ্ঞে।

—ঐ যে যেমন আমি ঐ মেয়েটাকেই চাই বলে ওর মা-বাপ আমার শত্রু, তেমন আমি আরও অনেক কিছু চাই বলে আরও অনেক আমার শত্রু।

মোনা ঠাকুর চুপ করে বিড়িতে টান দেয়। বিড়ি খাওয়ার একটা নিজস্ব ধরন আছে তার। যেন ধোঁয়া তার বুক পর্যন্ত পেঁছিয় না, গলা থেকেই ফিরে আসে। দু একবার ছোট্ট টান দিয়ে বলে···মেয়েমানুষের ক্ষমতা অনেক। মা হয়ে, বৌ হয়ে, মেয়ে হয়ে কত খেলা যে দেখায়। পুরুষের জান লবেজান। তা মেয়েমানুষ বাদে আপনি আর কি চান?

নয়ন মাথা নেড়ে বলে···মেয়েমানুষ চাই বটে, তবে ঐ মেয়েটিকেও চাই। ওকে না পেলে আমার খিদে মিটবে না।

কথাটার নির্লজ্জতা সবাইকেই স্পর্শ করে। এই নির্লজ্জতারও একটা স্বীকারোক্তির মত আকুলতা আছে। এর সাহস সবাইকে আকর্ষণও করে। ল্যাংটো কথার জোর বেশী।

নয়ন বলে···আর যা চাই তা হচ্ছে ক্ষমতা মোনা ঠাকুর। এই জায়গায় আপনার যেমন ক্ষমতা, দেশ জুড়ে তেমনি ক্ষমতা চাই। ক্ষমতা পেলে কী করব তার কি কোন ঠিক আছে? তবে হয়ত আপনাকে এবং আপনার মত লোকদের উচ্ছেদ করব। মন্দির-মসজিদ-গীর্জা ভেঙে তৈরী করব রাস্তা, ক্ষেত, শিশুদের জন্য বাগান। বড়লোকদের ধরে চাবকাব তারা বড়লোক বলে, গরীবদের ধরে চাবকাব তারা গরীব বলে। অলস আর চোরদের তাড়িয়ে দেব। কত কী প্ল্যান আছে আমার!

দেখবেন।

মোনা ঠাকুর একটু হেসে বলে···মেয়েমানুষদের ধরে চাবকাবেন তারা মেয়েমানুষ বলে আর পুরুষদের তারা পুরুষ বলে।

—তা কেন? আমি কি পাগল? মেয়েমানু আর পুরুষমানুষ দুটো দুরকম প্রাকৃতিক সৃষ্টি। সেটা তাদের দোষ নয়।

—তো গরীব বা বড়লোক হওয়াটা কি দোষের?

—নিশ্চয়ই। যে বড়লোক সে পাঁচজনেরটা একা ভোগ করে বলে দোষী. যে গরীব সে নিজের স্বার্থ বজায় রাখতে পারে না বলে দোষী।

এটা যুক্তি নয়, নয়ন জানে। কিন্তু কুযুক্তির মধ্যেও জোর প্রকাশ করাটা তার স্বভাব। তাতে কাজ হয়।

সবাই চুপচাপ তার দিকে চেয়ে আছে। আত্মতৃপ্তিতে তার ভিতরটা টুল টুল করে। নয়ন বাঁ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরায়। হেডমাস্টার আর গ্রাম-পঞ্চায়েতের লোক দুজন কথা বলছে গুনগুন করে। লন্ঠনওলা বুড়ো স্খলিত চাদরটা দিয়ে মুড়িসুড়ি দিয়ে বসেছে। বাইরে অবিরল ঝিঁঝির ডাকে। দূরে একঝাঁক শেয়াল চীৎকার করে। কুকুর কাঁদে। জ্যোৎস্না ফুটছে নাকি! কুয়াশায় মাখা জ্যোৎস্নার দৃশ্য নয়নের বড় প্রিয়! মলিন পৃথিবীর গায়ে কে যেন ছবি এঁকে দেয়! অলৌকিক ছবি।

উঠে পড়তে যাচ্ছিল নয়ন। ঠিক সেই সময়ে সে মেয়েটিকে দেখল। ভিতরের দরজায় কপাটের আড়ালে ছায়ায় মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। বিকেলেও দেখেছিল, শ্যামার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে মন্দিরের মাঠে। মোনা ঠাকুরের মেয়ে। মুখ চোখ খারাপ না। শরীরটাও ভালই। ভোগের চাল-কলা খেয়ে দিব্যি আছে। এমনিতে মেয়েটির প্রতি নয়নের কোন আকর্ষণ বোধ করার কথা নয়। কিন্তু শ্যামা ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে; তার নাগালের বাইরে, এই চিন্তাটা তার ভিতরে একটা আক্রোশ জাগিয়ে তোলে। শোধ নিতে ইচ্ছে হয়। ভীষণ খিদে জেগে ওঠে। এই মেয়েটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেললে এক ধরনের তৃপ্তিকর অবসাদ আসত তার। ভিতরটা তার কখনও জুড়োয় না। কখনও না। কেবল যখনই সে কোন মেয়েকে আক্রমণ করে, উন্মোচন করে ফেলে তার সবকিছু, নিংড়ে নেয় দেহ, কেবল তখনই একটা অবসাদের প্রলেপ পড়ে ভিতরটায়। নইলে সে জ্বলছে, জ্বলছে।

কপাটের ছায়া থেকে মেয়েটির চোখ তারই চোখে পড়ে আছে। সে তা স্পষ্ট অনুভব করে। নির্লজ্জের মত তাকিয়ে থাকে। হেডমাস্টার একবার গলা খাঁকারি দেয়, পঞ্চায়েতের লোক নড়ে চড়ে নয়নের আরও কাছে আসে, নয়ন সে সব খেয়ালই করে না। তাকিয়ে থাকে।

মোনা ঠাকুর হয়ত নয়নকে তাকিয়ে থাকতে লক্ষ্য করেই অনুচ্চস্বরে বলে—কপাটের আড়ালে কে রে? তারা?

মেয়েটি আলোর মধ্যে আসে। হাতে চাবি। বলে—বাবা মন্দিরের কপাটে তালা দেব?

—দে। উদাস গলায় বলে মোনা ঠাকুর।

পরনে পুজোর খাটো কাপড়, খোলা এলো চুল, মাজা পরিষ্কার শরীর, সতেজ দাঁত। সাজগোজ নেই বলে মেয়েটার সুস্বাদ শরীর তাকে আরও আকর্ষণ করে। তক্ষুনি উত্তেজিত হয়ে ওঠে নয়ন, হাত-পা নিশপিশ করতে থাকে তার। দাঁতে দাঁত চাপে সে। চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে মেয়েটা এক ঝলক চোখ তাকে দিয়ে যায়। আত্মবিস্মৃতের মত মেয়ের পিছু নেওয়ার জন্য নয়ন উঠে দাঁড়ায়। সে ইঙ্গিত বোঝে, সে নিমন্ত্রণ পেয়ে গেছে।

—দাদা কি চললেন? বলতে বলতে পঞ্চায়েতের লোকটা তার সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়, বলে—আমিও জগদীশের বাড়ির দিকেই থাকি, কুমোরপাড়া, চলুন এগিয়ে দিই।

—আমার সঙ্গী দরকার হয় না।

—দু চারটে কথাও বলব খন, চলুন না।

—'শুয়োরের বাচ্চা'। মনে মনে গাল দিল নয়ন। তার ভিতরটা ঝিমিয়ে এল!

বাইরে জ্যোৎস্না ফুটেছে ঠিকই। কুয়াশার পাতলা আবরণ চারদিকে একমাত্র এই হেমন্তেই এরকম অপার্থিব ব্যাপারটা দেখা যায়। দরজা থেকে দৃশ্যটা দেখে নিয়ে সে মুখ ফিরিয়ে মোনা ঠাকুরকে বলে—চলি।

মোনা ঠাকুর ঘাড় নাড়ে, তারপর বলে—বাবুমশাই, আজ সারা বিকেল এ অঞ্চলে খুব কোকিল ডেকেছে, তিতির পাখী ডেকেছে, আরও কত কী পাখী! পাখীর ভাষা যারা বোঝে তারা জানে ওসব আসল পাখী নয়। নকল।

নয়ন একটু হাসে। তারপর বলে—আপনি পাখীর ভাষা জানেন?

মোনা ঠাকুর মাথা নেড়ে জানায় যে সে জানে না। মুখে বলে… কিন্তু কেউ কেউ জানে।

লোকজন একটু অবাক হয়ে দুজনকে দেখছিল, সেই হেডমাস্টার লোকটা বলে উঠল—বাস্তবিক ঠাকুরমশাই, আজ কোকিলের ডাক খুব শুনেছি বটে। এ সময়ে এত ডাকে না তো!

নয়ন বা মোনা ঠাকুর কেউ কোন উত্তর দিল না লোকটার কথায়। কেবল নয়ন বলল—মোনা ঠাকুর, মনে হচ্ছে আপনি পাখীর ভাষা জানেন। নইলে ওটা যে নকল ডাক তা আজ পর্যন্ত কেউ ধরতে পারে নি।

মোনা ঠাকুর চুপ করে থাকে।

নয়ন হঠাৎ বলল—কিন্তু মোনা ঠাকুর, মানুষের মানব কথা যখন পাখীর ডাক হয়ে যায় তখন সে ভাষা বুঝবার ক্ষমতা আপনার নেই। ঐ নকল ডাকেও কিছু কথা বলা ছিল।

মাঠের রাস্তাটা মন্দির ঘুরে নাবালে নেমে গেছে। মন্দিরের দরজা বন্ধ করে মেয়েটা সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। অক্ষম আক্রোশে দৃশ্যটা দেখলে নয়ন। এমন নির্জনে, একাকী ব্যাধ ও হরিণ। পঞ্চায়েতের লোকটা ভালুকের মত তার গায়ে গা ঘষড়াচ্ছে। কিছু বলছে। নয়ন শুনছে না। মেয়েটার পা সিঁড়িতে ধীর হয়ে এল। শেষ দুটো সিঁড়িতে দুটো পা রেখে জ্যোৎস্নায় চেয়ে আছে তার দিকে। তারই দিকে! এসব সময়ে কোন ভাষা ব্যবহারের দরকার হয় না, শরীরই তো কথা, শরীর-গন্ধে শরীর চলে আসে কাছে। বৃথা তখন ভাষার ব্যবহার। নয়ন জ্বলে। হাত মুঠো পাকায়।

পঞ্চায়েতের লোকটা বলে—বুঝলেন?

মাঠ ঘুরে তারা নাবালে নেমেছে। মেঠো পথে একটা মাটির ঢেলায় হোঁচট খেয়ে সামলে নয়ন জিজ্ঞেস করে—কি?

—লোকটা সিদ্ধ পুরুষ।

—কে?

—মোনা ঠাকুর।

—ও।

—তবে ও'র ঠাকুর্দার আরও ক্ষমতা ছিল। শুনেছি তাঁর চোখের দিকে তাকান যেত না।

—ও।

—জগদীশের সঙ্গে আপনার আগে চেনাশুনা ছিল না?

—না।

—লোকটা বড্ড গোঁয়ার।

নয়ন চুপ করে থাকে। হুঁ-হাঁ কিছুই করে না। তবু লোকটা বলে···কি হয়েছিল জানেন? জগদীশ এসেছিল এক সার্কাসওলার সঙ্গে। খেলা-টেলা দেখাত না বড় একটা, বাঘ-সিংহীকে খাবার দিত। একদিন খাবার দিতে গিয়ে সিংহ ক্ষেপে থাবা মারে। পাঁজর ভেঙে হাসপাতালে পড়ে রইল আট ন মাস। সেই সময়ে তার খুব দেখাশোনা করেছিল হারাধন বারিক। জগদীশকে সেই-ই তার মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। বেশ কয়েক বিঘে জমি, নগদ টাকা এসব পেয়ে বিয়ে করে এই গাঁয়েই জমে গেল জগদীশ। বিয়ের সাত মাস বাদে তার ছেলে হল, বুঝলেন? বলে লোকটা খিক খিক করে একটু হাসে।

অন্যমনস্ক নয়ন বলে···বুঝেছি।

—কি বুঝলেন?

—বিয়ের পর জগদীশের ছেলে হল তো! সকলেরই হয়।

—দূর মশাই! ছেলে ঠিক সময়ে হলে তো দশ মাস লাগার কথা। এ তো হল সাত মাসে। কিছু বুঝলেন না! আরও দেখুন, জগদীশের চালচুলো নেই, ভিনদেশী, কেউ চেনেও না তাকে, তবু হারাধনদা তার সঙ্গেই বিয় দিল কেন! দুহাজার নগদ, দশ বিঘে জমিও তো সোজা কথা নয়! গাঁয়েও সুপাত্রের অভাব ছিল না। সব যোগাযোগ করে দেখলেই ব্যাপারটা বুঝে যাবেন।

জ্যোৎস্না! জ্যোৎস্না! অপার্থিব ছবি মলিন পৃথিবীর গায়ে। এই সময়ে কোন আবর্জনা চোখে পড়ে না নয়নের। সে মুগ্ধ এবং সম্মোহিতের মত হাঁটতে হাঁটতে বলে—ও।

—হারাধনদার মেয়েটা ছেলের জন্ম দিয়েই মরে গেল। বেঁচেই গেল বলা যায়। সত্যিকারের বেঁচে থাকলে পাড়াগাঁ দেশে বিস্তর কথা শুনতে হত তাকে।

—হুঁ।

লোকটা খিক্ খিক্ করে একটু হেসে বলে…কিন্তু জগদীশের বিশ্বাস ঐ ছেলে তারই। বুকের পাঁজর করে রেখেছে। ছেলের কোষ্ঠী করতে এসেছিল মোনা ঠাকুরের কাছে। ঠাকুরমশাই কোষ্ঠী করলেন বটে, কিন্তু ছেলের বাপের নাম কোষ্ঠীতে লিখলেন না। জগদীশের সঙ্গে ঠাকুর-মশাইয়ের ঝগড়া তখন থেকেই। জগদীশ বলে, আমিই ওর বাপ। মোনা ঠাকুর মাথা নেড়ে বলে, এর ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম। বুঝলেন মশাই, আমাদের মুখ থেকে এসব কথা বেরোলে তা আন-কথা কান-কথা, লোকে দোষ ধরে, বলে কুচ্ছো গাইছি। কিন্তু ঠাকুরমশাইয়ের কথা তো আর ফেলবার নয়! ও তো বাকসিদ্ধের কথা। মোনা ঠাকুরের মুখ থেকে কথাটা বেরোতেই লোকের স্থির বিশ্বাস হয়ে গেল। গাঁয়ে রটে গেল সব ব্যাপার-স্যাপার, যারা বিশ্বাস করত না তারাও বিশ্বাস করতে লাগল। জগদীশ সেই থেকে নিজে নিজে একঘরে। পাছে ছেলের কানে কথাটা যায় সেই ভয়ে সে কারও সঙ্গে মেশে না, কারও বাড়ি যায় না, শ্বশুরবাড়ির ছায়াও মাড়ায় না। চাষ-বাস করে, বাগান করে, বনে-বাদাড়ে সাপ ধরে বেড়ায়। বলে—আমিই গাঁয়ের লোকদের একঘরে করে দিয়েছি। বুঝুন আস্পদ্দা।

গাছের ছায়ায় জ্যোৎস্নার আঁকিবুকি। কোন গেরস্তর উঠোন তারা পেরিয়ে যাচ্ছিল। একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে উঠল। এ দেশের কুকুরগুলো পর্যন্ত কাজের নয়…ভাবল নয়ন। মানুষগুলোর মতই অপদার্থ। উল্টাবাগে দুটো লোক হেঁটে আসছে, একজন বলে…কে, দিগিন নাকি?

—হয়।

—কাল তো সাক্ষী দিতে সদরে যাচ্ছ!

—যাব।

—আমার ফর্মটা এনো। সঙ্গে কে?

—আনব! ইনি জগদীশের বাড়ি এসেছেন।

লোকটা দাঁড়িয়ে যায়…কোন্ জগদীশ? সাপওলা?

—হুঁ।

—তার আবার কে এল? তিন কুলে তো তার…

লোকটার কথার উত্তর না দিয়ে তারা হেঁটে যায়। একটা ভেজা

উদ্ভিদের গন্ধ উঠে আসছে আশপাশ থেকে। হাওয়া ঝলক দেয় মাঝে মাঝে। এদিকটায় বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। খেজুর গাছের গলায় কলসী। পায়ের পাতা ঘাসে পড়লে টপ্ টপ্ জল ঝরছে ঘাসের গা বেয়ে। শুকনো পাতা খসছে গাছের। শীতে নাকে জল সরছে। নয়ন দুটো হাত বুকে চেপে ধরে।

—আপনার কথাগুলি কিন্তু বেশ পষ্ট পষ্ট।

নয়ন উত্তর দেয় না।

লোকটা সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করে···মশাই কি পলিটিক্স-টলিটিক্স করেন না কি ?

—কেন ?

—জিজ্ঞেস করছি। কার্ল মার্কসের কথা বললেন কিনা!

—ও এমনিই।

—লাল-ঝাণ্ডার লোক এদিকেও আছে অনেক। তবে গাঁ-দেশের মানুষ তো সব, ঠিক ঠিক কিছু বোঝে না। আবছা আবছা ধরে নেয় ঠিক বিশ্বাসও করে না।

—কেন ?

সবাই তো গাঁয়ের লোকের ভালই করতে চায় মশাই, কিন্তু একদলের ভালর সঙ্গে আর একদলের ভাল যে বনে না। চাষী-বাসী গেঁয়ো লোকের মাথাও তো তেমন শার্প নয়, সব দলের ভাল ভাল কথা তো সেই সব ভোঁতা মাথায় সেঁদোচ্ছে! শেষে মাথার ভিতরে সব ভাল কথা খটাখটি লাগিয়ে তালগোল পাকায়। তখন আবার কথাগুলো ঝেড়ে ফেলতে তারা মায়ের থানে একটা ঢিপ্ করে নিয়ে যে যার কাজে লেগে যায়।

বলে লোকটা খিক্ খিক্ করে হাসে।

নয়ন উত্তর দেয় না।

লোকটা গতি ধীর করে বলে···আমি বাঁ ধারে যাব।

—আচ্ছা।

লোকটা গাছের ছায়ার একটা শুঁড়ি-পথে ঢুকে যায়।

সুকুল জেগেই ছিল। আবজানো দরজা ঠেলে সে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই সুকুল মশারি তুলে বাইরে আসে। উত্তেজিত গলায় বলে···

তুমি শেয়াল ডাক ডাকছিলে ?

—না তো !

—তবে যে শেয়ালের ডাক শুনলাম এইমাত্র !

—সে সত্যিকারের শেয়াল সুকুল।

সুকুল বলে···একবার ডাক না।

চিন্তান্বিত মুখে নয়ন বলে···এখন শুয়ে পড়। কাল সকালে তোমাকে অনেক ডাক শেখাব।

ভিতরের বারান্দায় রান্না করছিল জগদীশ। সাড়া পেয়ে ভিতরে এল। দুদান্ত স্বাস্থ্য আর চাষাড়ে চেহারার জগদীশ। কিন্তু তার মুখে নির্বুদ্ধিতা নেই। একটু হয়তো ভালমানুষী আছে, কিন্তু উজ্জ্বল চোখ-জোড়ার তীক্ষ্ন দৃষ্টি দেখে বোঝা যায় যে চোখ দুখানা অনেক কিছু লক্ষ্য করে।

জগদীশ সতর্ক চোখে তাকে লক্ষ্য করে হঠাৎ চাপা গলায় বলল··· অনেক দেরি হল আপনার।

নয়ন জামাটা খুলে কাঠের চেয়ারের পিঠে রেখে বলে···মোনা ঠাকুরের একটা ইণ্টারভিউ নিলাম।

—কী মনে হয় ?

—কিছু না। ফাঁকা আওয়াজ। একটা আলু টপকালেই···

জগদীশ মাথা নাড়ল, বলল···মোনা ঠাকুর শক্তিমান লোক।

—কিসের শক্তি ?

জগদীশ একটুক্ষণ ভেবে বলে...কারও প্রতি খুব ভালবাসা থাকলে মানুষ একরকমের শক্তি পায়। এই যেমন সুকুলকে ভালবাসি বলে আমি অনেক কিছু উপেক্ষা করতে পারি, অনেক সইতে পারি। ঠিক সেই রকম। মোনা ঠাকুরের ভালবাসা তার গুরুর ওপর। ঐখানে মোনা ঠাকুরের ফাঁকি বড় একটা নেই। শক্তিও সেখানে। আপনি বিশ্বাস করেন না ?

নয়ন অন্যমনস্ক ছিল, তার চোখের সামনে শ্যামার মুখ। সে বলল ···করি।

—যদিও মোনা টাকুরের সঙ্গে আমার সদ্‌ভাব নেই।

—কেন ?

জগদীশ একটু ম্লান হাসে, তারপর বলে···কিছু শোনেন নি ? গাঁয়ের সবাই তো জানে, আর বলাবলিও করে।

নয়নের খুব খারাপ লাগল হঠাৎ। সুকুল মশারির বাইরে বসে চৌকি থেকে পা দোলাচ্ছে। মুখখানায় শৈশবের সুন্দর হাবলা ভাব। একটু হাঁ-মুখ, চোখে অপার কৌতূহল। মাথার চুল অনেককাল কাটা হয় নি বলে চুলের চালচিত্তির মুখখানাকে ঘিরে ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। অবাক চোখে নয়নকে দেখছে সুকুল। ভাবছে, এ লোকটা কী করে অমন পাখীর ডাক ডাকে! ইস, ঠিক তো পাখীর মতই!

রাতকানা একটা গুবরে পোকা ভোঁ চক্কর দিচ্ছে। দেয়ালে দেয়ালে ঠোক্কর খাচ্ছে। সুকুল মুখ তুলে পোকাটা দেখে বলে…বাবা, দ্যাখো এরোপ্লেনপোকা।

নয়ন সুকুলের সুন্দর মুখখানা থেকে চোখ সরিয়ে নেয়।

জগদীশ বলল…যে যাই বলুক, সুকুল আমারই।

সুকুল তার বাবার দিকে চাইল। বড় বড় দুখানা চোখে একটা স্বাভাবিক কাজলটানা ভাব আছে। বিষণ্ণ চোখ। জগদীশের দিকে ওর তাকানোর ভঙ্গী এমন আকুল যে নয়নের আবার একটা শ্বাসকষ্টের মত হয়। সে মুখটা ফিরিয়ে জগদীশকে বলে…ওসব আমি পাত্তা দিই না।

গুবরে পোকাটা চক্কর দিচ্ছে তো দিচ্ছেই। দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে নেমে আসছে। সুকুলের মাথা ছুঁয়ে গেল বুঝি! জগদীশ তড়িৎ পায়ে গিয়ে একটা ঝাপটা মারল। কোন কোণে কোথায় ছিটকে পড়ল পোকাটা।

নয়ন বলল…ও পোকা কামড়ায় না।

—জানি। তবু সতর্ক থাকা ভাল।

সতর্কতার কথা শুনে নয়ন একটু হাসে। বলল…আপনি যদি অত সাবধানী, তো ছেলেকে নিয়ে সাপ ধরতে যান কেন?

জগদীশ গিয়ে সুকুলের পাশে বসে। বসতেই ওর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল সুকুল। শুয়ে নয়নের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। জগদীশ বলে…ভয়ঙ্করদের নির্বিষ করার শিক্ষা থাকা ভাল। একদিন তো সুকুলকে নিজে নিজেই চলতে হবে! ওকে তাই তৈরী করে দিচ্ছি।

সুকুল হাই তোলে। জগদীশ আলতো হাতে ওকে চাপড়ায়। মায়ের মত।

নয়নের দিকে চেয়ে বলে…বারান্দায় বালতিতে জল তোলা আছে।

হাত-মুখ ধুয়ে নিন।

নয়ন বাধ্য ছেলের মত ওঠে।

দরজার পাশেই দড়ির দোলনায় দুটো বেঁটে সাপের ঝাঁপি ঝুলছে। তার পাশে একটা স্ট্যাণ্ডের ওপর কাচের বাক্স! নয়ন দাঁড়ায়। কাচের বাক্সটার মধ্যে দুটো কেউটে। মাথায় রুইতনের চিহ্ন। শরীর পাক খেয়ে আছে। নিঃসাড, ঘুমন্ত যেন। ঝুড়ি দুটোর গায়ে একবার হাত রাখল নয়ন। নিস্তব্ধ। একটু হাসল। মুখ ফিরিয়ে দেখল, জগদীশ মন্ত্রমুগ্ধের মত তার কোলে আধ-ঘুমন্ত সুকুলের মুখের দিকে চেয়ে আছে। মৃদুস্বরে গল্প বলছে। বাইরে কুকুর কাঁদছে চাঁদের দিকে চেয়ে।

হাত-মুখ ধুয়ে নয়ন এসে দেখে সুকুল ঘুমিয়ে পড়েছে। তার চারধারে যত্নে মশারি গুঁজে দিয়ে জগদীশ একটা বিড়ি ধরিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বসে আছে কাঠের চেয়ারটায়। দুটো চোখ শূন্য। হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় তার আধখানা মুখ আলোকিত, বাকি আধখানা আবছায়। মুখের রেখাগুলো পাথরের মূর্তির মত স্থির। নয়নের হঠাৎ মনে হয় দুঃখচাপা জগদীশকে যে-রকম ভালমানুষ আর নির্বিষ মনে হয় ততটা সে নয়। খোঁচা খেলে ওর ভিতর থেকে প্রবল হিংস্রতা আর সিংহনাদ বেরিয়ে আসতে পারে।

কাচের বাক্সটার সামনে দাঁড়ায় নয়ন। মৃদু আবছা আলোয় তাদের দেখা যায়। সাপ আর সাপিনী। আবছা সরীসৃপ শরীর দুটো বালুর ওপর অনেক রেখা এঁকেছে। তীব্র আগ্রহে নয়ন দেখে। তার শ্বাস গভীর ও দ্রুত হয়। হাত দুটো নিশপিশ করে। কেমন ফুল তোলার মত অনায়াসে জগদীশ বন-জঙ্গল থেকে তাদের গোপন শরীর তুলে আনে।

হ্যারিকেনটা তুলে আনে নয়ন। কাঁচের বাক্সটার ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখে। কী চমৎকার সতেজ কালচে শরীর! যখন ছোবল তোলে তখন কী মারাত্মক আকর্ষণকারী সেই আক্রমণের ভঙ্গী। বিষ! বিষ! আর চিন্তাশূন্য আক্রমণ।

বাক্সটার গায়ে ছোট্ট দুটো টোকা দেয় নয়ন। তারপর দুটো জোর টোকা দেয়।

জগদীশ পিছন থেকে বলে·· কী করছেন! ও দুটোর আবার বিষ-দাঁত উঠেছে, কামাতে হবে। চলে আসুন।

—আমি দেখব।

—কী?

—ওদের—কথাটা শেষ না করে হাসে নয়ন। বিলোল হাসি।

—কী বলেছেন? জগদীশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

একটা হতাশার শ্বাস ফেলে নয়ন বলে—কিছু না। চলুন খেয়ে নিই।

জগদীশ বলে…চলুন।

বলে ওঠে।

রাত খুব বেশী হয় নি। কিন্তু পাড়াগাঁ বলে অনেক রাত মনে হয়।

খেতে বসে জগদীশ হঠাৎ বলে…মানুষ কোন কোন ব্যাপারে নিয়ম মানে না। কিন্তু জীবজন্তুরও একটা নিয়ম আছে।

—কী রকম?

জগদীশ একটু হেসে বলে…আপনি ঐ সাপ দুটোর কী অবস্থা দেখতে চেয়েছিলেন?

নয়নের মুখটা লাল হয়ে যায়, সে তরল ভাবে হাসতে থাকে। বলে—ভালবাসা।

জগদীশ মাথা নেড়ে বলে…বুঝেছি! তাই বলছিলাম যে মানুষ সময় মানে না, দিনক্ষণ মানে না। এ এক আশ্চর্য। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাত সবচেয়ে বেশী প্রকৃতির নিয়ম ভাঙে। সাপ কুকুর বেড়ালও মানুষের মত এত নির্লজ্জ নয়। তারা নিয়ন মেনে চলে। একজোড়া সাপ আর সাপিনী এক জায়গায় আছে বলেই যে তারা যা-খুশী করবে এমনটা দেখা যায় না। ঠিক সময়টি এলে, ক্ষিদে জাগবে, আর তখনই মাত্র আপনি যা দেখতে চাইছেন দেখতে পাবেন। নইলে শতবার ঐ বাক্সটা নাড়ালেও লাভ হবে না।

বলে জগদীশ হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলে…মানুষের মত বেলাজা কেউ নয়। ক্ষিদে না পেলেও খাবে। খাওয়া, ভোগ এসবই তার সর্বস্ব।

খেয়ে উঠে জগদীশ স্কুলের বিছানায় শুতে গেল। পাশের ঘরে নয়নের বিছানা। সুন্দর পরিপাটি মশারি টাঙানো, জলের গেলাসটি ঢাকা দেওয়া, কোথাও খুঁত নেই। ঠিক যেন মেয়েলী হাতের কাজ। কার যে কোথায় ভাত মাপা থাকে! নইলে নয়ন তো আজ বিকেল অবধি লোকটাকে চিনতই না এখনও যে চেনে তা নয়। শুধু জানে লোকটা

সাপ ধরে, ছেলেকে (সে নিজের হোক আর অন্যেরই হোক) বড্ড ভালবাসে। আর জানে, লোকটা গৃহকর্মে নিপুণ।

ছাঁচবেড়ার ঘর। ফুটো-ফাটা আছে। হেমন্তের গড়ানে রাত। টেনে বাতাস দিয়েছে একটা। শুকনো পাতার শব্দ পাওয়া যায়। দুদ্দাড় শেয়াল বা কুকুর দৌড়ে গেল উঠোন ভেঙে। বাতাসের শিস্ শোনা যায় বেড়ার ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে। এতে কোন অসুবিধে হয় না তার। গত একবছর তার জীবন এরকমই কেটেছে। সেবার বুড়ি ঝি সুখীয়ার চোখে ছানি পড়লে সে দেশে গেল। বাড়িতে কাজের লোক ছিল না। তখন সুন্দরবনের দিকে বান ডেকেছিল বলে কলকাতার ফুটপাত ভরে উঠেছিল জোয়ানমদ্দ মেয়ে-পুরুষে। কালো কালো চেহারার হাবা মানুষ সব, দিনমানে ভিক্ষে করে, রাতে চুরি। ফুটপাতে ছেঁড়া কাঁথার সংসার বিথিয়ে ছানাপানা জাব্ড়া-জাব্ড়ি করে বসে। ঝাঁকড়া চুলের উকুন মারে, গালাগাল দিয়ে পরস্পর ঝগড়া করে। গা-ছাড়া ভাব। বান হয়েছে তো করব কী, এই রকম গা-সওয়া নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে দিনের পর দিন বসে থাকে কলকাতার রাস্তায়। গাছতলায় বেলাশেষে কুড়োন কাঠ কাগজ ঠেসে ইঁটের উনুন জেবলে মেটে-হাঁড়িতে নাড়ি-ভুঁড়ি, তরকারীর খোসা, গমের ভুষি, খুদসেদ্ধ চাপায়! তারই মধ্যে আবার পাথরের টুকরো ফুটপাতে ঘষে মশলা বাটে। সেই সব আধা-মানুষের সমাজ থেকে একটা নোনা মেয়েমানুষে তুলে আনল বড় জামাইবাবু। শাশুড়ি ঠাকরুণের কষ্ট বুঝে ঝি ঠিক করে দিয়ে গেল। নোনা মেয়েছেলেটার গা-গতর যে ভাল তা দিন সাতেক খাওয়া-দাওয়া করার পরই বোঝা গেল। কোল-পোঁছা একটা ছেলে, স্বামী হাজত খাটছে কার বাজারের থলে টেনে দৌড়েছিল বলে। ঝাড়া হাত-পা সেই মেয়েটিকে নয়ন লক্ষ্য করেছে কখনও-সখনও। লক্ষ্য একবার করলে নয়নের দেরী সয় না। সন্ধের ঘোরেই বাড়ি নিঝুম। বাবা উকিল মানুষ, বাইরের ঘরে মক্কেল ঠাসা, দম ফেলার সময় নেই। মা হাই ব্লাডপ্রেসার নিয়ে সন্ধের পরই মশারির নীচে যায়, হাতপাখা নাড়ে। ঠাকুর রান্নাঘরে। মেয়েছেলেটা সিঁড়ির নীচে ছেলে ঘুম পাড়াতে গেছে। সেই সময়ে নয়ন গিয়ে তাকে ঠেসে ধরে। চালটায় ভুল ছিল। চেঁচানিতে মক্কেল সুদ্ধু বাবা চলে এসেছিল। বেড়ালের মত ছুটেছিল নয়ন। কিন্তু মক্কেলদের মধ্যে একজন ছিল দৌড়ের চ্যাম্পিয়ন। সদরে তাকে জাপটে ধরে ফেলল। পক্কে

অবশ্য উকিলবাবুর ছেলে শুনে সে খুবই ম্রিয়মান হয়ে পড়ে, কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে। সেই রাতেই বাবা তাকে বের করে দেয়। সেই মেয়ে মানুষটাকেও। সেই থেকে বাইরে বাইরেই কাটে নয়নের। কোন কিছুর ঠিক থাকে না। খাওয়া, শোওয়া এইসব অবশ্য ভাববার ফুরসতই পায় না সে। তারটা দশজনই ভেবে আসছে একবছর ধরে। নয়ন কেবল শ্যামার কথা ভাবে, বা আর কিছু। বাড়ির সদর বন্ধ হলেও মায়ের জন্য খিড়কিটা এখনও বন্ধ হয়নি। কলকাতায় ফিরলে সে বাড়িতেই থাকে। একটু বেশী রাত করে ঢুকতে হয়, এই যা। বাবা টের পায় হয়তো, দেখি না দেখি না করে এড়িয়ে যায়।

কাজেই এই সুন্দর পরিপাটি বিছানাটিতে তার ঘুম না হওয়ার কারণ নেই। বলতে কী, জগদীশের আশ্রয় না জুটলে হয়ত বা মোনা ঠাকুরের মন্দিরের বারান্দায় পড়ে থাকতে হত। এই শীতে, খোলা হাওয়ায়, গেঞ্জির ওপর একটিমাত্র শার্ট সম্বল করে।

ঘুম তবু আসছে না। মাথাটা বড্ড গরম। শরীরও। মোনা ঠাকুরের মন্দিরের কথা ভাবতে গিয়েই হঠাৎ সে জেগেই এক মায়া দেখল। কুয়াশায় মাথা সেই অলৌকিক জ্যোৎস্না, মন্দিরের প্রাচীন সাদা সিঁড়ির শেষ দুটো ধাপে বঙ্কিম সুন্দর ভঙ্গীতে শরীর ভেঙে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। জ্যোৎস্নাতেও দেখা যায়, তার চোখ চেয়ে আছে নয়নের দিকে। বিভ্রম? না। মাথা নাড়ে নয়ন। একথা ঠিক, সে মেয়েদের এখনও চেনে না। চিনবার বয়সও নয়। সে মাত্র চব্বিশ পেরোল। মেয়েদের বুঝতে বয়সও চাই। সে তো এখনও জানে না কেন শ্যামা খেলা করে তাকে নিয়ে, কেন বা সেই সুন্দরবনের নোনা মেয়েমানুষটিকে চেঁচিয়ে বলেছিল···হারামীর বাচ্চা! মেয়েদের না চিনেও নয়নের মনে হয়, ঐ মেয়েটি মন্দিরের শেষ দুটো সিঁড়ির ধাপে পা রেখে ঘাটের পৈঠায় স্নানের আগে মেয়েটা যেমন দাঁড়িয়ে জলে নিজের ছায়া দেখে, তেমনি ছায়া দেখতে চেয়েছিল নয়নের চোখে।

ঘুম হবে না। নয়ন মশারির মধ্যেই চিৎপাত হয়ে শুয়ে থেকে একটা সিগারেট ধরায়। ধোঁয়ায় মশারির ভিতরটা ভরে ওঠে। হ্যারিকেনের গন্ধ পায় সে। উঠে বাইরে আসে। পায়চারী করে। শরীর। শরীরই সব। জগদীশ কী একটা তত্ত্বকথা বলছিল! ক্ষিদে, ভোগ এ

হচ্ছে মানুষের সর্বস্ব। জীবজন্তুরা মানুষের মত নির্লজ্জ নয়।

নয়ন একটু থমকে দাঁড়ায়। অথচ মানুষ ছাড়া আর কেউ পোশাক পরে না। পোশাক পরে কেন? মানুষ কি জানে না যে পোশাকের ভিতরে তার শরীরটা ন্যাংটো! সব মানুষই জানে মানুষের, মেয়ে মানুষের শরীরে কি আছে, কিংবা কেমন করে সেই শরীর ব্যবহার করা যায়। তবে কেন মানুষ পোশাক পরে।

নয়ন একটু হাসে আপনমনে। ক্ষমতা হাতে পেলে সে নিয়ম করবে, পোশাক পরা চলবে না। বেহায়া, নির্লজ্জ, সবই তো জানো তোমরা, তবে কেন ঐ পোশাক? ছেড়ে ফেল, ছেড়ে ফেল, উদোম হও, লজ্জার কি আছে? পরস্পরের ন্যাংটো শরীর দেখ, লজ্জা জুড়িয়ে যাবে হে!

সাপদুটো এখন কী করছে? এই মায়াবী জ্যোৎস্নার শীত রাত্রিটি এই তো সময়। এখনও কি নিস্পৃহ দড়ির মত শুয়ে আছে? যখন একটি মেয়ে শরীরের অভাবে নয়নের চোখে ঘুম নেই।

দরজাটা ঠেলতেই খুলে যায়। হ্যারিকেনের পলতে নামানো। মৃদু দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আসে জগদীশের বিছানা থেকে। নিঃসাড়ে ঘুমোলে সুস্থ মানুষের শ্বাস ওরকম দ্রুত হয়। তা ছাড়া গাঁয়ের মানুষ, ঘুমটা গাঢ় হওয়ারই কথা।

নয়ন নিঃশব্দে হ্যারিকেনের কল ঘুরিয়ে আলোটা উস্কে দিল। আলো হাতে কাচের বাক্সটার ঝুঁকে দেখল, যেমন দেখেছিল খানিক আগে তেমনি দুটো পড়ে আছে। ন্যাংটো কালো শরীর! শীতল। নিস্পৃহ। খুব মৃদু দুটো টোকা দিল নয়ন। তারা নড়ল না।

এভাবে ওদের উত্তেজিত করা যাবে না। শব্দ করলে জগদীশ জেগে যাবে। নয়ন বাক্সটা ভাল করে দেখে। সাধারণ বাক্স। একটা কব্জায় পুঁচকে তালা ঝুলেছে। পকেট থেকে ভাঁজ করা ছুরিটা বের করে নয়ন। ফলাটা তালার ভিতর ঢুকিয়ে একটু চাপ দিতেই আলগা হয়ে গেল। গা-টা একটু শির শির করে তার। সাপদুটো নড়লও না।

নিঃশব্দে ডালাটা তুলে ফেলল সে। বাক্সের ভিতর থেকে একটা ভ্যাপসা পচা গন্ধ নাকে আসে। সম্ভবত ইঁদুর বা ব্যাঙ খেতে দেওয়া হয়েছিল ওদের, তারই কোন টুকরো-টাকরা পড়ে পচছে। একটু দূর থেকে সাবধানে উঁকি দেয় নয়ন। ভয়ের কিছু নেই। যদি মাথা তোলে ছপ করে ডালাটা ফেলে দিলেই হবে। আপাতত ওদের পরস্পরের প্রতি

ভালবাসা জাগিয়ে দেওয়া দরকার। নয়ন কখনও সাপদের মিলন দেখে নি। না-ঘুমোন সময়টাও কেটে যাবে অন্যমনস্কতায়।

বিছানা ঝাড়ার ঝাঁটাটা ঘরের কোণে। একটা শলা খুলে নয়ন সাবধানে বাক্সের ভিতরে একটা খোঁচা দেয়। গায়ে লাগে না। বালিতে গেঁথে যায়। অনভ্যাসের হাত। আবার খোঁচা দেয়। এবার কোণের বিড়ে-পাকানো সাপটার গায়ে লাগে ঠিকই। কিন্তু সে নড়ে না। কোন্‌টা মাদী, কোন্‌টা মদ্দা তা অবশ্য সে চেনে না। তবু ওটাকে তার মদ্দা বলেই মনে হয়। মেয়েমানুষের রাগ বেশী।

দুটো তিনটে খোঁচা বৃথা গেল। সাপটা কেবল মাথাটা একটু সরিয়ে নিল, শরীর নাড়ল। নয়ন ডালাটা প্রায় বন্ধ করে ধরে রইল। সাপটা আবার ঝিমিয়ে পড়তেই ডালাটা আবার সাবধানে তুলে ফেলল সে। আবার কাঠিটা স্পর্শ করল শরীরে…

কালো-বিদ্যুৎ কখনও দেখে নি নয়ন। দেখল। বিশ্বাস হয় না, এত দ্রুত ঘুম থেকে খাড়া দাঁড়িয়ে যেতে পারে কেউ। একটা প্রবল শ্বাসের শব্দ হল কেবল। একপলকের মুগ্ধতায় আর একটু হলেই হাতটা সরিয়ে নিতে ভুল গিয়েছিল সে।

ডালাটা খাড়া তোলা ছিল, কোন্‌দিকে পড়বে সেটা সিদ্ধান্ত নিতে একটুক্ষণ খাড়া দাঁড়িয়ে থেকে ডালাটা আর একটু হলে বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু তার আগেই একটা মসৃণ ছোবল খেয়ে সাপটা বাক্সের কার্নিশ বেয়ে ঝুলে পড়েছে। কিছু করার নেই।

কালো একটা স্রোতের মত নেমে আসছে। নেমেই আসছে সরীসৃপ চিকণ শরীরখানা। ডালাটা পড়েছে। কিন্তু হাল্কা ডালাখানা তাকে চেপে রাখতে পারছে না। স্বচ্ছন্দ শরীরটা বেয়ে আসছে সুন্দর মুক্তির দিকে, প্রতিশোধের দিকে।

নয়ন হ্যারিকেনটা ফেলে এক লাফে পিছিয়ে আসে। পাগলের মত চেঁচায়—জগদীশবাবু…জগদীশবাবু…

চোখের পলকে মশারি প্রায় ছিঁড়ে জগদীশ বেরিয়ে আসে। হ্যারিকেনটা কাৎ হয়ে দপ্‌ দপ্‌ করছে, তেল পড়ছে গড়িয়ে। এক্ষুনি অন্ধকার হয়ে যাবে সব। কালো অন্ধকারে সাপের কালো শরীরটা জগদীশও খুঁজে পাবে না।

—কী? কী? বলে জগদীশ গর্জন করে। ঘুম-লাগা চোখে মাথার

কিছু বুঝতে পারে না।

নয়ন কেবল 'সাপ' কথাটা উচ্চারণ করতে পারল।

জগদীশ এক ঝটকায় আগে হ্যারিকেনটা সোজা করল। সেটা নিভল না। কিন্তু আলো ঘুলিয়ে ধোঁয়াটে হয়ে গেছে। সাপটাকে দেখতে পেল নয়ন। দরজার দিক থেকে ঘুরে মুখটা তুলেছে। চোখে জ্বালা, মুখে শ্বাস।

জগদীশ মুহূর্তের মধ্যে সাপুড়ে হয়ে গেল। কুঁজো হয়ে দুটি সতর্ক জাগ্রত হাত উদ্যত করে এগিয়ে যাচ্ছে এক পা এক পা করে। মুখোমুখি। নয়ন মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখে।

মানুষের ছোবল কত সুন্দর হয় তা দেখল নয়ন। এত সুন্দর কিছু সে কখনও দেখে নি। জগদীশ ঢেউ হয়ে গেল যেন। চকিতে শরীর ঝুঁকল। হাত প্রসারিত হল। এত দ্রুত যে বিশ্বাস হয় না। বাঁ হাতে সাপটাকে ফুলের মত যেন গাছ থেকে তুলে নিল সে। এত অনায়াসে, যেন যে-কেউ করতে পারে।

ডালাটা খুলে, জগদীশ সাপটাকে ভিতরে ছেড়ে দেয়। সেটা আবার শরীরটাকে পাকে পাকে জড়ায়। মাথা কোলে নিয়ে ঝিমিয়ে পড়ে।

জগদীশ নয়নের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে রুক্ষ স্বরে বলে—এটা কী হল?

নয়ন সামান্য একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে—ঘুম আসছিল না।

—কী দেখতে চেয়েছিলেন?

—ঐ, সেটা।

দাঁতে দাঁত ঘষল জগদীশ। অস্বাভাবিক ধীর গলায় বলল—এই ঘরে মুকুল আছে, আপনি জানেন না? যদি মুকুলের কিছু হত!

—ওটা বেরিয়ে আসবে বুঝতে পারি নি।

—কিন্তু যদি বিছানায় যেত সাপটা? ওখানে আমার মুকুল আছে!

নয়ন বুঝতে পারে, তার অনুমানই ঠিক। বাইরে ঐ বিষণ্ণ ভাল-মানুষীর আড়ালে তীব্র হিংস্রতা রয়ে গেছে জগদীশের। রাগে চাপা গলা। সমস্ত শরীরে টান। রগ, শিরা-উপশিরা এই ম্লান আলোতেও দেখা যাচ্ছে।

—মজা, না? বলেই জগদীশ আচমকা তার চাষাড়ে হাতে একটা

থাপ্পড় কষায়। নয়ন ভাবতেও পারে নি। চড়টা বোমার মত ফাটল তার কান, গলা, কণ্ঠা জুড়ে। মাথার মধ্যে সাইরেনের শব্দ বেজে উঠল হঠাৎ।

পড়ে গিয়েও টাল সামলে নিল সে। হাত বাড়িয়ে কাঠের চেয়ারটা ধরে দম নিল।

—বেইমান! জগদীশ বলে।

মার কিছু কম খায় নি নয়ন। কিন্তু মার দেখলে সে পালায়ও নি কখনও। এ তার জল-ভাত। যেখানে মার সেখানে উল্টে মার দেওয়ার জন্যই সে জন্মেছে। চড়টা সামলেই দুটো হাত তার আপনা থেকেই মুঠো পাকিয়ে গেল।

কিন্তু একটা বিশাল গাছের মত জগদীশ দাঁড়িয়ে আছে। পা দুটো মাটিতে পোঁতা, দুখানা চাষাড়ে হাত তাকে বলের মত ছুঁড়ে লুফে নিতে পারে।

মুঠো শিথিল করে শরীরের ভর চেয়ারের হাতলে ছেড়ে নয়ন জগদীশকে একটু দেখল, বলল…অতিথি নারায়ণ।

বলে হাসল।

জগদীশ গম্ভীর ভাবে বলল…অতিথির ভেক ধরে চোর ডাকাত এলে সে তখন নারায়ণ থাকে না। গিয়ে শুয়ে পড়ুন, আমি দরজার বাঠাম দিয়ে দিচ্ছি। ফের কোন বাঁদরামী করলে ঘাড় ধরে বের করে দেব।

নয়ন একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। লোকটাকে তার দারুণ ভাল লাগছে এখন। দারুণ।

মসজিদ বাড়ির বাইরের ঘেরা-দেয়ালটায় নোনা ধরেছে। গেটটা পাল্লা হারিয়ে হাঁ করে আছে। ভিতরে একটা চমৎকার মাঠ। নির্জন। মসজিদের গায়ে একটা মোটা লতা উঠেছে, অশ্বত্থ গজিয়েছে। ভিতরের মাঠের একটেরে একটা কাঠচাঁপা গাছ। খুব ফুল এসেছে। তলায় বিছিয়ে আছে ফুল। এই ফুলটার তেমন আদর নেই। কেউ কুড়োয় না, ঘর সাজায় না। ফুলের দোকানে এই ফুল বিক্রি হতেও দেখেনি শ্যামা। কিন্তু হলদেটে সাদা রঙের এই ফুলটার চাঁপা গন্ধ শ্যামার বড়

ভাল লাগে। সে একবার চারধারে চেয়ে দেখল। কেউ নেই রাস্তায়, দু চারজন সাধারণ চেহারার মানুষ ছাড়া। মসজিদের ভিতরেও লোকজন বড় একটা দেখা যায় না আজকাল। এই অঞ্চলটায় মুসলমানরা বড় একটা থাকে না এখন। আজানধ্বনি শোনা যায় না। আগে যেত, যখন সে খুব ছোট ছিল। তখন একটা পেয়ারাগাছ ছিল এখানে, আর ছিলেন হাজিসাহেব। বদনার জলে ওজু করতে করতে তাদের দুই ভাই বোনের গাছে চড়া দেখতেন। নমাজের সময়ে বাচ্চারা ছোটাছুটি করলে অসুবিধে হবে বলে ছোকরা মোল্লা কি বুড়ো মৌলভী তেড়ে এলে তিনি আটকাতেন। তাদের ডেকে বলতেন···শব্দ করো না। পেয়ারা পাড়। যটা খেতে পার ততটা। নষ্ট করো না।

হাজিসাহেব নেই। কেউই নেই। নিস্তব্ধতা আছে। দু একজন কেয়ারটেকার থাকে হয়তো বা। মানুষ যে কোথায় চলে যায়! বড় হয়ে অবধি বাড়ি থেকে দু পা দূরে মসজিদের মাঠে কখনও আর আসে নি শ্যামা, ভুলে গিয়েছিল।

আজ বহুকাল বাদে সে নির্জন মাঠটায় ঢুকে পড়ল। সকালের রোদ এখন ঈষদুষ্ণ। ভালই লাগে। বাতাস দিচ্ছে। 'কিরিচ' শব্দ করে চুল ঘেঁষে চড়াই উড়ে যায়। কী সুন্দর নিস্তব্ধতা! আর গাছ-গাছালির ছায়া!

কাঠচাঁপা ফুল কয়েকটা কুড়োল শ্যামা। স্কার্ফের আঁচলে তুলল। একটু ঘুরে দেখল চারদিক। মসজিদের চাতাল ঝাঁট দেওয়া। মেঝে পরিষ্কার। বাতাসে ধূপগন্ধ। মেহেদীর ঝোপে পাখীর হুড়োহুড়ি।

হঠাৎ কোকিল ডাকে। চমকে ওঠে সে। কোকিল! না নয়ন?

স্খলিত আঁচল থেকে দু একটা ফুল পড়ে যায়।

সেই যে মোনা ঠাকুরের মন্দিরে যেতে আমবাগানে দেখা হয়েছিল, তারপর আর তাকে দেখেনি সে। ফিরেছে কি নয়ন? কে জানে!

নিমগাছ থেকে একটা সত্যিকারের কোকিল উড়ে গেল। তবে নয়ন নয়, কোকিলটাই ডেকেছিল। শ্যামা নিশ্চিন্তে একটু হাসে। একটা ফুল তুলে গন্ধ শুঁকল। মৃদু গন্ধই তার প্রিয়। বুক ভরে ওঠে না গন্ধে, কেবল স্মৃতির মত, গত রাত্রির স্বপ্নের রেশের মত অস্পষ্ট গন্ধ।

গত রাতেও দুঃস্বপ্ন দেখেছে সে। প্রায়ই দেখে। সকাল থেকে মনটা ভার হয়ে আছে। বাবার জন্য একটা ফুল-হাতা, উঁচু গলার সোয়েটার

বুনতে শুরু করেছিল। পান্নাদির বাড়িতে গিয়েছিল প্যাটার্ণ তুলতে। আসলে প্যাটার্ণ তোলাটা ছল। ঘরে থাকতে তার ভাল লাগছিল না। হরিদ্বার যাওয়ার গোছগাছ শুরু হয়েছে, মা বাবা যাবেই। মোনা ঠাকুর বলেছে, ঐ দিকেই কোথাও দাদা আছে সন্ন্যাসী হয়ে। পূর্বস্মৃতি নেই বলে ফিরতে পারছে না। শ্যামার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু আশা হয়।

হরিদ্বার কি কোথাও যেতে শ্যামার ইচ্ছে করছিল না এখন। বাবার শরীর ভাল না। মাঝে মাঝে প্রেসার দুশো ছাড়িয়ে যায়। বিদেশ-বিভুঁয়ে তারা মা আর মেয়ে বাবাকে নিয়ে কোন আতান্তরে পড়ে কে জানে! কিন্তু মা বাবাকে ঠেকানো যাচ্ছে না, অনেক বুঝিয়েছে সে, বেশী বোঝাতে গেলে ঝগড়া হয়ে যায়।

বাবা হরিদ্বারে গিয়ে মারা গেছে—এ রকমই একটা দুঃস্বপ্ন সে দেখেছিল কাল। সকালটা তাই মনের অন্ধকার নিয়ে কাটছিল। পান্নাদির বাড়িতেও প্যাটার্ণ তোলা হল না। আজ ছুটির দিন, ওরা পিকনিকে যাচ্ছে কল্যাণীতে। বলল—চল্ না, মাসীমাকে বলে তোকে নিয়ে নিই। শ্যামা রাজী হয় নি।

রাজী হয় নি অভিমানে। তার কোন আনন্দ করতে নেই। বাড়িতে অবিরল শোক লেগে আছে গত পাঁচ বছর ধরে। বিরাম নেই। দীর্ঘশ্বাসে বাসার বাতাস ভারী। মাত্র তিনটি প্রাণী তারা। পরিবারটা বড় হলে হয়তো একজনের শোক ভুলে থাকা যেত। মোটে তিনজন বলেই হারিয়ে যাওয়া চতুর্থ জনের কথা ভোলা যায় না। চার-পায়া একটা আসবাবের একটা পা ভেঙে গেলে সেই পায়ার দিকেই যেমন ঝুঁকে থাকে আসবাব, তেমনি হারানো দাদার স্মৃতিতে ঝুঁকে আছে তারা। খেতে বসতে, কাজ করতে দাদার কথা এসে পড়ে। মা কাঁদে, বাবা সান্ত্বনা দেয়, তারপর নিজে কাঁদে। শ্যামার চোখে তখন জল আসেই, তাই তাদের আনন্দ নেই। গত পাঁচ বছরে বাবা শ্যামার বিয়ের চেষ্টাই করেন নি। প্রসঙ্গ উঠলেই বলেন—ছেলেটা নেই, ঐ মেয়েটা মাত্র আমাদের সম্বল। অন্ধের নড়ি। ও গেলে থাকব কি করে?

তবু গত পাঁচ বছরে দু তিনটে পাত্রপক্ষ দেখেছে শ্যামাকে, পছন্দও হয়েছে। বিয়ে হয় নি বাবা মার গরজের অভাবে। পাত্রদের মধ্যে একজনকে খুব পছন্দ ছিল শ্যামার। স্নিগ্ধ চেহারার দীর্ঘ ছেলেটি।

মুখখানা গম্ভীর। বিলেত ফেরত ডাক্তার। প্র্যাকটিশ যখন সবে জমে উঠেছে সেই সময়ে লোকটাকে হঠাৎ অল্প বয়সেই ধর্মে পায়। ব্যাপারটা ঘটেছিল এই রকম। বিলেত থেকে ঘুরে আসার পর ছেলেটির একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হল। দিন-ক্ষণ সব ঠিক। বিয়ের দিন গায়ে-হলুদের স্নান করতে গিয়ে মেয়েটির কেঁপে জ্বর আসে। ধুম জ্বর উঠতে না উঠতেই গায়ে মায়ের দয়া বেরোয়। ঝেঁপে গুটি উঠেছিল। বিয়ে পিছিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বোকা মেয়েটা যখন বুঝতে পারল যে তার মুখখানার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে তখন তার প্রাণের চেয়ে শরীরের মায়া বেশী হল, প্রায়ই কাঁদতে—ও মা গো, এই মুখে তাঁর ঘর করতে যাব? রোগ সারার মুখে মেয়েটা টিক বিশ খেয়ে বাঙুর হাসপাতালে মারা যায়। ছেলেটি সেই থেকে পাগলের মত ঘুরে বেড়াত। কী যেন খুঁজত, কাকে যেন। তারপর দেওঘরের এক আশ্রমে থেকে যায়।

আশ্রমবাসী সেই বিলেত ফেরত ডাক্তারের মা বাবা হাল ছাড়েন নি। তাঁরা সেই আশ্রমে গিয়ে পড়ে রইলেন। ছেলেকে গুরুদেব বললেন —বিয়ে করবে না কেন? বিয়ে কর। বনের চেয়ে ঘরের সন্ন্যাসীই পাগল বেশী। বনের সন্ন্যাসী দিয়ে কী হয় রে? কাম দমন করতে চাস না কি। ওসব জোর করে করতে গেলে মাথার দফা শেষ হয়ে যাবে। পরমপিতাই কাম দিয়েছেন, সে তো এমনি নয়, তারও কিছু প্রয়োজন আছে বলেই দিয়েছেন। ওর দমন ওভাবে হয় না, জোর করতে গেলে উল্টো বিপত্তি। সুষ্ঠু ব্যবহার কর, স্ত্রীর প্রতি কামভাবেই কেবল ভাবিত হয়ো না, তাহলেই হবে। ভাল ঘর দেখে জাতে কাটে কর।

সেই ডাক্তার নিজেই এসেছিল দেখতে? হাফ-হাতা পাঞ্জাবি পরা ধুতি, লম্বা, কৃশ কালো চেহারাটি। ভারী ধীর। গম্ভীর। ঘরে ঢুকলে ঘরটা থম থম করে। বুকের মধ্যে গুরু গুরু ডাক ওঠে। বাবা কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিল···তুমি এই অল্প বয়সেই কেন সন্ন্যাসী বাবা?

সে উত্তর দিয়েছিল···সন্ন্যাসী কোথায়? আমি তো সংসারীই। কেবল সংসারের পরিধি বাড়ানোর চেষ্টা করছি।

—সেটা কেমন?

ছেলেটা একটু ভেবে বলল···আপনার ঘরের পাশে যদি আবর্জনা থাকে তবে মশা মাছি জীবাণুর উৎপাত বাড়ে। বাড়ে না? নিরাপদে

থাকতে গেলে তাই আপনার ঘরের মতই ঐ বাইরের ময়লাও পরিষ্কার করা দরকার। তেমনি নিজের পরিবার সংসারের ভালর জন্যই চারপাশটাকে ভাল রাখা দরকার। এই ভাল রাখতে গেলেই সংসারের পরিধি বেড়ে যায়। কেবল নিজের ভালর জন্য করলেই ভাল থাকা যায় না।

বাবা উত্তরে বলেছিল···তো তার জন্য আশ্রম কেন? ঘরে থেকেও তো হয়।

—আশ্রম মানে যেখানে শ্রম করে কাজগুলো হাতে-কলমে শিখতে হয়। শেখা হলেই সংসারে ফিরে আসা! সেকালের ব্রহ্মচারীরা ভাল গৃহী হওয়ার জন্যই ব্রহ্মচর্য করে মনটাকে উদার, শান্ত ও আনন্দিত ও স্থির করে নিত। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বিস্তার, ব্রহ্মচারী মানে বিস্তারে বাস করা। চারপাশটাকে জেনে নেওয়া। এই জানা সংসারে তাকে সাহায্য করে। আমি সংসার বিমুখ নই।

ধীর স্থির কথা। বিনীত এবং অকপট স্বর।

বাবা তবু মনস্থির করতে পারছিল না। অস্বস্তি বোধ করছিল।

বলল···তুমি কেন গেলে?

ছেলেটা বিষণ্ণ একটু হাসল। কী মায়াময় হাসিটি! অনেকক্ষণ উত্তর দিল না। তারপর আস্তে করে বলল···আর একবার আমার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। তা কি শুনেছেন?

—শুনেছি।

ছেলেটা আবার মাথা নীচু করে চুপ হয়ে রইল। অনেকক্ষণ বাদে বলল···মেয়েটির যখন বসন্ত হয়েছিল তখন আমি মাঝে মাঝে তাকে দেখতে যেতাম। ডাক্তার হিসেবেই যেতাম। মেয়েটির সঙ্গে আমার কোন পূর্ব পরিচয় ছিল না, এই যেমন আজ এসেছি আপনার বাড়িতে সেইরকম উপলক্ষে মেয়ে দেখতে গিয়ে তাকে দেখা। সে খুবই সুন্দরী ছিল। বসন্ত হওয়ার পর তার সেই সৌন্দর্য যে কোথায় গেল! একটি সুন্দরী মেয়ের বসন্ত হলে ডাক্তারের খুব একটা প্রতিক্রিয়া হয় না। কিন্তু রুগী দেখা এক কথা, আর নিজের ভাবী স্ত্রীকে ঐ অবস্থায় দেখা আর এক কথা। আমার মন খারাপ হয়ে যেত। তবু মনকে আমি স্থিরই রেখেছিলাম। ঐ মেয়েকেই বিয়ে করব। আমি তাকে তাই প্রায়ই দেখতে যেতাম। সে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখত, কথাবার্তাও বলত না। চুপচাপ তার বিছানার পাশে বসে থেকে চলে আসতাম। একদিন

গ্রীষ্মের বিকেলে দেখতে গেছি। পশ্চিমের জানালা খোলা ছিল। তাতে নিমডাল বাঁধা, ঘরে আবছা আলো পড়েছে। মেয়েটি শুয়েছিল দেয়ালের দিকে মুখ করে। আমি চেয়ারে বসা। মশারিটা তুলে দেওয়া হয়েছে যাতে আমি তাকে দেখতে পাই। তিনদিকে মশারি ফেলা, একদিকের মশারি তোলা। ফলে দেখাচ্ছিল ঠিক যেন থিয়েটারের স্টেজ-এর মত। সে শুয়ে আছে, শরীরের যেটুকু দেখা যাচ্ছে তা লালচে মারাত্মক গোটায় ভরা। গোটা গলে পুঁজ আর রস চাপটা বাঁধছে। এলোচুল বালিশে ছড়ান, দৃশ্যটা করুণ, ভয়ংকর। দেখছিলাম। পশ্চিমের জানালার নিমডালের ফাঁক দিয়ে লালচে আলোর কুচি এসে বিছানায় পড়েছে। চৌখুপী আলো কাঁপছে, দুলছে। কোনদিন সেই যা করে না, সেই সময়ে সে হঠাৎ মুখ ফেরাল। বস্তুত রোগ হওয়ার পর তার মুখ ওরকম স্পষ্টভাবে সে কখনও আমাকে দেখায় নি। মুখখানা ফুলে-টুলে বিশ্রী দেখতে হয়েছে। কিন্তু তাতে চমকাবার কিছু নেই। আমার মন তো প্রস্তুতই ছিল। কিন্তু হঠাৎ তার চোখ দুখানার দৃষ্টি দেখে আমার কেমন লাগল। মানুষের খুব অভিমান হলে চোখে যেমন একটা আলগা আলো আসে ঠিক সেরকম কিছু ছিল তার চোখে। জলভরা, লালচে এবং আগুনের মত যা এসে ছোঁয়। তক্ষুনি মনে হল, একে পাহারায় রাখা দরকার। চোখে চোখে না রাখলে এ মরবে, এর মরার ইচ্ছে জেগেছে। কিন্তু এরকম মনে হওয়াগুলো কোন বৈজ্ঞানিক সত্য নয়, আমাদের কত সময়ে কতকিছু মনে হয়! তার ওপর ঘরটার আলো স্পষ্ট নয়, মশারির মধ্যে একটা ধোঁয়াটে ভাব, আর সেই আলোর চৌখুপীগুলো, সেগুলোর কোন ছিটেফোঁটা তার চোখে পড়ে ওরকম দেখাচ্ছিল কি না···এ সবই আমি ভাবতে লাগলাম। সেই সময়ে আমি হঠাৎ খেয়াল করি, ঘরে একটা জর্মিসাইডিসের চেনা গন্ধ। আর পোকা-মারা বিষের গন্ধ। সেই গন্ধ আমার নিত্যসঙ্গী। তবু হঠাৎ সেদিন সেই গন্ধ বুকের মধ্যে ঘুলিয়ে উঠে একটা আকুল ইঙ্গিত করছিল। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, কেন আমার মন একটা অস্পষ্ট কিছু বলতে চাইছে। উঠে আসবার সময়ে দেখি, কে যেন পোকামারা বিষের শিশিটা ছোট্ট আলমারির মাথায় রেখে গেছে। চলে আসতে গিয়েও থমকে শিশিটা দেখলাম। একবার হাত বাড়িয়ে ধরলামও, ভাবলাম কাউকে বলি শিশিটা সরিয়ে নিতে। তারপর সচেতন মনে ভাবলাম, থাকগে। কি হবে!

ছেলেটা চুপ করে আবার একটু ভাবল। তারপর ম্লান এবং সুন্দর হাসিটি হেসে বলল…এই হচ্ছে গল্প। মেয়েটা মারা গেল। হাসপাতালে নিয়ে অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তার মরার ইচ্ছেটাই ছিল প্রবল। সেটা নিয়ে ভাববার কিছু নেই। চুকে টুকে গেছে। কিন্তু তারপর থেকেই আমার মনে একটা প্রশ্ন এল। প্রশ্ন এই…আমি কেন সেই ইঙ্গিত পেয়েছিলাম? আর কেন তা উপেক্ষা করেছি? আমি যদি এতই আনাড়ী যে বুঝতে পেরেও সাবধান হতে জানি না তবে তো একদিন আমার অধীত বিদ্যাও সঠিক প্রয়োগ করতে পারব না! সংকট যখন আসে তখন মানুষের সবচেয়ে বড় বিদ্যার পরিচয় হচ্ছে সিদ্ধান্ত নেওয়া, স্থিরভাবে জোরের সঙ্গে যে সিদ্ধান্ত নিতে জানে না, কোন্ সিদ্ধান্ত সঠিক এ বিষয়ে যার দ্বিধা থাকে সে অবিশ্বস্ত। চিন্তা করতে করতে আমি দেখলাম, মানুষ যত তুচ্ছ ভুলই করুক, তুচ্ছাতিতুচ্ছ ভুলের পিছনে থাকে তার জীবনের যত কাজকর্ম, যত অভ্যাস, যত আচরণ। জল খেয়ে কাচের গেলাসটি টেবিলের ধারে রাখতে গিয়ে ভাবলাম ··এখানে রাখছি কারও ধাক্কা লেগে পড়ে ভেঙে যাবে হয়তো! ভাবলাম, তবু আবার রেখেও দিলাম। ভাবলাম…থাকগে, এক্ষুনি ভিতরবাড়ি থেকে লোক এসে নিয়ে যাবে। তখন পাশের ঘরে টেলিফোন বাজছে। তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে হাঁটু লেগে টেবিলটা নড়ল। গেলাসটা নড়ে উঠে আবার স্থির হল। ভাবলাম…গেলাসটা পড়ে যাবে। টেলিফোন বাজছে, দৌড়ে গিয়ে ধরি। কে একজন ফোন করে একটা ঠিকানা দিল লিখে রাখতে। টেলিফোন রেখে তাড়াতাড়ি এসে ঠিকানাটা লিখে রাখতে যাচ্ছি। ডায়েরীটা খুঁজছি। তখন গেলাসটার কথা ভুলে গেছি। জরুরী ঠিকানাটা লিখে রাখা দরকার, ডায়েরীটা কোথায়? ফাইলের তলায় চাপা ডায়েরীটা পেয়ে 'ইউরেকা' বলে টেনে বার করতে গেছি, তখন হঠাৎ কনুই লেগে ফটাস্ করে পড়ে ভাঙল, ওটা কি? সেই গেলাস!

ছেলেটা বাবার মুখের দিকে ক্লান্ত চোখ দুটো পরিপূর্ণ মেলে দিয়ে বলল…তুচ্ছ একটা ভুল। কিন্তু ভেবে দেখলে এর পিছনে আমার সমস্ত জীবনটাই কাজ করছে। ঐ দীর্ঘকালের অভ্যাসজনিত আলস্য। কাজ ফেলে রাখা, অন্যে এসে নিয়ে যাবে…এই পরনির্ভরতা, দুর্ঘটনার আশংকা করেও উপেক্ষার সর্বনাশা শিথিলতা। জরুরী কাজের সময়ে বিশৃংখলা। সবকিছুকে একযোগে দেবাধ অক্ষমতা, আর সব মিলিয়ে

একটা সাময়িক অন্ধত্ব। যে একরকম ছোট্ট ছোট্ট ভুলগুলো করে তার জন্য বড় বড় ভুল অপেক্ষা করে থাকে। মেয়েটি মরে যাওয়ার পর নিজের এই অন্ধত্ব এবং সিদ্ধান্তের অভাব আমাকে পাগল করে দিল। আমার কেবলই মনে হতে লাগল, আমি রুগীদের সঠিক রোগ নির্ণয় করতে পারব না, ভুল ওষুধ দেব হয়তো, অপারেশন করতে হাত কাঁপবে এবং কোন মানুষের মুখ দেখে তার সম্বন্ধে কেবলই উল্টোপাল্টা ভেবে যাব। নিজের সম্পর্কে এই বিশ্বাসের অভাব মানুষের মস্ত এক শত্রু। তখনই ঠিক করি ডাক্তারীর চেয়ে বড় কিছু শিক্ষা আমার দরকার। সেই শিক্ষা জীবন-যাপনের। ক্ষুদ্র চোখে আমরা যা দেখি তা যথেষ্ট নয়, চাই ব্যাপক দৃষ্টি। কোন কিছু দেখলে তার সবটা দেখা চাই, কোন কিছু জানলে তার সবটা জানা চাই। কে শেখাবে আমাকে?

ছেলেটি মাথা নীচু করে মৃদু স্বরে বলল...আমি তখন গুরুর সন্ধানে বেরোই। সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য নয়, সংসারী হওয়ার জন্যই। কিন্তু এমন সংসারী যার ইন্দ্রিয়গুলি ত্রুটিমুক্ত। যে স্থির, আত্মবিশ্বাসী, যে ভুল করে না।

বাবা খুশী হয়েছিল হয়তো। অনেকক্ষণ আলাপ করেছিল ছেলেটির সঙ্গে। ছেলেটি এক পলকমাত্র দেখেছিল শ্যামাকে। দ্বিতীয়বার চোখ তোলে নি। কিছু জিজ্ঞেস করে নি। তবু শ্যামা জানত, সে শ্যামাকে পছন্দ করেছিল।

বাবা কেবলই দ্বিধা করতে লাগল। সন্ন্যাসী ছেলে, আশ্রমে থাকে, নিরামিষ খায়! শ্যামা কি পারবে? কয়েকবার শ্যামাকে ডেকে ওই কথা জিজ্ঞেস করেছিল বাবা। শ্যামা উত্তর দেয় নি। মনে মনে সে উন্মুখ ছিল সেই পুরুষটির জন্য। প্রস্তুত ছিল। তার মনের ভিতরে শাঁখ, উলুধ্বনি বেজেছিল ঠিকই। কেউ শোনে নি।

বাবার উত্তর না পেয়ে তারা আর আসে নি। কী হল সেই ছেলেটির কে জানে! মানুষ যে কোথায় যায়।

নির্জন মসজিদের চত্বরে শ্যামা কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ায়। মনে এক অভিমান। কার ওপর কে জানে! হয়তো দাদার ওপর! কেন তুই পাগল হয়ে চলে গেলি? দ্যাখ তো, আমাদের কী করে রেখে গেছিস! ফিরে আয় লক্ষ্মী দাদা আমার, একটা ঝুঁকে-পড়া দিক তুলে ধর। আমরা চারজন হলে সংসারটার দাঁড়ানো হয়। কেন যে চলে যাস তোরা! কেন

যে চলে যায় মানুষ! দূরে যায়! মরে যায়! হারিয়ে যায়! কেন রে! কোথায় গেল মেহেদীরঙা দাড়িওলা হাজিসাহেব? কোথায় সেই কাশীর পেয়ারাগাছ? আর সেই মসজিদের পিছনে দেয়াল ঘেঁষে সারি সারি দোলনচাঁপা? কি সুন্দর গন্ধ তার! কিছু নেই দ্যাখ। কেন রে হারিয়ে যায় মানুষ? গাছপালা!

মাঝে মাঝে তার অভিমান হয় মা বাবার ওপরেও। কেন তোমাদের অত শোক? উৎসবের মত শোক তোমাদের। মন খুঁড়ে তোমরা দুঃখ তুলে আন রোজ! দুঃখই তোমাদের ভাল লাগে। নইলে কেন ভুলতে পার না? পাছে ভুলে যাও সেই ভয়ে রাত জেগে তোমরা ছেলের কথা বল, অবসর সময়ে বসে ভাব ধ্যান কর। কেন? ভাল লাগে বলে? ঘরের বাতাস তোমাদের সেই দুঃখের ভার নিয়ে ভারি হয়ে থাকে। এক-কলি গান গাইতে পারি না আমি, মনে হয় বুঝি গান গাইলে বাড়ির ভিতরে দুঃখের পবিত্র মূর্তিটি—যা তোমরা রচনা করেছ, তা বুঝি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে! আয়নায় মুখ দেখতে যাই, অমনি মনে হয় —আয়নায় মুখ দেখছিস মুখপুড়ি, তোর না দাদা নেই? যে ছিল তোর খেলার সাথী, প্রিয়জন—সে না নেই!

অভিমান তার নিজের ওপরেও। কেন যে বড় হতে গেলাম! কেন যে বুঝতে শিখলাম, ভাবতে শিখলাম, টের পেতে শিখলাম! কী দরকার ছিল এ সবের? তার চেয়ে জন্মে শিশু হয়ে থাকলাম না কেন? সেই তো ভাল হত সবচেয়ে! অবোধ শিশু হয়ে চেয়ে থাকা! কেবল বিস্ময় আর আনন্দ। খিদে মিটলেই ঘুম! আর আহ্লাদ!

অভিমান আরও অনেক শ্যামার। বুক টৈ-টুম্বুর করে। এমনই কপাল তার! দেয়াল টপকে নয়ন এসে চিঠি রেখে যায় ঠিক। ভোরবেলা প্রায়ই চিঠি পায় সে। তাদের বাসার দুটো ঘর। সামনের ঘরে বাবা মা, পিছনের ঘরে সে। তার শিয়রের জানালার পাশ দিয়ে মেথর বা কয়লাওলা আসার একটা গলিপথ। গলিটা বাড়িরই অংশ, উঁচু দেয়াল, সামনে দরজা। কড়াক্কড় করে শিয়রের জানালা বন্ধ করে শোয় শ্যামা। তবু সকালে উঠে যখনই জানালা খোলে, ভোরের প্রথম আলোটি, কি শীতের কুয়াশা কিংবা রুপোলী বৃষ্টি দেখে দিনটা সুন্দর লাগে, মনটা ভাল হয়ে যায়, তখনই দেখতে পায়, জানালার খাঁজে নীল খাম, কিংবা, ভাঁজ করা চিঠি। সব চিঠিতেই সেই এক কথা—'বিয়ে কর, না হলে

মরব।' কিংবা—'মেরে ফেলব শ্যামা, জান তো আমি খুনে!' চিঠি দেখে মনটা ঝাঁৎ করে ডুবে যায়। মা বাবা দেখার আগেই সে চিঠি নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে, উনুনে দেয়। চোখে জল আসে। বাইরে কোকিল ডাকলে, মাটির বেহালা বাজলে, বৌ-কথা কও কথা বললে, শ্যামা চমকে ওঠে। নয়ন নয় তো! কপাল!

ইচ্ছে করলেই পিকনিক যেতে পারত সে। হৈ-হুল্লোড় করে কাটিয়ে আসত। কিন্তু সব ঘটনা মিলে-মিশে একটা গভীর অভিমান বুকে থম্ ধরে থাকে। নিজেকে শাস্তি দিতে ইচ্ছে হয়। কষ্ট পায় শ্যামা, আরও কষ্ট পা। গান গাস নে, কোথাও যাস নে, মুখ দেখিস নে আয়নায়। তোর আনন্দ পেতে নেই।

গাছের ছায়ায় শিশির এখনও শুকোয় নি! পায়ে পায়ে জল ঝরে পড়ছে। হাঁটতে শ্যামার ভালই লাগে। একা। মসজিদ বাড়ির এই পোড়ো ভাবটা তার সঙ্গে মিলে যায়। এখানে সে দাদার সঙ্গে কত খেলেছে! কিছুই ভোলে নি সে। এখানে সে এবার থেকে আসবে। রোজ। বসে থাকবে একা একা।

অভিমানটা বিকেল পর্যন্ত রইল।

পাঁচটা নাগাদ তার পিসতুতো দিদি কমলা আর তার স্বামী শংকর ট্যাক্সিতে এসে হাজির। ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে ভিতরে ঢুকেই হাঁক-ডাক শুরু করল শংকরদা—শ্যামা, শিগগির সাজপোশাক করে নাও, সিনেমায় যাচ্ছি। তোমার টিকিট কাটা আছে।

ওর ঐরকম। আগে থেকে খবর দেবে না, হঠাৎ এসে হুড়ো দেবে।

—বুঝেছি, কারও টিকিট বাড়তি হয়েছে, তাই আমাকে নিতে এসেছেন! শ্যামার গলায় সকালের অভিমানের রেশ এখনও।

—মাইরি না, তোমার মুখখানা মনে করেই কেটেছি।

—যদি এসে আমাকে না পেতেন?

—তাহলে বেচে দিতাম। হিট ছবি, বেচলে দু চার আনা বেশীই পেতাম। জলদি কর।

—আমি যাব না।

কমলা তাকে জড়িয়ে ধরে বলে—যাবি না কী? তোর ইচ্ছের না কী। পুজোয় যে পিওর সিল্কটা মামা দিয়েছে সেটা পর আজ। কি যে করিস

ভাল শাড়িগুলো দিয়ে। সব জমিয়ে রাখছিস বাক্সে।

—ইচ্ছে করছে না রে কমলাদি। মন ভাল নেই।

—ওমা। সে আর নতুন কথা কী! তোর আবার কবে মন ভাল থাকে?

—যাঃ! কবে মন খারাপ দেখেছ?

শংকরদা বলে…ওটা ওর ব্যক্তিত্ব কমলা। অনেক মেয়ে আছে যাদের মন খারাপ থাকলে ভাল দেখায়।

—ইয়ার্কি হচ্ছে? শ্যামা হাসে।

—মাইরি না। তোমার চোখ দুখানা যা ঢুলুঢুলু, ওতে হাসি ছ্যাবলামি ভাল খেলে না। মন খারাপ তোমার থাক শ্যামা, কেবল মাঝে মাঝে একটু মুখোশ খুলো, বাব্বাঃ, মেয়েরা সুন্দর দেখাবার জন্য যে কত কষ্ট করতে পারে! একটা মেয়ে ছিল যাকে বাঁ দিক থেকে বেশী সুন্দর দেখাত, সেই থেকে তার অভ্যাসই হয়ে গেল লোকের সঙ্গে কথা বলবার সময়ে বাঁ দিকে ফিরে থাকা, ঐ ভাবে মেয়েটার একটা দোষ দাঁড়িয়ে গেল, সোজা হয়ে কথা বলতে পারে না, তাকাতে পারে না, বাঁ দিকে কেতরে তাকায়, কথা বলে। ঘাড়ে ক্র্যাম্প হয়ে গিয়েছিল। কী জ্বালা!

—আমি সেরকম নই মোটেই।

—তোমাদের সেই সন্নিসি ডাক্তার আমাকে বলেছিল…মেয়েটি ভারী দুঃখী মনে হয়। দুঃখীরাই ভাল, তারা ঈশ্বর সকাশে তাড়াতাড়ি যেতে পারে।

—কোন্ সন্নিসি ডাক্তারের কথা বলছ? কমলা জিজ্ঞেস করে।

—ঐ যে অরিন্দম ব্যানার্জি এম-আর-সি-পি, দেওঘরের আশ্রমে যে আছে সে-ই। আমি তো ঐ একটা সম্বন্ধই এনেছিলাম শ্যামার। সবই ফার্স্ট ক্লাস ছিল, একটু ডিফেক্ট ঐ সন্ন্যাসটা। ওটা না হলে…

শ্যামা কথা বলল না, বুকটা একটু চমকাল মাত্র।

ট্যাক্সিতে শ্যামা আর শংকর দুধারে বসেছে, মাঝখানে কমলা। পাড়ার মোড়টা পেরোতে গিয়ে একটা চায়ের স্টল আর রক দেখিয়ে শংকরদা বলে…শ্যামা, এ সব অঞ্চলের ছেলে-ছোকরাগুলো গেল কোথায়! দিন-রাত আড্ডা দিত, চুরি-ছিনতাই করত, টিট্‌কিরি দিত! সব হাপিস হয়ে গেল না কি?

—কী জানি! দেখছি না তো! পাড়াতেও ঘোরে না।

জিভ দিয়ে একটা চুক চুক শব্দ করে শঙ্করদা বলে···হাপিসই হয়ে যাচ্ছে শ্যামা। খুব ধরপাকড় হচ্ছে তো! কিছু পুলিস নিয়ে গেছে, কিছু মরেছে নিজেদের হাতেই, কিছু পালিয়েছে। সব পাড়াতেই ছেলে-ছোকরা কমে যাচ্ছে। আফশোসের কথা।

শ্যামা হাসে···কেন?

—তোমাদের খাঁটি অ্যাডমায়রার তো এরাই ছিল!

কমলা ধমক দেয়···থাম তো!

—থামবার কী! আমার তো মনে হয় তোমার সবচেয়ে বড় অ্যাড-মায়রার ছিল কাবুল, ভুল বানানে প্রেমপত্র লিখত কিন্তু কী ভালবাসা! তোমার বিয়ের পরই কাবুল নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল না?

—ওকে অ্যাডমায়রার বলে না।

—ওরাই খাঁটি অ্যাডমায়রার শ্যামা, তোমারও একজন আছে না? নয়ন না কি যেন নাম!

শ্যামা মুখটা ফিরিয়ে নিল।

—সে এখনও বেঁচে-বর্তে আছে তো। না কি হাপিস হয়ে গেছে?

শ্যামা মুখটা ফিরিয়ে বলল···শঙ্করদা, ওকে কিছু করতে পারেন না? বড্ড জ্বালায়।

—রিসেণ্টলি কিছু করেছে না কি?

—করেছে।

—কী?

—বাবা মার সঙ্গে কদিন আগে একটা মন্দিরে গিয়েছিলাম না। সেইখানেও পিছু নিয়েছিল। একটা মস্ত আমবাগান পেরিয়ে যেতে হয়। বাবা মা একটু এগিয়ে গিয়েছিল, আমি বুনো ফুল তুলতে দাঁড়িয়েছি, সেই সময়ে আমার রাস্তা আটকেছিল। সাহস বড় বেড়ে গেছে।

—কাছে আসার চেষ্টা করেছিল না কি?

—হুঁ!

শঙ্করদা একটু চুপ করে থাকে। কমলা বলে···ভাবিস না। ওরা ঐরকম। কাবুল আমাকে কম জ্বালায় নি।

—ও মাঝে মাঝে আমাকে খুন করবে বলে শাসায়। শাসানিটা মিথ্যে নয়, ও পারে। বলল শ্যামা।

শঙ্করদা চিন্তিত মুখে চুপ করে থাকে একটু। বলে...কী করব

শ্যামা, এদের মুকাবেলা করতে হলে একটা প্রস্তুতি দরকার। দুঃখের বিষয় আমার তা নেই। ভদ্রলোক হয়েই গেলাম। দেখি যদি কিছু করা যায়।

উদ্বেগ নিয়ে কমলা বলে—তুমি আবার কী করবে? নয়নকে আমি চিনি। রাসবিহারীতে যারা একজন এস-আইকে মেরেছিল ও তাদের দলে ছিল। ওসব এলিমেণ্টের সঙ্গে খবরদার লাগতে যেও না। শ্যামার পিছনে ঘুরছে ঘুরুক। শ্যামার একটা বিয়ে দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

—সন্ন্যাসিঠাকুরকে ফিরিয়ে দিয়ে তোমরা ভাল কর নি শ্যামা। মানুষটার মধ্যে একটা ভারী সৎ ব্যাপার ছিল। শংকরদা বলে।

শ্যামা মৃদু শ্বাসের স্বরে বলে—আমি কী করব?

কমলাও বলে—ও কী করবে? ওর মতামতের কোন দাম আছে না কি! মামা আর মামী কেবল ছেলে-ছেলে করে ক্ষেপে থাকলে ওর কোনদিন বিয়ে হবে না। ও'দের মতামত ছেড়ে দিয়ে এবার আমাদেরই কিছু করতে হবে। হ্যাঁরে শ্যামা, নয়ন কি বাড়াবাড়ি করছে খুব? আগে তো কেবল চিঠিটিঠি দিত, আর কোকিল ডাকতে ডাকতে যেত?

থমথমে মুখে শ্যামা বলে—এখনও যায়। আমার কিছু ভাল লাগে না কমলাদি।

কমলা মুখ ফিরিয়ে শংকরদার দিকে চেয়ে বলে—তোমার খোঁজে আর ছেলে নেই? কত তো আড্ডা দাও বন্ধুদের সঙ্গে, তাদের মধ্যে কাউকে খুঁজে পাও না? আমি কালই একবার উমার বাসায় যাব তো, আই-সি-আই-এর একজন এঞ্জিনীয়ার ছেলে আছে ওর পাশের ফ্ল্যাটে, দুবার বিলেত গেছে···

—ওসব বিলেতবাজ পাত্র ছাড়। খাঁটি দিশি ছেলে দেখ।

—আহা, তোমার সন্নিসিঠাকুরও তো বিলেত-ফেরত।

—সে লোকটা বিলেতের গন্ধ মুছে ফেলেছে।

—বিলেতের দোষ কী। তোমার যত···

—কিছুই না। কিন্তু কমলা, ইংরেজ আমলেও বিলেত-ফেরতের এত কদর ছিল না এখন যতটা হয়েছে। বিলেত-ফেরত নিয়ে এখন হাই কম্পিটিশন, সুবিধে হবে না। তার চেয়ে দিশি পাত্র যোগাড় করা সোজা।

—তাই দেখ না। তাড়াতাড়ি বিয়েটা হয়ে যাওয়া দরকার। মামা-মামীর উদাসীন ভাব আমার ভাল লাগে না। শেষে দেখ আইবুড়ো থেকে থেকে লাবণ্য ঝরে যাবে, গালে মেচেতা ধরবে, তখন যার-তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। শ্যামা, তুই ভাবিস না রে, কাল থেকেই আমি লাগছি।

শ্যামা ম্লান হাসে।

বিকেলটা তবু ভালই কাটল। সিনেমার পর রেস্টুরেন্টে খুব খাওয়াল শঙ্করদা।

শ্যামার ইচ্ছে হচ্ছিল জিজ্ঞেস করে, সেই ছেলেটার কি বিয়ে হয়ে গেছে? তোমরা অন্য পাত্র খুঁজবে কেন। সেই তো বেশ ছিল। কিন্তু শ্যামার বড় লজ্জা করে।

শঙ্করদা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল—শ্যামা, কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়লে সব মেয়েরই কিছু স্যুটার জোটে। তোমার তেমন কেউ নেই? আমি শুনেছি, তোমার অনেক স্যুটার।

শ্যামা চায়ের কাপে মাথা নীচু করে বলে—ছিল তো।

—তাদের কাউকে পাত্তা দাও নি, না?

শ্যামা মাথা নেড়ে বলে—না। তারপর হাসতে থাকে।

—তোমার সবই ভাল, কেবল ঐ একটাই ডিফেক্ট। তুমি ভারী ভীতু আর আনস্মার্ট।

কমলাদি ঝঙ্কার দিয়ে বলে—আর স্মার্ট হয়ে কাজ নেই। যা আছে বেশ আছে। যারা নিজে বর খুঁজে বিয়ে করেছে তারা কিছু বেশী সুখে নেই।

—তুমি বড্ড সেকেলে। শ্যামা, তোমার মত কী?

—শঙ্করদা, আমি কিছু বুঝি না।

—কেমন পুরুষ তোমার পছন্দ সে সম্পর্কে কখনও কোন আইডিয়া কর নি?

—আইডিয়া কি ধরা-ছোঁয়া যায়? আইডিয়া আইডিয়াই থাকে।

—তবু বল না।

কমলা রাগ করে বলে—বলে কী হবে? কোন মেয়েই সেরকম পুরুষ পায় না। ঠিক যেমনটি সে চায়, আবার যাকে পায় তাকে নিয়েও তার চলে যায়। ভাবে, আমি এরকমটিই চেয়েছিলাম।

কমলাদি বেশ গম্ভীর মুখে বলছিল। শুনে শংকর এক চোখে হেসে বলে—তা তুমি কেমন চেয়েছিলে?

কপট শ্বাস ফেলে কমলাদি বলে—তার সঙ্গে তোমার তুলনাই হয় না।

—যাকে পেয়েছ তাকে নিয়ে চলছে তো?

—নিজে বুঝে দেখ।

—বুঝেছি।

—শ্যামাকে জ্বালিও না। ওকে ছেলেবেলা থেকে দেখছি, ওর তেমন কোন পছন্দ অপছন্দ নেই। ও সত্যিকারের ভাল মেয়ে।

শংকরদা শ্যামার দিকে চেয়ে বলে—সত্যি? কখনও ভাবী স্বামীর কথা ভাব না? কখনও না?

শ্যামা একটু হাসে। ম্লান সেই হাসিটি তার। বলে—ভেবেছি।

আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে শংকর—কেমন?

শ্যামা চোখটা একটু বোজে। শীর্ণ, কালো, দীর্ঘ একটি আবছা চেহারা দেখতে পায়। চোখ দুখানা উজ্জ্বল এবং আবিলতাহীন। আস্তে করে বলে…তেমনি পুরুষ যে খুব ভালবাসবে। খুব। কখনও দোষ ধরবে না আমার। আর সে নিজে খুব ভাল হবে। আর কিছু না।

শংকরদা হতাশ হয়ে পিছনে হেলান দিয়ে বলে…দূর! ও থেকে কিছু কি বোঝা যায়। ভাবলাম কী না জানি সব স্পেসিফিকেশন শুনব। যাঃ! এই বেয়ারা, বিল!

—হতাশ হলেন?

—হব না? ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার কিংবা স্মার্ট কিংবা সুন্দর…কত কী স্পেসিফিকেশন ছিল। তুমি সত্যিকারের ভাল মানুষ শ্যামা। ভাল মানুষকে আজকাল কী বলে জান তো?

—কী?

—লেদ্রু। তুমি পারফেক্ট লেদ্রু।

কমলাদি বলে…ও ঠিক বলেছে। মেয়েদের পছন্দসই পুরুষ হওয়া অত সোজা নয়। ন্যাং ন্যাং করে অনেকেই ঘোরে পেছনে, জোর করে ভালবাসা আদায় করে। কিন্তু পছন্দসই পুরুষ খুব রেয়ার।

শ্যামা কমলাদিকে ঠেলা দিয়ে বলে…কী যা তা বকছ কমলাদি! শংকরদাও তো বলতে পারে পুরুষদের পছন্দসই মেয়েও আমরা কেউ নই।

কমলাদির চোখ মুখ সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ন হয়ে যায়, স্বামীর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে বলে···বলুক না ! বলে দেখুক !

সিগারেট মুখে শঙ্করদা হেসে হাতজোড় করে বলে—আমি বলি নি চ বলছি না। আমি যেমনটি চেয়েছি তেমনটিই পেয়েছি। শ্যামা, তোমার কমলাদিকে যৌবনের কানন দেবীর মত দেখতে নয় ?

—আমি তো দেখি নি। তবে অনেকটা সেরকমই মনে হয়। ব'লে হাসে শ্যামা।

—দেখ নি ! বলে ভারী অবাক হয় শঙ্করদা···দেখ নি কানন দেবীর ছবি ?

—কী করে দেখব ? আমাদের সময়ে সে সব ছবি তো দেখান হয় না।

একটু গুম হয়ে থেকে শঙ্করদা বলে···বাস্তবিক আমাদের কত বয়স হয়ে গেল ! আমরা কৈশোরকালে কানন দেবীর গান গাইতাম, ছবি দেখতাম। তোমাদের সঙ্গে আমাদের জেনারেশন গ্যাপ বোধ হয় এইটাই চ আমাদের সময়কার ক্রেজ্ তোমাদের সময়কার বিস্মৃতি ! আরে বাঃ !

কমলাদি বলে···ওঠ, আর কথা বাড়াতে হবে না। আমি আমার মত দেখতে। কারও কৈশোরের হিরোইন হতে চাই না, আমি যেমন ঠিক তেমনি।

—সবাই তাই কমলা। কিন্তু শ্যামা, তোমাকে ঠিক বোঝা গেল না। কমলাদির সামনে লজ্জা পাচ্ছ বলতে। বুঝতে পারছি। একদিন না হয় আমাকে গোপনে তোমার স্পেসিফিকেশনটা জানিয়ে দিও।

ফেরার সময়ে ট্যাক্সিতেও একবার শ্যামার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়েছিল, সেই লোকটা এখন কোথায় ! জিজ্ঞেস করল না।

শঙ্করদা কমলাদির ওপাশ থেকে ঝুঁকে বলল···শ্যামা, তোমার জন্য কিছু করতে পারলে খুশী হব। তোমার স্পেসিফিকেশন থাকলে বল, বিশেষ কাউকে পছন্দ থাকলে তাও বল, নেগোশিয়েট করব।

শ্যামা একটা শ্বাস ফেলে কেবল। বলে···বিয়ের চেয়েও আমার একটা চাকরি বেশী দরকার।

—কেন ?

—বাবার একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। আর একটাও বোধ হয় শিগ্‌গিরই হবে, দাদার জন্য এত উদ্বেগ ইদানীং, মোনা ঠাকুর বলেছে

হরিদ্বার বা হৃষীকেশ কোথাও সন্ন্যাসী হয়ে দাদা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তো আমরাও চললাম বুনো মোষ তাড়াতে। এই শরীরে বাবার ঐ-সব দূর দেশে, পাহাড়-টাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে কী যে হবে! আমার সব সময়ে বাবার জন্য ভয়। কাল রাতেও স্বপ্ন দেখেছি। বিশ্রী স্বপ্ন।

—ভেব না শ্যামা।

—ভাবনা কি কারও পোষ মানে? ভাবি, বাবার কিছু যদি হয় তবে আমাদের কী হবে! একটা চাকরি থাকলে তবু ভরসা থাকে।

কমলাদি মাথা নেড়ে বলে...চাকরি দিয়ে কি হবে রে মুখপুড়ি! মামার টাকা কিছু কম নেই। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আর গ্র্যাচুইটির অ্যাতো টাকা রয়েছে ব্যাংকে, বাড়িটাও তো অনেকটা হয়ে গেছে। তোর চিন্তা কী।

—আমার বিয়ে দিতেও তো খরচ আছে।

—ওমা! খরচ তো ঐ একটাই। মামা-মামীর মত এমন লাইট ফ্যামিলি কটা আছে! চাকরির চিন্তা ছাড়, তোর বিয়ে দিয়েও মামার অনেক থাকবে। মামা খুব কেপ্পন ছিল, জমিয়েছে অনেক।

—যাঃ!

—যাঃ বলিস না শ্যামা। মামার সারা জীবনের সবচেয়ে বড় খরচ ছিল খাওয়ার। খাওয়া-খাওয়া করে চিরকাল পাগল। আমকাতল, চিতলপেটি, ইলিশ ভাপে, মুড়োর ডাল·· এইসব নিয়ে সারাটা জীবন খরচ করল, মামীর গায়ে একটা গয়না বা দামী শাড়ি দেখলুম না। কেপ্পন বলব না তো কী? তোর বিয়েটাই বা মামা দেব-দিচ্ছি করে দিল না কেন? কত ভাল সব সম্বন্ধ এসেছিল! খরচের ভয় না তো কি?

—কী সব বলছ? বলে ধমক দেয় শংকরদা।

—ঠিকই বলছি। পাগলের কি চিকিৎসা নেই? দিলীপ তেমন পাগল তো ছিল না! একটু আনব্যালান্সড্ ছিল, তা রাঁচী বা লুম্বিনিতে রাখলে ভাল হয়ে যেত না? মামা গেল কবিরাজী আর হোমিওপ্যাথী করতে! মামী কত দুঃখ করেছে, ঝগড়া করেছে। শ্যামা, কিছু মনে করিস না, দিলীপকে খুঁজে পেতে এখন যে খরচ হবে তার অর্ধেক খরচে দিলীপের চিকিৎসা করে ওকে ভাল করা যেত। খাওয়ায় খরচ ছাড়া মামা আর কোন্ খরচটা করেছে! নইলে বাড়িটা······

শংকরদা ব্যাগ্রভাবে প্রসঙ্গটা ঘোরায়···খাওয়া ছাড়া বাঙালী যে কিছু

বোঝেই না। রোজ ট্রামে-বাসে রাস্তায়-অফিসে যত আলোচনা শুনি সবটাই খাওয়ার। পলিটিক্সের কথা, সাহিত্যের কথা, দর্শনের কথা, সব কথার মধ্যেই বাঙালী ঠিক খাওয়ার কথা তুলে ফেলবে। বাঙালী খাওয়ার চিন্তা নিয়ে ঘুম থেকে ওঠে, খাওয়ার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমোতে যায়। মামার দোষ কী?

—কথা ঘুরিও না। আমার রাগ হয়।

শঙ্করদা সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করে…কার ওপর?

—পুরুষ জাতটার ওপর। ভারী নিমকহারাম। আর স্বার্থপর।

শঙ্করদা শ্বাস ফেলে চুপ করে থাকে।

ওদের বিয়েটা ভালবাসার নয়। কিন্তু ভালবাসাটা ক্রমে জন্ম নিচ্ছে। ওদের কাছে গেলে সেই চাপা স্রোতস্বিনীর কুলু কুলু শব্দ পাওয়া যায়। ওরা গতিময়, বহমান। শ্যামার মন চনমন করে। আলোকলতার শরীরে যখন আঁকশি জন্মায়, ছোট্ট ছোট্ট কোঁকড়ান বাহুর মত শূন্যে প্রসারিত হয়ে অবলম্বন ধরতে চায়। তেমনি শূন্যতার মধ্যে শ্যামা একজনকে খোঁজে। প্রকাণ্ড গাছের মত সে। ঝড়ে-ঝাপটায় স্থির।

দিনটা ভালই কেটে গেল শ্যামার। আবার কাটলও না। সারাটা রাত তার বুকের এক ধারটা, মনের এক ধারটা ফাঁকা লাগল। আজ রাতে সে স্বপ্ন দেখল না, কিন্তু ঘুমটাও তেমন গভীর হল না। সকালে খানিকটা বেলায় উঠে তার ক্লান্তি লাগল খুব। শিয়রের জানালা খুলতেই দেখল রোদ আজ বড় তেজী। ফটফটে। জানালার খাঁজ শূন্য। নয়ন বেশ কিছুদিন হল চিঠি রেখে যাচ্ছে না। নয়নের হল কী?

কাকভোর। পাখীর ডাক সদ্য শোনা যায়। শিশির-ভেজা মাটির গন্ধ এখন বাইরে। উঠোনে হলুদ-গাঁদা আলো করে ফুটেছে। শিউলি জমেছে গাছের তলায়। দিনের আলো সব মানুষকেই বাইরে ডাকে।

অবিকল মুর্গীর ডাক শুনে সুকুলের ঘুম ভাঙল। তড়বড় করে উঠে বসে সে! বাবাকে নেড়ে উত্তেজিত গলায় বলে…বাবা ঘরের

ভিতরে মুর্গী ডাকছে গো।

জগদীশ পাশ ফিরে ঘুমচোখে সুকুলের দিকে চায়। সুকুলের চোখে-মুখে সব সময়ে একটা অবাক ভাব। নতুন মেলায় গেলে কচি-কাচাদের যেমন হয়, যতই দেখে মেলার বাহার ততই বাক্য হরে চেয়ে থাকে, তেমনই সুকুলের চার ধারে দুনিয়ার মেলা লেগেই আছে। তার বিস্ময় ফুরোয় না। ছেলেটি জগদীশের। জগদীশেরই। আর কার? যারা বলে যে তার নয়, তারা নিষ্ঠুর, তারা মিথ্যেবাদী! এই ভোরে বন্ধ ঘরের ভিতরে আবছায়ায় সুকুলের সরল মুখশ্রী দেখলে বুকের ভিতরে যেন ধূপগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। আর সব ভুল পড়ে যায়।

জগদীশ মৃদু গলায় বলে—মুর্গী নয় বাবা, ও নয়নখুড়ো।

সুকুলের গালের একধারে এঁড়ানীর দাগ, চোখ দুটো ফোলা ফোলা। চুল হামলে পড়েছে কপালে, কিছু উঁচিয়ে আছে, ভেঙে পড়েছে কান ঢেকে। সব মিলিয়ে এক যশোদা দুলালের ছবি।

—নয়নখুঁড়ো? দেখি তো!

বলে মশারি তুলে লাফিয়ে নামে সুকুল।

এই ভোরে নয়নের ওঠার কথা নয়। বহুকাল ধরেই ঘুমহীনতার রোগ তার। মাঝে-মধ্যে সে ওষুধ খেয়ে ঘুমোয়। তার প্রিয় বড়ি সোনেরিল। ক্রমশ বড়ির মাত্রা বেড়ে বেড়ে এখন একসঙ্গে তিনটে চারটে খায়, কখনও বা তারও বেশী। তারপর এক ধরনের অচ্ছন্নতা নিয়ে পড়ে থাকে। খুব দুঃস্বপ্ন দেখে। ঘুমের মধ্যেও হিজিবিজি চিন্তা করে। কখনও সে ডাক্তার দেখায় নি।

জগদীশ সেই রাতের ঘটনার পর মাঝখানের দরজা বন্ধ রাখে। কেউটে দুটোর বিষদাঁতও কামিয়ে ফেলেছে। কিছু দেখার নেই। সারা রাত বিছানায় শুয়ে বসে, ঘরে পায়চারী করে আর সিগারেট খেয়ে কাটায় সে। মাথা অসম্ভব গরম হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। তখন দরজা খুলে উঠোনে যায়। তারা-ভরা আকাশ থেকে হিম ঝরে পড়ে, টুপটাপ পাতা খসার শব্দ। গাছেরা অলক্ষ্যে নিষ্পত্র হয়ে যাচ্ছে। আজকাল দু-তিনটে দমকা বাতাসে গাছ ন্যাড়া হয়ে যায়। গভীর রাতে তারের যন্ত্রের মত ডাকে ঝিঁ ঝিঁ, কাঁদে শেয়াল-কুকুর, বাদুড় ডানা ঝাপটায়। জ্যোৎস্নায় ভোরের স্বপ্ন দেখে ভুল করে জাগবার ডাক দিয়ে ককিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে পাখী। তখন কালিঢাকা আকাশের পশ্চিম প্রান্তসীমায় চাঁদ নেমেছে

ঝুলে আছে। নিষ্পত্র গাছের শেষ হলুদ পাতাটির মত দুল্‌ দুল্‌ করছে ক্ষয়া ভাঙা চাঁদ, ভোরের প্রথম বাতাসেই খসে পড়ে যাবে। নিঃঝুম দৃশ্যটির দিকে চেয়ে থেকে নয়নের আচমকা মনে হয়—এখানে কেন পড়ে আছি? কী চাই আমি?

উত্তর তার জানা নেই। সে এমন অনেক কাজ করে যা কেন করে তা তার জানা থাকে না। এক রকম নেশারু ঘোরের মধ্যে সে চলে। রেগে যায়, উত্তেজিত হয়। কামুক হয়ে পড়ে। এক সময়ে মনে হয় শ্যামাকে ছাড়া সে আর একদিনও বাঁচবে না। পরমুহূর্তেই মনে হয়, শ্যামাকে দিয়ে কী হবে? তার কাছে চার দিক সব সময়েই আলো আঁধারি। যেন বা তার জীবনযাত্রা কেবলই এক বনভূমির ছায়ায় ঢাকা আবছায়া পথটি বেয়ে। দিনের আলো আছে, আবার নেইও। কিছুই স্পষ্ট নয় সেখানে। এই অনন্ত বনভূমিটি কোনদিন ফুরোবে না, মনে হয়।

ভোরের প্রথম পাখীটি যখন ডাকল তখন পূবের আকাশ ছাইরঙা। একা ভূতের মত নয়ন উঠোনে দাঁড়িয়ে। স্থির ও একাকী। পাখীরা ক্রমে তার চারধারে ডাকতে থাকে। তারপর ওড়ে। দূরে ব্রাহ্মসময় ঘোষণা করে মুর্গীর ডাক। সারা ভোর জুড়ে নানা শব্দের আজান ধ্বনিত হয়। তখন হিমে ভিজে গেছে নয়নের চুল, তার গা বরফ, চোখে শীতের অশ্রু-বিন্দু। শরীরের বোধ তার নেই। সংবিৎ ফিরে পেয়ে নির্ঘুম, জ্বালা-ধরা চোখ সে একবার হাতের পিঠে মুছে নেয়।

ভোরে এই যে চতুর্দিকে জেগে ওঠা এটা টের পেয়ে নয়নের বুকের ভিতরটা হঠাৎ ধক্‌ করে নড়ে যায়। যার ঘুম নেই, তার জেগে ওঠাও নেই। এই সুন্দর ভোরবেলাটির সঙ্গে নয়নের নিজস্ব চেয়ে থাকার কোন মিল নেই। ভারী একা লাগে তার। ভয় করে সে কেন ঘুমোয় না?

ঘরে এসে নয়ন তার পার্সটা আর একবার খোঁজে। কোণায় কি খাঁজে যদি এক আধটা বড়িও খুঁজে পাওয়া যায়। নেই। সে জানে। কাল রাতেও খুঁজেছে। হতাশ নয়ন আবার পায়চারী করে কিছুক্ষণ।

বিছানার চাদরটা টেনে নিয়ে গায়ে জড়ায় নয়ন, র‍্যাপারের মত। দরজা টেনে শিকলি দিয়ে বেরোবার আগে অবিকল মুর্গীর মত একবার দুবার ডাক দেয়। পাশের ঘরে সুকুলের গলার স্বর পায়। বাবাকে

ডেকে কী যেন জিজ্ঞেস করছে সুকুল। জগদীশ উত্তর দিল।

উঠোনটা পার হয়ে সে রাস্তা ধরে। ঝোপঝাড়ের পাশে রাস্তাটা আঁকাবাঁকা কেমন পড়ে আছে। সাদা হাড়ের মত রঙ। আবছায়া এখনও। পুবে কেবল ফ্যাকাসে রঙের ওপর লাল একটা ছোপ ধরেছে। গাছপালায় ঝুলে আছে অন্ধকার। পরিষ্কার ঠাণ্ডা বাতাস শ্বাসে ঢুকে বুক চিরে দিচ্ছে।

কোথাও যাওয়ার নেই। তার পথ সবদিকে খোলা। দূর থেকেই মোনা ঠাকুরের পুরোনো মন্দিরের ওপর জাপানী ছবির মত একটা অশ্বথ-চারাকে আকাশের গায়ে আঁকা দেখা যায়। পৃথিবীর সব মন্দিরের গায়েই বোধ হয় অলক্ষ্যে অশ্বথচারা জন্মেছে এখন। গভীর শিকড় নেমে যাচ্ছে মন্দিরের অভ্যন্তরে নালী ঘায়ের মত। মোনা ঠাকুরদের দিনকাল শেষ হয়ে এল। খামোখা আলু টপকাবার পরিশ্রম। দরকার নেই। অশ্বথের চারাটি মুখ উঁচিয়ে তো বলেই দিচ্ছে, শেষ শুরু হয়ে গেছে। দেরী নেই।

নয়ন নাবাল মাঠটি থেকে মন্দির চত্বরে উঠে আসে। নির্জন। কেবল পাখীর ডাক, আর পতনশীল পাতার শব্দ। একবার সে মন্দিরটার মুখোমুখি দাঁড়ায়। লোহার গুল বসানো ভারী দুটো কাঠের পাল্লা বন্ধ। প্রকাণ্ড তালা ঝুলছে।

মাটিতে পড়া ফুলে পুজো হয় না। রাতে তাই শিউলিতলায় কাপড় বিছিয়ে রাখে তারা। সকালে কুড়িয়ে নেয় রাশি ফুল। শিউলিতেই ভরে যায় সাজি। তারপর স্থলপদ্ম আর জবা।

স্থলপদ্ম এ সময়টায় রাশি রাশি ফোটে। নীচু ডালগুলো শেষ করে তারা আঁকশি দিয়ে উঁচু একটা ডাল নুইয়ে আনছে। ফুলটা এসেও গেছে আঙুলের ছোঁয়ায়! আর একটু…একটু…। টুপ করে একফোঁটা হিম শিশিরের জল তার গালে পড়ল। হাসল তারা। ডালটা ছেড়ে দিয়ে আঁচলে গাল মুছল। শীত করে তার। বড্ড শীত করে। পদ্মটা পাড়ল না তারা। থাক একটা দুটো পদ্ম। গাছের ফুল গাছে থাক।

কুয়োর পাড়ে জবাগাছটা ভিজে শরীরে দাঁড়িয়ে। ঝুপসী। ফুল তুলবার আগে তারা এই আবছায়া ভোরের আলোতে কুয়োয় ঝুঁকে জল

দেখল। জল নীচে নেমে গেছে অনেক। সেই কোন্ পাতালে একটা গোল আয়না বসানো, তাতে ফিকে ফিরোজা রঙ। স্থির জলে তারা নিজের ছায়া দেখল। কিছু বোঝা যায় না। না রঙ, না মুখ-চোখ। একটা ভূত যেন সে। এই ভোরবেলা ঘুম থেকে সদ্য উঠে তাকে কেমন দেখাচ্ছে? কে জানে। তাদের ঘরে একটা বড় আয়নাও নেই যে দেখবে। কাঠের আয়না, তাতে আবার ঝাঁপ ফেলার বন্দোবস্ত আছে। সেই ঢাকনার ওপর ফুল পাতা পাখী আঁকা, লেখা···সুখে থাক। মরি মরি, কে যে আয়নাটা কিনে এনেছিল! সেই সুখের আয়নার ঢাকনা খুললে ঢেউ খেলান কাচে নিজের মুখখানা দেখে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে। আজ পর্যন্ত কম দিনই সে নিজের কোমর পর্যন্ত প্রতিবিম্ব দেখেছে। যদি কখনও দিন পায় সে, একটা বড় আয়না কিনবে। নিজের দিকে চেয়ে বসে থাকবে। নিজের কত কী দেখার থাকে, কেউ বোঝে না।

সবার আগে বাবার গুরুপুজো, চক্রের দিকে চেয়ে ধ্যান, জপ তারপর বিনীত প্রার্থনা। ততক্ষণ বাবা এদিকে আসবে না। তারা নিশ্চিন্তে আবছায়া ছায়াটির দিকে চেয়ে থাকে। ছায়ার পিছনে আকাশ কী উঁচুতে! সে কি খুব রোগা? ছিপছিপে, না রোগা? কোন্টা বলবে তাকে মানুষ? কালো, না শ্যামবর্ণ? মুখখানা কেমন তার?

অনেক পাখী-পক্ষী আর মুর্গীর ডাক সে শুনছিল এতক্ষণ। এ সময়ে ওরা তো ডাকবেই। চমকায় নি। হঠাৎ শুনতে পেল, মন্দিরের চাতালে, কি বারান্দায়, কোথায় যেন খুব কাছেই একটা মোরগ ডাকছে।

ডাকার কথা নয়। কাছাকাছি মোরগ পোষে না কেউ। পুষলেও মন্দিরে আসতে পারে বলে ছাড়ে না, বাবা শুনলে···

তারা দুই হাতে তালি দিয়ে বলল—হুস্।

আবার মুর্গী ডাকল। পরিষ্কার ডাক। মন্দিরের বারান্দাতেই উঠে এল বুঝি! তারা গাছপালার ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেল। ফুল-কপি উঁকি মারছে সদ্য, ক্ষেতের ঢিবিগুলো পেরিয়ে বেড়ার ধারে এল। বলল—হুস্।

দেখা গেল না। মন্দিরের চাতাল ফাঁকা, বারান্দা শূন্য।

আড়াল থেকে আবার মুর্গী ডাকে। আনন্দিত ডাক।

তারা বেড়াটা টপকে পার হয়। পাখীর মত উড়ে আসে মন্দিরের বারান্দায়। হাততালি দিয়ে 'হুস্ হুস্' শব্দ করে ছোটে। প্রথমটায়

দেখতে পায় না কিছু। কিন্তু মনে হয় গোল বারান্দাটা দিয়ে একটা পায়ের শব্দ মন্দিরের দেয়ালের আড়ালে আড়ালে চলে যাচ্ছে।

হঠাৎ একটা হলুদ জামার অংশ চকিতে দেখা গেল। মিলিয়ে গেল দেয়ালের ওপাশে।

তারা দাঁড়িয়ে সতর্ক গলায় বলে···কে ?

উত্তর নেই।

—আমি কিন্তু লোক ডাকব।

নয়ন বারান্দাটা থেকে লাফ দিয়ে ঘাসে নামে। অন্ধকার আর নেই। উঁচু গাছের মগডালে প্রথম আলোর লাল কণাটি এসে পড়েছে। আলো ফুটবার সময়টি বড় সুন্দর। ফুল যেমন ফোটে। তারপর থেকে শুরু হয় দিন। দিন তারার ভাল লাগে না। মানুষ জেগে উঠলেই পৃথিবীটা নোংরা হয়ে যায়।

নয়ন উঁচু বারান্দার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। মেয়েটার পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। শ্বাসের শব্দ। নয়ন অপেক্ষা করে। পিছনে তাকায় না। উদাস চোখে পুব দিকে চেয়ে থাকে। তার শরীরে ঘুমহীনতার জ্বালা। শরীর বুঝি-বা একটু ক্লান্ত। তার খোলা শরীরের ওপর দিয়ে শীত গ্রীষ্ম চলে যায়, চলে যায় দিন রাত। তবু একটুও ঘুম আসে না। সোনেরিল ফুরিয়ে গেছে। আনা হয় নি। ধ্যুৎ তেরী!

মেয়েটা এগিয়ে আসে। থমকায়।

একটু চুপ। নয়ন ফিরে তাকায় না।

—কে দাঁড়িয়ে ওখানে ?

সিগারেটের একটা গোল ধোঁয়া জট খুলতে খুলতে নিথর বাতাস বেয়ে উঠে আসে।

তারা ভয় পায়। কে ?

নয়ন ফিরে তাকিয়ে একটু হাসল। তেলহীন মুখ চোখ তার, রাতে ঘুমোয় নি বলে শরীরের রস টেনে গেছে। হাসতে গিয়ে নিচের ঠোঁটটা চড়াৎ করে ফেটে গেল। জিভে রক্তের নোনা স্বাদ পায় নয়ন। তার চুল রুক্ষ, চোখের কোলে কালি। মেয়েটার ভয় পাওয়ারই কথা।

সে বলে···আমি নয়ন রায়। সুকুলদের বাড়িতে—

—ও। তা এখানে কেন?

—মায়ের স্থান। আসতে তো বাধা নেই।

তারা কি বলবে ভেবে পায় না। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থেকে বলে…একটা মুর্গী ডাকছিল এদিকে, সে কি আপনি?

নয়ন মাথা নাড়ে।

—কেন ডাকছিলেন ওরকম? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে তারা।

—এমনিই। খেয়াল হল।

তারা একটু চেয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ আঁচল মুখে তুলে 'খুক' করে হেসে ফেলে। সামলে বলে—কাল সুকুল বলছিল বটে একজন হরবোলা এসেছে তাদের বাড়িতে। এতক্ষণে বুঝলাম সে আপনিই তবে।

—আমিই।

সকালের আলোতে মেয়েটাকে সাদাসিধে দেখাচ্ছে। তেমন কিছু দেখার নেই। তবে কিনা যৌবনে কুক্কুরী ধন্যা। তাই মেয়েটির শরীর লাউডগার মত ডাঁটো, চামড়ায় ঘামতেলের মত চিকচিক। সবচেয়ে সুন্দর তার দীর্ঘ চুল। মস্ত একটা এলো খোঁপায় বেঁধে রেখেছে। নয়ন ঊর্ধ্ব-মুখে মেয়েটিকে ক্ষুধার্ত চোখে একটু দেখল, বলল—আমি অনেক ডাক ডাকতে পারি।

তারা শ্বাস ফেলল। বলল, ওসব ডেকে কী হয়।

—মানুষ চমকে যায়। এই কথা বলে একটু অর্থপূর্ণ হাসে।

তারা অস্বস্তি বোধ করে বলে—বাবা এক্ষুনি আসবে।

—আসুক না।

তারা আবার কথা হারিয়ে ফেলে। বিস্ময়ে চেয়ে থাকে একটু। তার-পর মুখ ফিরিয়ে বলে—ফুলের সাজি কুয়োপাড়ে ফেলে এসেছি। ঐ যাঃ! যদি কাকপক্ষী ছুঁয়ে দেয়!

বলে আবার পাখীর মত উড়ে যায় সে। পালায়।

নয়ন বারান্দায় তেমনি ঠেস দিয়ে সিগারেটটা শেষ করে। বাগানে মেয়েটি এখন একা। চারদিকে ঝোপ-ঝাড়, নির্জনতা। ইচ্ছে করলেই পিছু নিতে পারে নয়ন। কেউ লক্ষ্য করবে না। লক্ষ্য করলেই বা কী? নয়ন গ্রাহ্য করে না। শীতের সুন্দর বাগানে মেয়েটিকে জ্বালানো যেত। কিন্তু আজ তার সেরকম কোন ইচ্ছে নেই। কোনদিন ঘুমের জন্য দুঃখ

করে না সে। না ঘুমোন তার অভ্যাস। কিন্তু আজ হঠাৎ একটু ঘুমের জন্য তার বড় তেষ্টা পায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ঘুমের কথা ভাবে। তার কেন ঘুম নেই?

লোকটা চাষা না ভদ্রলোক বোঝা যায় না। মাল দিয়ে কাপড় পরে খালি গায়ে কেমন মাটি কোপাচ্ছে দেখ। কী তেজ শরীরে, বাঁট পর্যন্ত কোদাল গেঁথে যাচ্ছে মাটিতে। হুবহু চাষার মত মুখে নাকে হুমুস শব্দে শ্বাস ছেড়ে উল্টে দিচ্ছে গভীর চাপড়া। রোদ এখন তেজী। শরীরটার থাকে থাকে পেশী সেই রোদে ঝলসায়। উত্তুরে ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়েছে, বেলা বাড়ল। লোকটার গায়ে ঘাম, থুতনীর কাছে একটা ফোঁটা দুল্ দুল্ করছে। মাটির চাপড়াগুলো রোগা হাতে একটা খুরপী দিয়ে ঠুকঠুক করে ভাঙছে সুকুল। তার গায়ে পুরোহাতা হলুদ সোয়েটার।

মেহেদীর নীচু বেড়াটা ডিঙিয়ে নয়ন জমিতে নেমে আসে। একটু দূর থেকে দেখে। সুকুলের রঙ ফর্সা, নরম-সরম গা, মুখখানা লম্বাটে ছাঁদের, চোখ দুটো দীঘল। জগদীশের সঙ্গে কোন মিল নেই। জগদীশের শরীর চৌকো, মুখ চৌকো, চোখ গর্তে, গায়ের রঙ কালোই, তবে মিশ-মিশে নয়। সুকুল হয়ত তার মায়ের চেহারা পেয়েছে। যদি পেয়ে থাকে তবে বলতে হবে, ওর মা সুন্দরীই ছিল।

নয়নের দীর্ঘ ছায়াটা সুকুলের গা ছুঁতেই সুকুল মুখ ফিরিয়ে চেঁচাল—নয়নখুড়ো!

—উম্।

—সকালে তুমি মুর্গীর ডাক ডেকেছিলে?

—হুঁ।

—আমাকে শিখিয়ে দাও।

—দেব।

—বেড়ালের ঝগড়াটা শিখিয়ে দাও নি কিন্তু। ঐ যে দুটো বেড়ালে যখন ঝগড়া হয়, যখন গায়ে জলের ছিটে দিলে একজন আর একজনকে বলে—তুই আমার গায়ে মুতলি, অন্যটা বলে—তুই আমার গায়ে মুতলি, কি রকম করে বলে যেন? ফ্যাঁ-ও-ফ্যাঁ-অ্যা-ফ্যাঁস ফ্যাঁস—বলো না।

জগদীশ একবার তাকিয়ে তার কাজ করে যায়। কথা বলে না। কেবল সুকুলকে ধমক দেয় একটা—আমার কোপানো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু, তোমার চাপড়া ভাঙা পড়ে রইছে। থাক তবে তোমার পালা রোয়া হবে না—

সুকুল তাড়াতাড়ি চাপড়া ভাঙতে ভাঙতে হি হি করে হাসে। বলে···পোড়েলদের বুড়ো কাল বলছিল···কী কাণ্ড বাবু, এই দিনে এমন কোকিল ডাকে কেন রে? এত কোকিলের মচ্ছব লাগল কেন। কী জানি বাবু, কোন অলক্ষুণে ব্যাপার। জানে না তো যে তুমি ডাক।

জামগাছটার গোড়ায় কিছু ঘাস। গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে নয়ন। একটু অন্যমনস্ক। রোদে পাথুরে লোকটা মাটি উল্টে দিচ্ছে। ও রাতে কী নিঃসাড়ে ঘুমোয়! তবে কি পরিশ্রমই ঘুমের ওষুধ? না কি পুত্রস্নেহ? স্বাস্থ্য নয় তো? একটা শ্বাস ফেলে নয়ন। কী ভাবছে আবোল তাবোল! সবাই-ই তো ঘুমোয়। ঘুম আসে বলে। তার আসে না।

পলকের মধ্যে কাঠা দেড়েক ক্ষেত কুপিয়ে ফেলে জগদীশ। এখন ক্ষেতের শেষে দাঁড়িয়ে গামছায় ঘাম মুছছে। পায়ের কাছে দাঁড়ানো কোদালখানা। হেসে বলল···হেরে গেলি সুকুল! ঠুক ঠুক করে এখন সারাদিন লেগে যাবে তোর।

গামছায় গা মুছতে মুছতে জগদীশ এসে পাশে বসল। কোমর থেকে বিড়ির বাণ্ডিল বের করল। আর লাইটার। বলল...কোথায় গিছিলেন!

—ঘুরে এলাম।

—আলায় বালায় ঘুরলেন তো অনেক। কী খুঁজছেন আসলে?

নয়ন বলল···আমাকে সাপ ধরা শিখিয়ে দেওয়ার কথা ছিল আপনার!

জগদীশ চুপ করে থাকে। সে রাতে নয়নকে চড় মারার পর থেকেই বোধ হয় তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে। নয়নের সব কথার উত্তর সে দিচ্ছে না দুদিন! বিড়িটা ধরিয়ে খুব আরামে দীর্ঘ টান দিয়ে ঘন ধোঁয়া আস্তে ছেড়ে দিল। আরামের কাশি কাশল খুক্ খুক্ করে।

—শিখবেন?

—নিশ্চয়ই।

—তবে গুরু বলে মানুন।

নয়ন একটু তাকায়···মানে ?

জগদীশ হাসে···এসব গুপ্তবিদ্যা, কাউকে শেখানো যায় না অমনি। যদি শিষ্য হয় তবে শেখানো চলে।

নয়ন একটু হেসে বলে···আপনারা সবাই এত গুরু গুরু করেন কেন ? মোনা ঠাকুরও গুচ্ছের গুরুতর কথা বলে গেল সেদিন। ব্যাপারটা কী ?

জগদীশ দূরের দিকে চেয়ে বিড়িটা শেষ করে। তারপর হঠাৎ একটা শ্বাস ফেলে বলে···শহরের মানুষ গুরুর মর্ম কমই বোঝে। সেখানে সবাই গুরু। গা-গঞ্জের লোকেরা গুরু মানে, কারণ, তারা প্রকৃতির নিয়ম জানে। নিয়মই বলে দেয়, গুরু ছাড়া কিছু হয় না। উটকো লোককে কেউ কিছু শেখায় না। একটা আধবুড়ো নোংরা অশিক্ষিত লোককে গুরু মেনে, একবছর তার পদসেবা করে তবে আমি শিখেছিলাম। সে ভারী কষ্ট। লোকটাকে ঘেন্নাও হত। হেগে কাপড় ছাড়ত না, দাঁত মাজত না, গায়ে চিমসে গন্ধ, চোখে কেতুর, কথায় কথায় মেজাজ নিত, জাতেও জলচল না। তবু লোকটার পিছনে ঘুরতাম নেশাখোরের মত। মাঠে-ঘাটে ছিল তার সাপের বাগান। যেতে যেতে ফুল তোলার মত বিষধরদের টুকটাক তুলে নিত ঝাঁপিতে। না-কামানো সাপ বের করে সকাল বিকেল একা একা খেলত। তার সেই কাণ্ড দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। হ্যাঁ, গুরু বটে। লোকটার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। তবু আমি মাঝে মাঝে পাথরঘাটায় তার কবরের কাছে যাই সুকুলকে নিয়ে। বসে থাকি কবরটার পাশে। বেশ লাগে।

নয়ন চুপ করে থাকে।

জগদীশ একটু হেসে বলল···গুরু মানতে বলায় রাগ করলেন ?

নয়ন মাথা নেড়ে বলল...না। তবে আমার গুরু-ফুরুতে বিশ্বাস নেই।

জগদীশ বলে—তাহলে শেখানো চলে না।

—কেন ?

—গুরু না মানলে বিদ্যেটা একদিন অবিদ্যে হয়ে দাঁড়াবে। গুরু যেন রক্ষাকবচ, সে না থাকলে একদিন বিষধরই খাবে আপনাকে। গুরুর দেওয়া নিষেধ বারণ আছে, সে-সব শ্রদ্ধার সঙ্গে মানতে হবে। নইলে বিদ্যে কিছু না। আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি নিয়ম ভাঙতেই

জন্মেছেন। আপনি বিদ্যে নিয়ে বিপদ করবেন।

নয়ন একটু হাসে। বলে···তাহলে শেখাবেন না?

জগদীশ মাথা নাড়ে—না। বললাম তো আপনাকে কিছু শেখানো বড় বিপদ। রাতবিরেতে উঠে যদি সাপ-সাপিনীর হরগৌরী দেখতে চান তাহলেই হয়ে গেল।

নয়ন একটা ঢিল ছুঁড়ে বলে—ঠিক আছে। আমি নিজেই শিখে নেব।

জগদীশ অবাক হয়—নিজে শিখবেন! কী করে!

নয়ন হাসে—কায়দাটা খানিকটা বুঝে গেছি। একটু প্র্যাকটিস দরকার। ও হয়ে যাবে।

জগদীশ গম্ভীর গলায় সতর্ক করে দেয়—ও কাজও করতে যাবেন না। ও বড় হীন জীব। ওস্তাদ ছাড়া আর সবাই তার বধ্য। এ কেবল একটা দুটো কায়দা নয়, এ হচ্ছে একটা শাস্ত্র। সর্পচরিত্র জানা কি শুধু একটা দুটো সাপ ধরতে দেখেই হয়ে যায়?

—দেখা যাক।

জগদীশ মাথা নাড়ে—ও হয় না। আপনি না শিখে ধরতে গেলে হয় নিজে মরবেন, নয়তো সাপকে মারবেন। দুটোই খারাপ।

—আপনি সাপ মারেন না?

—উরে বুবাস রে! মারতে পারি।

—কেন, মারলে কী হয়?

—যারা শাস্ত্র জানে তারাই জানে মারতে নেই কেন? প্রকৃতির কোন জীব ফেলনা নয়। মারতে শুরু করলে তো সবই মেরে ফেলতে পারি, তখন মাথায় রক্তক্ষরণের ওষুধ আসবে কোত্থেকে?

—ওটা যুক্তি নয়। সংস্কার।

—তা হবে। আমি অত ভাবি না। গুরুর নিষেধ আছে, তাই যথেষ্ট। জলে ডাঙায় অন্তরীক্ষে জীব চলে-ফিরে বেড়ায় গুরুর দয়ায়। বেড়াক।

—তবে ধরেন কেন?

—ধরি তাকে জানবার জন্য। চেনা জানা কি পাপ? যেমন মানুষ চিনি, তেমনি সাপও চিনি, পাখী-পক্ষী চিনি। কত কী জানার আছে পৃথিবীতে। সুকুলবাবা, তোমার কি হাত ব্যথা করছে?

চিকণ গলায় সুকুল উত্তর দেয়—না তো।

—চলে এসো বরং। বাকীটা বিকেলে কোরো। তোমার তো নরম-সরম হাত পা, সইবে না। রোদটাও তেজালো।

সুকুলের সুন্দর মুখখানা তেতে লাল, মুখে হাসি, হাতের চেটোয় রোদ থেকে চোখ আড়াল করে চেয়ে বলল—দাঁড়াও না, কামিনী গাছটা অবধি করি, তারপর এসে নয়নখুড়োর কাছে ডাক শিখব।

জগদীশ মুখটা ফিরিয়ে নয়নকে বলে—শুনছেন ?

—কী ?

—ও ডাক শিখবার জন্য আপনাকে গুরু বলে মেনেছে। আপনি কিন্তু সাপ ধরতে শেখার জন্য গুরু মানছেন না।

নয়ন হাল্কা গলায় বলে—কাউকে গুরু মানা আমার গুরুর নিষেধ।

—কে গুরু ?

—কার্ল মার্কস্।

জগদীশ একটু গম্ভীর হয়ে থাকে। তারপর আস্তে করে বলে—নামটা চেনা-চেনা লাগছে। শহরে যখন বসত ছিল এক সময়ে তখন শুনতাম বটে নামটা। অনেকদিন শুনি নি।

ঠাট্টা কি না ধরবার জন্য নয়ন জগদীশের মুখটা দেখল। তার ভাঙা চোকো মুখে কোন ভাব প্রকাশ পায় না। একটা ভালমানুষী বা বোকামী সেখানে স্থায়ী বাসা নিয়েছে। জগদীশ একটা শ্বাস ফেলে বলল—তাঁর চেলা একসময়ে আমিও ছিলাম। বঙ্গবাসীতে ছাত্র ফেডারেশন করতে বছর খানেক তাঁরও চেলা ছিলাম। তারপর শরীর ডাক দিল। তখন কোঁৎ পেড়ে বিশাল ওজন তুলতাম, বানরের মত রিং-এ ঘুরতাম, অনায়াসে করতাম গ্রেট সার্কেল, উঁচু নীচু প্যারালাল বার, রোমান রিং, ভল্টিং বক্স—কত কী করতাম! ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন লাহিড়ী-দা। গুরু। তিনি ডেকে বললেন—তোমার হবে হে। সব ছেড়ে-ছুড়ে লেগে পড়। কাছের গুরু দূরের গুরুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল আমাকে। নইলে মার্কস্ সাহেবকে নিয়ে একটা তোলপাড় করার ইচ্ছে ছিল আমার।

নয়ন শান্ত গলায় বলে—আমার ইচ্ছেটা এখনও আছে।

—ভাল। বিশ্বাস থাকলেই ইচ্ছে জোর পায়। লেগে থাকুন।

সাপখোপ নিয়ে ভাববেন না।

নয়ন ঠাণ্ডা কৌতুকের গলায় বলে—আপনি আমাকে ভয় পান।

জগদীশ অবাক গলায় বলে—ভয় পাই?

নয়ন আস্তে হাত বাড়িয়ে জগদীশের মাংসল প্রকাণ্ড কাঁধে রাখে, পেশী-বহুল হাতখানায় হাত বুলিয়ে বলে···এই বিশাল শরীর, শাবলের মত হাত, তবু আমাকে আপনার ভয় কেন? সেই রাতে চড় কষালেন, আমি জবাবী কিছু করি নি, চড়টা মেনেই নিয়েছি। আপনিও জানেন আমাকে ঐ দুহাতে পিষে মেরে ফেলা যায়, তবু আমাকে আপনার ভয় কেন?

প্রকাণ্ড চেহারার জগদীশ কথাটা শুনে কেমন একটু কুঁকড়ে যায়, তার চোখে মুখে অস্বস্তি স্পষ্ট লক্ষ্য করা গেল। বিড়িটা নিভে গিয়েছিল, আবার ধরিয়ে বলল···কিসে বুঝলেন?

নয়ন এক ধরনের ঠাণ্ডা হাসি হাসে। বলে···জগদীশবাবু, আপনিও জানেন, আমিও জানি। আপনি চড়টা মারলেও ভয়টা আপনার উড়ে যায় নি।

জগদীশের বিড়িটা ধরে নি। দু একবার টিপে-টুপে সেটা ফেলে দিল সে। বলল···ঘরের দরজা বন্ধ রাখি বলে বলছেন? তা আপনার বিদ্ঘুটে কাণ্ড-কারখানাকে ভয় পেতেই হয়। পাগুলে কাণ্ডকে কে না ভয় করে?

নয়ন মাথা নেড়ে বলে···আর কোন ভয় নেই?

—আবার ভয় কিসের?

—ভয় যে কিসের তা কি আমি জানি? তবে লোকে ভয় পায় দেখেছি।

—ওটা বাড়িয়ে বলছেন।

—হবে। নয়ন উদাস গলায় বলে। তারপর হঠাৎ জগদীশের দিকে চেয়ে বলে···আপনার কাছে ঘুমের ওষুধ আছে?

—না। কেন?

—আমার খুব ঘুমোতে ইচ্ছে করে। কতদিন যে ঘুমোই নি।

—ঘুমোন নি কেন?

—ঘুম আসে না। এদিকে তো কোথাও সোনেরিল বড়িও পাওয়া যাবে না।

—বকখালিতে ওষুধের বড় দোকান আছে। দেড় ক্রোশ। ওষুধ

ছাড়া ঘুম আসে না ?

—না। ঘুমোতে পারি না। ইচ্ছে করে পড়ে কাঠ হয়ে ঘুমোই। স্বপ্ন দেখব না, চিন্তা করব না, একবার ওরকম ঘুম ঘুমোতে পারলে একটানা কয়েকদিন পড়ে থাকতাম।

জগদীশ একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, তারপর বলে…ঘুমোন না বটে! তাই সারারাত পাশের ঘরে মাঝে-মধ্যে পায়ের শব্দ শুনি। জেগে থেকে করেন কী? শরীরে আবল্যি আসে না?

—আসে। সারা রাত কী যে যন্ত্রণা! বড় একা লাগে। একটা ভয়ংকর কিছু করতে ইচ্ছে করে। রেগে যাই। তাড়ি, বাংলা, সব খেয়ে দেখেছি। ঝিমুনী আসে। কিন্তু সে ঠিক ঘুম না।

—আমার কাছে মোদক আছে। খেয়ে দেখবেন?

—দেখেছি। যত নেশা সব করেছি। কিন্তু নেশা তো ঘুম নয়।

—ভারী মুশকিল দেখছি।

—আগে কষ্ট হত না। আজকাল হয়।

দুপুরে অনেকক্ষণ ডাক শিখল সুকুল। বারান্দায় বসে। ক্লান্তিকর, তবু অনেক রকম ডাক ডাকল নয়ন। কুকুর শেয়াল বেড়াল পক্ষী। নানা-জনের গলার স্বর নকল করল। সুকুলের চোখ চক চক করল, মুখে চোখে ভীষণ কৌতূহল।

—আরও ডাক। সে বলল।

—সুকুল, একদিনে সব শিখতে নেই।

সুকুল জেদ ধরে…ডাক না, শুনি।

—এ সব শিখে কী হয়?

—আমি শিখব। আমি হরবোলা হয়ে যাব।

—কেন?

—রাস্তা দিয়ে অনেক ডাক ডাকতে ডাকতে যাব, তুমি যেমন যাও। লোকে বুঝতেই পারবে না যে সুকুল যাচ্ছে। চমকে উঠবে।

—লোকে চমকাতে ভালবাসে না সুকুল। দেখ, আমাকেও কেউ ঐজন্যই ভালবাসে না।

—আমি বাসি। খু-উ-ব।

নয়ন হাসে। হাসতে তার কষ্ট হয়। ঠোঁটে রক্ত জমে আছে।

চোখে জ্বালা। সকালে একহাঁড়ি খেজুর রস নামিয়েছিল জগদীশ। অনেকটা খেয়েছে সে। শরীর ঠাণ্ডা হয় নি। জ্বরের মত লাগে। খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে সে একটু চোখ বোজে।

—এই নয়নখুড়ো, ঘুমোচ্ছ যে! চোখ খোল—বলে সুকুল তার চোখে আঙুল ঢোকাতে চেষ্টা করে। চোখের পাতা ধরে টানে।

নয়নের চোখ খুলতে ইচ্ছে হয় না। বাইরে একটা সাদা চাদরের মত রোদ আজ। চেয়ে থাকলে চোখ জলে ভরে আসতে চায়।

'সুকুল' বলে বেড়ার আগলের ধার থেকে কে ডাকল। মেয়ে গলা। সুকুল টপ করে উঠে দুদ্দাড় দৌড়ে গেল।

বেড়ার ওপাশে তারা দাঁড়িয়ে। হাতে কলাপাতায় ঢাকা একটা কাঁসার বাটি। স্নানের পর এখন চুল এলো। পরনে একটা লাল টুক-টুকে শাড়ি। মোম মাজা শরীর। বোধ হয় কোথাও কোন ব্রণ বা গোটা নেই। দাঁতগুলো বড় ঝকঝকে। কপালে একটা তেলসিঁদুরের বড় টিপ। চোখে কাজল দিয়ে থাকতে পারে, চোখ দুটো বড় ডাগর দেখাচ্ছে দূর থেকেও।

তারা দাঁড়াল না। সুকুলের হাতে বাটিটা দিয়ে বলল—একসময়ে চুপ করে যেয়ে বাটিটা দিয়ে আসিস।

চলে যাওয়ার আগে একবার সজল বিদ্যুৎ হেনে গেল নয়নের দিকে। এক পলক মাত্র। তারপরই পিছন ফিরে বাঁশঝাড়ের আড়াল হয়ে গেল।

—কী সুকুল? নয়ন জিজ্ঞেস করে।

সুকুল বাটিটা নাকের কাছে তুলে গন্ধ নেয়।

—নতুন গুড় গো! দেখ, এখনও গরম। জ্বাল দিচ্ছিল সকাল থেকে। খাবে?

—না, তুমি খাও। মেয়েটা মোনা ঠাকুরের মেয়ে না?

সুকুল মাথা নাড়ে—তারা-মা।

—মা কেন?

—আমি মা ডাকি। তারা-মা ডাকতে শিখিয়েছে। সকলের সামনে ডাকি না তো, আড়ালে ডাকি।

—কেন মা ডাকতে শিখিয়েছে সুকুল?

—ইচ্ছে। দেখ, তারা-মা কাল পিঠে পায়েস দিয়ে যাবে। যা হয়

ওদের সব দিয়ে যায় চুপি চুপি।

—কেন?

—আমাকে ভালবাসে তো! পাঁচজনের সামনে দিলে নিন্দে হবে।

—নিন্দে হবে কেন?

—কী জানি! লোকে বলে বাবা নাকি তারা-মাকে বিয়ে করবে। ধ্যাৎ, বাজে কথা। বাবা বিয়ে করবেই না।

নয়ন একটু হাসে। অন্ধি-সন্ধি একটু-আধটু বুঝতে পারে সে। কোথাও একটা ঘোঁট পাকাচ্ছে। যেখানে মানুষ সেখানেই ঘোঁট।

ভুঁইচাষ বড় প্রিয় জগদীশের। এ সময়টায় রবিশস্যের চাষ। তা থেকেও কিছু আয় হয়।

চক্ষুলজ্জা বড় জিনিস। সে চাষা নয়, জমির মালিক। আধা-ভদ্রলোক। কাজেই, অতএব বর্গাদার রাখতে হয়েছে। ছাতা মাথায় পিছু পিছু ঘুরছে সে।

চাষীটা রোগা-ভোগা বটে। ফাল তেমন গভীরে ঢুকছে না। এই যে ওপরের মাটি এ হল গে একশো বছরের পুরোনো। ওপরে হাত-তিনেক পুরু জমি উল্টে-পাল্টে আবহমান চাষ চলে আসছে। এই পুরু আস্তর সরালে নীচে আছে সেই কুমারী। ওপরের এই বুড়ী-বিয়োনী জমি দিয়ে আর কতকাল চলবে! অনাবাদী ফেলে রেখে আর কেমিক্যাল সারে এ জমি পানসে হয়ে আসছে। ফসলের ঢল নেই। গভীর গর্ত খুঁড়ে সেই অনূঢ়া ভুঁইয়ের রূপ দেখতে ইচ্ছে করে তার। উঠে এসে গো কুমারী, দেখি তোমার কালচে সোনা রঙ, লাঙলের ফালে ফালে ঘুচে যাক লজ্জা, ঢল দাও ফসলের। তার ইচ্ছে করে পৃথিবীর ওপর থেকে ঐ পুরু বুড়ী-বিয়োনী আস্তরটা তুলে ফেলে। কিন্তু তা হয় না। তত জোর লাঙলের ফালে নাই।

চাষীটা মরকুটে শরীর ভর দিয়ে ঠিকমত গাঁথতে পারছে না। চাঙড় উপড়ে গভীর ক্ষতচিহ্ন হচ্ছে না।

—তামাক খাওগে। বুঝলে! জিরিয়ে ঠাণ্ডা হও, আমি দেখছি। বলে হাঁক দেয় সে। গায়ের পিরাণটা খুলে ফেলে, মাল দিয়ে কাপড়টা পরে নেয়, গামছা বাঁধে কপালে। জমিতে নেমে যায়।

জিনিসটা বড় ভাল লাগে তার। লাঙলটা যখন সে মাটিতে গাঁথে

তখনই সে মাটির গভীর নরম মায়া টের পায়। ঠিক যেন মেয়েমানুষের শরীর। পায়ের আঙুলে উঠে দুখানা লোহা-হাতে সে চেপে ধরে হাতল। রি রি করে কেঁপে ওঠে মাটি। আনন্দে, যন্ত্রণায়। উপড়ে আসে গভীর শীতল কালচে-সোনা মাটি। ভারী এক রকমের তৃপ্তি পায় সে। 'অ-ড়-ড়-ড়' করে বলদ দুটোকে তাড়া করে। তার হু-হুংকারে বলদ দুটো নিষ্পেষিত ঘাড়ে ছোটে।

—মেল ছেড়েছে গো! রোগা-ভোগা চাষীটা গাছতলা থেকে হেঁকে বলে। হাসে খুব। জগদীশের গায়ের জোর এ অঞ্চলে বিখ্যাত।

ঘাম ফুটে উঠতে থাকে। শরীরে ছলাৎ ছল রক্তের শব্দ। দাঁতে দাঁত। উঠে এসো গো কুমারী মা, উঠে এসো। মাটি ওল্টায় তবু জগদীশের মন ভরে না। গভীর, আরও গভীর মাটি চাই, যে মাটিতে মানুষের হাল পড়ে নি কখনও। গুপ্তধনের মত সেই মাটি কোথায় কোন্ পাতালে এখন? ভারী লাঙলটা একবার তোল্লা দিয়ে ঝাঁকিয়ে বসায় সে। র-য়ে-র-য়ে ফেটে যাচ্ছে ভুঁই, চৌচির হয়ে যাচ্ছে, নানা ঢঙের ঢেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। পায়ে মাটির স্বাদ, দু হাতে মাটির কাঁপন উঠে আসে লাঙল বেয়ে। সুখ। তার সুখ এরকমই। চাষাড়ে।

দূরে মাথা তোলা দিয়ে আছে মোনা ঠাকুরের মন্দিরের চুড়োর কলস। তার ওপর একটা লাল নিশেন ছিল, এখন নেই। নিশেনের বদলে গজিয়েছে দুরন্ত অশ্বত্থ। বহু দূর থেকেই দেখা যায়। উত্তর দিকে চষবার সময়ে মন্দিরটা চোখে পড়ে। উল্টোবাগে ঘুরলে দেখা যায় পৃথিবীর সীমা। সেখানে ছায়ার মত গাছপালা, শিমুলের বীজ কেটে তুলো যেমন ওড়ে তেমনই উড়ে যাচ্ছে হাল্কা আঁশমেঘ। ঘুরলে আবার মোনা ঠাকুরের মন্দির। বাঁশবন আর আমবাগানের মাথার ওপর উঁচিয়ে আছে। মোনা ঠাকুর নিজেও ওরকমই ওঁচানো। সবার ওপর মাথা তুলতে চায়।

মাথাটা নামিয়ে নিয়ে মাটির গভীর খালগুলো দেখে জগদীশ। বিড় বিড় করে কথা বলে···সুকুল আমার ছেলে নয়, সে কি আমি জানি না? হায় গো, এসব তো বাচ্চা ছেলেও বুঝতে পারে। বৌটার ওপর রাগ করতাম। সে পা চেপে ধরত। সুকুলের বাপের নাম সে কখনও বলে নি। কী করব। পেলে তার বুকে এমনি লাঙল চেপে দু ভাগ করে দিতাম না!

গভীর গভীরতর ডুবে যেতে থাকে লাঙল। অবিশ্বাস্য চাষ দেখে আধবুড়ো চাষী। চেঁচিয়ে বলে···মাটিকে যে জল করে ফেলা হল! আরে বাঃ! বসুন্ধরা গলে যায় যে! বাঃ বাঃ!

চাষের বাহার সে বোঝে। মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে।

মাটির গভীর খাঁজে খাঁজে অন্ধকার। জগদীশ চেয়ে থাকে। নোনা ঘাম নেমে আসে ভ্রু বেয়ে, চোখের কোণ বেয়ে। থুতনী বেয়ে। বিড় বিড় করে বলে সে···বাপ কে? অ্যাঁ! কে বাপ তবে আমার সুকুলের? এ বড় আশ্চর্য কাণ্ড! সুকুল আমার, বাপ ভিন্ন! অ্যাঁ! আশ্চর্য কাণ্ড! সুকুলের জাত কী বল তো ঠাকুর! পারবে না। কে জানে! কত খুঁজেছি আড়ালে-আবডালে! যে-ই হোক। ছেলে আমার। খবর্দার কোন শালা যদি ফের কথা তোলে। সুকুল বড় হচ্ছে, বুঝতে শিখছে। বড ভয়। যদি জানতে পারে? কী লজ্জা! খবর্দার তোমরা সব, খবর্দার, কথা ওর কানে তোলে যদি কেউ চোয়াল খসিয়ে দেব, জিভ উপড়ে দেব সকলের। সার্কাসে আমি পাঁচ মণ লোহা তুলতাম, মনে থাকে যেন।

লেবুকাঁটা দিয়ে চমৎকার একখানা টিপ পরে তারা। সস্তা কুমকুম বড্ড জেবড়ে যায়। লেবুকাঁটা দিয়ে পরলে বড় টিপটার চারধারে ফুটকি-গুলো ভারী বাহার দেয়। ঢাকনা-খোলা আয়নাটা একটু দূরে ধরল তারা। আয়নার ছায়ায় ঢেউ খেলছে। খেলুক। তবু বোঝা যায়, এ মেয়ের এখন যৌবনকাল। পোকামাকড় ভীড় করবার সময়। মুখ টিপে সে হাসে। পরমুহূর্তেই এক দুঃখ খেলা করে যায় বুকে। পাউডার নেই, ঠোঁটের রঙ না, কিছু না। প্রদীপের শিষে কাজললতা উল্টে কালি ফেলে একটু কাজল চোখে দেওয়া, তাও চুরি করে দিতে হয়। বাবা দেখলে ঠাণ্ডা গলায় বলে···কালি কি সাজ! চোখে লোভ আসে। উত্তেজক।

ঢাকনায় লেখা···সুখে থাক! মরি মরি! কি বা লেখার ছিরি! সুখে থাক বললেই সুখে থাকে লোক? তারার সুখ নেই। রঙীন শাড়ি, ভাল আয়না, সাজগোজ, সিনেমা থিয়েটার, রেডিওর গান পুরুষ সঙ্গী···কত কী চায় মেয়েরা।

পশ্চিমের জানালায় রোদ সরে এল। নিমগাছের ছায়াটা উঁকি দিচ্ছে

মেঝেয়। ঐ ছায়াটা হুস্ করে অন্ধকার হয়ে যায়। শীতের বেলা বড্ড তাড়াতাড়ি যায়।

সুকুলের বাবা আজ চাষে গেছে। এই তার ফেরার সময়। নাবাল মাঠটা দিয়ে হন্‌হন্ করে হেঁটে আসে বিশাল মূর্তি, মাঠের মাঝখানটিতে একবার থমকে দাঁড়ায়। দূর থেকে কালীমায়ের মন্দিরের দিকে একবার হাতজোড় করে মাথায় ঠেকিয়ে চলে যায়। মন্দিরে আসে না। তারার বাবা সুকুলের কোষ্ঠীতে বাপের নামের জায়গাটা খালি রেখেছিল। সেই থেকে রাগ।

কামিনী গাছটার ঝুপসী ছায়ায় নিজেকে আড়াল করে জগদীশকে প্রায়ই দেখে নেয় তারা। জগদীশ তা জানে। এক-আধদিন দেখাও হয়ে যায় এধারে ওধারে। জগদীশ গা করে না। তারা কি সুন্দর নয়? নাই হল, সুন্দরী ছাড়া কারও দিকে তাকাতে নেই? তারার কিছুই কি দেখার নেই জগদীশের? পাথর! পাথর! ছেলের জন্য এত ভালবাসা কোথা থেকে আসে? ঐ বুকটা থেকেই তো! একই বুক একজনের জন্য গলে ঘি, অন্যজনের বেলায় পাথর! ভারী আশ্চর্য!

শোন সবাই, তারা ঠিক করে রেখেছে একদিন গলায় দড়ি দেবে। সেদিন খুব খাবে তারা। মাছের মুড়ো, পাঁঠার ঠ্যাং, পিঠে পায়েস, চালতার অম্বল। সাজবে খুব। যে বাসন্তী রঙের চকরা-বকরা শাড়িটা দিদি লুকিয়ে দিয়ে গেছে, সেইটে পরবে সেদিন। খোঁপায় ফুল গুঁজবে। চন্দনের ফোঁটা পরবে মুখে। বিয়ের কনেটি সেজে অনেকক্ষণ আয়নায় দেখবে মুখ। সেদিন খুব জ্যোৎস্না ফুটবে। ঋতুটি হবে বসন্ত। দক্ষিণের পেয়ারা গাছটার ডালে ঝুলন ঝোলাবে সে। একা একা রাধা। কৃষ্ণ-বিরহিনী। সেদিন বিরহই তার মিতা। মরার সময়ে লোকে চিঠি লিখে রেখে যায়, বলে যায়, সে নিজেই মরছে। তারা লিখবে না কিছু। হঠাৎ মরে যাবে। এবার তোমরা খুঁজে বের কর—কেন তারা মরেছে! জগদীশ, সুকুলের বাপ কে—এটা খুঁজে খুঁজে হয়রান! তোমাকে আর একটি হয়রানী দিয়ে যাব জন্মের শোধ! তারা কেন মরল! খুঁজে খুঁজে বের কর সারা জীবন ধরে। বেশ হবে! জন্মের শোধ।

কামানোর পর সাপদুটো ঝিমিয়ে গেছে। কাল ওদের দুটো ব্যাঙ দিয়েছিল জগদীশ। গিলেছে! দুটোরই পেট ফুলে আছে! ঢিপির

মত একটা জায়গায়। নিম-খোরাকি! একবার খেলে বহুদিন আর কিছু খায় না। ঝিম মেরে পড়ে থাকে! নয়ন কাচের ভিতর দিয়ে উগ্র চোখে চেয়ে থাকে। লক্ষ্য রাখে! কিন্তু না, ওদের পরস্পরের শরীরের প্রতি বড় নিস্পৃহতা। এ বড় অদ্ভুত। এরকম একটা বাক্সে নয়ন আর শ্যামা থাকলে?

নয়ন একটু হাসে।

এ জীবনে নয়ন আর কোনদিন ঘুমোবে কি? আশ্চর্য, ঘুমের জন্য তার কোন চিন্তা ছিল না কোনদিন। হঠাৎ আজকাল মাঝে মাঝে ঘুমের কথা তার মনে হয় কেন? এক দেড় প্যাকেট সিগারেট, দু এক ঢোঁক বাংলা, আর চিন্তা—এই নিয়েই তো দিব্যি রাত কেটে যেত! আজ কেন ঘুমের চিন্তা? কে তাকে ঘুম পাড়াবে? শ্যামা? শ্যামা! চোখ জ্বলে যায় তার।

দুটো ঝাঁপি দড়িতে ঝোলানো। ওপরেরটায় হাত দিয়ে স্পর্শ করে নয়ন। ভিতর থেকে একটা শ্বাসের শব্দ আসে। এই ঝাঁপি দুটোয় দুটো গোখরো আছে। ঠাণ্ডা মেজাজ। চট করে কামড়ায় না। কামানো, নিরাপদ। ঢাকনা খুললে যখন তারা মাথা তুলবে তখন পারবে কি নয়ন সাহস রাখতে? তেমন শক্ত নয়। জগদীশকে দেখেছে মুখের সামনে হাত নেড়ে সরিয়ে নেয়। মাথাটা তখন একটু নীচে ঝুঁকে পড়ে। জগদীশের বাঁ হাত তখন টপ্ করে পিছন দিক থেকে ধরে মাথাটা। অনেক সময়ে লেজ ধরে ঝাঁকুনী দিয়ে তুলে ফেলে। নীচু মাথা আর তুলতে পারে না। শক্ত নয়। পারবে নয়ন।

ভেবে দেখলে শ্যামাকে তাঁর কিছুই দেখানোর নেই। কত কিছু দেখাতে সাধ যায়! কি ভালবাস শ্যামা? মানুষ খুন? সুন্দর পোশাক? বিনীত ব্যবহার? নাকি গান শুনতে চাও? উপহার ভালবাস? অপহৃত হতে চাও? কি শ্যামা? তোমার জন্য আমি ফুট-বল খেলোয়াড়ও হতে পারি। কিংবা গায়ক। অভিনেতা। যা চাও তাই হব।

ঝাঁপিটার গায়ে আর একবার আলতো হাতে চাপড় দেয় সে। ভিতরে এবার দুটো দ্রুত তীক্ষ্ন শ্বাসের শব্দ হয়। বিরক্ত হচ্ছে, রেগে যাচ্ছে। শোন শ্যামা, কিরকম শব্দ! ঝাঁপি খুললেই কপিশ বিদ্যুৎ চমকে উঠে দাঁড়াবে। বিদ্রোহী। মুক্তিকামী। কী ভয়ংকর! সম্মোহনের হাত

বাড়িয়ে আমি ধরে নেব তাকে। কত খেলা দেখাব। দেখ।

সুকুল জামতলায় খেলছে। অনেক সঙ্গী জুটেছে তার। জগদীশ একঘরে, কিন্তু সুকুল নয়। গাদীর কোট পড়েছে মাঠে। সুকুল পাকা ঘুঁটি। চেঁচিয়ে বলছে…আমার কোটে আসিস না, আমি পাকা। দান কেটে যাবে।

খেলা খুব জমে গেছে। সুকুল এখন আসবে না!

ওপরের ঝাঁপিটা সাবধানে দড়ির দোলনা থেকে তুলে আনে নয়ন। বেশ ভারী। সাপ যে এত ভারী হয় তা জানত না। বয়ে নিতে কষ্ট হবে। হোক।

বিছানার পাতলা চারদটা দিয়ে ঝাঁপিটাকে বাঁধে সে। একটা ঝোলার মত করে নেয়। ঝাঁপির ভিতর অবিরাম পাক খোলা আর শ্বাসের শব্দ হয়। নয়ন দাঁত টিপে হাসে। না সাপ, না শ্যামা, কাউকে বিশ্বাস নেই। কিন্তু কী করে তাদের ধরতে হয় তা শিখে যাবে নয়ন।

ঝোলা হাতে নয়ন নিঃসাড়ে মেহেদীর বেড়া ডিঙিয়ে জঙ্গুলে জায়গায় ঢুকে পড়ল। রাস্তা দিয়ে যাবে না। গাছের আড়াল-আবডালে গেলেও সে ঠিকই পেঁছিবে। জায়গাটা চেনা হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ শরীর আছড়ে সাপটা এখন নিশ্চুপ। বোঝাটা হাত বদল করে নয়ন বাঁশঝাড় পেরিয়ে বুকসমান কসাড় জঙ্গল ভেদ করে মোনা ঠাকুরের মন্দিরে পিছনটায় উঠে আসে। মোনা ঠাকুরের বাগান। এটা ঘুরে সে আমবাগানে গিয়ে পড়বে। বাগানের বেড়া ঘেঁষে সে হাঁটে।

মন্দিরটার ডগায় অশ্বত্থচারাটি চোখ তুলে দেখে নয়ন! একটু হোঁচট খায়! গরুর দড়ি বাঁধার খুঁটি কে যেন উপড়ে নেয়নি! বোঝাটা আবার হাতবদল করে নেয় সে!

নাবাল মাঠটায় আলো ফিকে। পশ্চিমে একটা কুয়াশার আস্তরণ পড়েছে। সূর্যটা ঘোলাটে। জগদীশ এখুনি ফিরবে। সে ফিরবে মাঠ দিয়ে, ততক্ষণে আমবাগানে ঢুকে যাবে নয়ন। দেখা হবে না। নয়ন একটা শিস্ দিল। অবিকল দোয়েলের মত। বড় মিষ্টি ডাক পাখীটার। পরমুহূর্তে শ্বাস আটকে আটকে, পেটে খাঁজ ফেলে, কুঁজো হয়ে সে একবার দুবার কোকিল ডাকল। তার বড় প্রিয় ডাক।

মোনা ঠাকুরের বাগানের শেষে একটা ঝুপসী কামিনী গাছ ঝুঁকে

তার ছায়া ফেলেছে নীচের নাবাল মাঠটিতে। ছায়াটা অনেক লম্বা হয়ে গেছে।

ঐ মাঠ পেরিয়ে সেই আশ্চর্য চাষাটি আসবে। কামিনী ঝোপটার আড়াল থেকে রোজই তাকে দেখে তারা। তারা যে দেখে তা কি ও জানে না? জানে। জেনেও পাথর। পুরুষ নও নাকি? শরীরে তো মাংসের বাহার, মন কোথা? বাসনা কোথা? পুরুষ হবে পুরুষের মত, গনগনে আঁচ থাকবে তার, থাকবে কামনা বাসনা। তা নয়, এ হচ্ছে গিয়ে মুক্তপুরুষ। ছেলে থাকলে আর জমি থাকলেই কি হল? মেয়েমানুষ চাই না? বাপু, তুমি হচ্ছ হিজড়ে।

একটু আগেই আজ এসে পড়েছে তারা। বেলা আছে। পশ্চিমে একটু ঘোলাটে ভাব বলে বেলা আন্দাজ পায়নি। কামিনী ঝোপটার আড়ালে দাঁড়িয়ে সে প্রজাপতিদের ওড়াউড়ি দেখে। ডাঁস, মশা আর আলোর পোকা উড়ে যাচ্ছে। ঝাঁক বেঁধে পিন্ পিন্ করে মশা মাথার ওপরে। কুয়ো থেকে কে জল তুলছে। ভরা বালতি থেকে ছলাৎ করে জল উপচে জলে পড়ল। পিছনে গাছের আড়াল আছে। তবু একটু সেঁটে দাঁড়ায় সে। বুকটা একটু কাঁপে। কিশোরীর হৃদয় কাঁপবেই। মুখে একটু শোষভাব। কণ্ঠমণি ওঠানামা করছে। এই উত্তেজনাটুকু তার ভালই লাগে। নাবালের মাঠ দিয়ে মাটিমাখা প্রকাণ্ড মানুষটা রোজ যায়। হাত দশেক তফাত থাকে তারার শরীর থেকে। সেই দশহাত শূন্যতা জুড়ে কত ইচ্ছার ঢেউ তারা বইয়ে দেয় রোজ। সে কখনও ফিরেও দেখে না।

দোয়েলের একটা শিস্। তারা চমকায়! এত জোর ডাকল, কাছেই! পরমুহূর্তে তার কানের পর্দা ফাটিয়ে একটা কোকিল কাঁদে। ডাক নয়, যেন কান্না। বড্ড বুকভাঙা ডাক। মিতা বুঝি উড়ে গেছে কোথা!

ঝোপের ভিতর থেকে আস্তে মুখ বাড়ায় তারা।

লাফ দিয়ে একটা খন্দ পেরিয়ে হলুদ জামা পরা ছোকরাটা সামনে এল! লুকোবার সময় পেল না তারা! মুখটা টেনে নিল আড়ালে, কিন্তু ও দেখেছে ঠিক। দাঁড়িয়ে গেল।

বোঝাটা হাতবদল করে ঝোপের ওপাশে একটু দাঁড়াল! তারার বুক ঢিপ ঢিপ করে!

একটা শ্বাস ফেলল ছেলেটা। তারপর চলে যাবে বলে পা বাড়িয়েও আবার ফিরে এল! বলল—দেখে ফেলেছি!

তারা চুপ!

—কী হচ্ছে এখানে?

—কিছু না! বাগানে দাঁড়িয়ে আছি! তারা অস্ফুট স্বরে বলে?

ছোকরাটা হাসে! বিচ্ছিরি হাসি ওর! বোঝাটা মাটিতে রেখে হাল্কা পায়ে বেড়ার কাছে আসে! তারা শ্বাস বন্ধ করে থাকে।

—বাগানে দাঁড়িয়ে থাকা, না আর কিছু?

—আর কী!

আচমকা ছেলেটা লাফ দিয়ে বেড়াটা পার হয়ে আসে! চেঁচাতে গিয়েও চেঁচাল না তারা। কী সাহস ওর।

ছেলেটার পায়ের শব্দ হয় না! বাতাসের ওপর চলে-ফেরে যেন! ঝোপটা ঘুরে মুখোমুখি চলে এল! মুখখানা দেখে আপনা থেকেই একটা ভয়ের চীৎকার গলায় উঠে আসছিল! সেটা সামলাল তারা। পেটের ভিতরটা গুর-গুর করে উঠল!

ছোকরাটার পিঙলে চুল বাতাসে উড়ো-খুড়ো হয়ে আছে। চোখের নীচে বসা কালি, কাটা ফাটা ঠোঁট, ভাঙা চোয়ালে রগ ফুটে আছে। চোখ দুটো লালচে, জ্বলজ্বলে। ওপরের পাতাটা আধবোজা। হঠাৎ বুক চমকে ওঠে দেখলে।

—তারা এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলে—কী চান আপনি?

—সুকুল তোমাকে মা ডাকে কেন?

তারা ঢোক গিলল। কারও জানার কথা নয়। কেবল সুকুল জানে আর সে নিজে। আড়ালে সুকুলকে 'তারা-মা' ডাকতে শিখিয়েছে সে। বোকা ছেলেটা, পেটে কথা রাখতে পারে নি।

তারা বলল—কৈ না তো!

ছোকরাটা ঠোঁটে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব করে বলে—তোমরা মেয়েরা মিথ্যেবাদী। তুমি সুকুলকে মা ডাকতে শিখিয়েছ কেন?

—শেখাই নি, ও নিজেই ডাকে। তারা ভীষণ ভয় পেয়ে বলে।

—মিথ্যেবাদী। চাপা স্বরে বলে ছোকরাটা।

—না।

বাবা শুনলে হেঁটোকাঁটা ওপরকাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেলবে। তারা

তাই কেবল বাতাস গিলল। ছেলেটার পিঙলে চুল ফণা ধরে আছে। মুখে না খেতে পাওয়া ভাব। শরীরটার তামাটে রঙ থেকে রাগের তাপ আসছে।

—সেজে-গুজে কার জন্য দাঁড়িয়ে আছ? জগদীশ?

তারা মাথা নাড়ে। কানের পুঁতির ঝুমকো দুটো গালে এসে ঝাপটা মারে। সে মাথা নেড়ে জানায়—না।

ছোকরাটা একটু হাসে। তারপর ঠাণ্ডা গলাও বলে—আমি জানি।

—কী জানেন?

—সব। যদি মোনা ঠাকুরকে বলে দিই তবে জগদীশ উচ্ছেদ হয়ে যাবে।

—যা জানেন তা ঠিক নয়।

—তোমরা মিথ্যেবাদী। মোনা ঠাকুর যখন বাণ মারে তখ। কী হয় জান তো? মুখে রক্ত তুলে, দাপিয়ে মরে যায় তরতাজা মানুষ। জান?

তারা মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে থাকে।

—জগদীশেরও তাই হবে। ছোকরাটা হাল্কা স্বরে বলে।

—না।

—কী না? বলে এগিয়ে আসে ছোকরাটা।

বড়দি পালিয়ে গিয়েছিল একটা চামচিকের সঙ্গে। মোন ঠাকুর হৈ-চৈ করে নি, পুলিশে খবর দেয় নি, খোঁজে নি। বিয়ের দু মাসের মাথায় মুখে রক্ত উঠে সেই চামচিকেটা মরেছিল। সবাই বলে, মোনা ঠাকুর বাণ মেরেছে। সেটা মিথ্যেও নয়। বাবা ঠিক বাবা নয় তারার কাছে। অন্য সকলের কাছে যেমন 'মোনা ঠাকুর' তার কাছেও তেমনি। রহস্যময় এক শক্তির অধিকারী ভয়ংকর পুরোহিত। চতুর্দিকে বিস্তৃত তার সম্মোহন আকাশে বাতাসে জাল ছড়িয়ে রেখেছে। অদৃশ্য চক্ষু লক্ষ্য রাখছে সব দিকে। তারা নিথর হয়ে চেয়ে থাকে। বুকটা জ্বলে যায়। কোনদিকে পথ খোলা নেই।

ছোকরাটার শ্বাস মুখে পড়তেই চকিতে চটকা ভেঙে মুখ তোলে তারা। কত কাছে এসে গেছে দেখ! মাগো! তারা পিছোতে যাবে ছেলেটা হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরল।

—পালাচ্ছ?

—এটা কী? ছাড়ুন। তারা ছটফট করে।

—আমি মোনা ঠাকুরকে বলে দেব।

—না।

ছোকরাটা হাসে। তারার হাতখানা নাকের কাছে তুলে গন্ধ শুঁকে বলে—তোমার গা পরিষ্কার, কোন গোটা নেই, মোলায়েম!

ঝট্‌কা দেয় তারা। কিন্তু হাত খসে না। সাঁড়াশীর মত ধরে রেখেছে।

ছোকরাটা আপন মনে বলে—প্রচুর ক্লোরোফিল তোমার শরীরে। তাজা ভিটামিন আর ক্যালসিয়াম। দুরন্ত লিভার আর হার্ট। তোমার কোন অসুখ নেই।

—ছাড়ুন। আমি চেঁচাব।

—না, চেঁচাবে না। খুন করে ফেলব। বলতেই তার চোখ ঝলসে ওঠে। স্তিমিত গলায় আবার বলে—তোমাকেও। জগদীশকেও! মোনা ঠাকুরের বাণে অনেক সময় কাজ হয় না। কিন্তু আমার বাণে হয়। আমি মানুষ মেরেছি তারা।

তারার চোখে পলক পড়ে না। দুরন্ত মুহূর্তগুলি কেটে যাচ্ছে। শরীরে একটা রক্তের হল্‌কা বয়ে যাচ্ছে।

ছোকরাটা হাতখানার গন্ধ আর একবার শুঁকল। তারপর বলল—তোমাকে আজ আমার একটা গোপন কথা বলে দিলাম। মানুষ মারার কথা। আজ অবধি আর কাউকে বলি নি।

পশ্চিম দিগন্তে একটা মলিন সূর্য ঝুলে আছে। ডুবে যাচ্ছে না। বাতাস বন্ধ। পৃথিবীতে সময় থেমে গেছে হঠাৎ। ছোকরাটা মুখ নামিয়ে আনে কাছে, চাপা গলায় বলে—যাকে একবার গোপন কথা বলে দেওয়া যায় তাকে আর বিশ্বাস করা চলে না। তোমাকে বিশ্বাস করি না আর। বুঝেছ?

আবার সোজা হয়ে দাঁড়ায় ছোকরাটা। কাঁধে ঝাঁকি দেয়। কাঁপনটা নিজের শরীরেও টের পেল তারা।

—আমি আবার আসব। হঠাৎ আসব। তোমাকে পাহারা দিতে। আমার গোপন কথা কাউকে বলেছ কিনা দেখতে আসব। বার বার। তোমাকে শান্তিতে থাকতে দেব না। আমি একবার যার পিছু নিই তার শান্তি থাকে না। বলে সে হাসে।

তারা অনেক কষ্টে অস্ফুট গলায় বলে—কী সব বলছেন !

সে কথায় কান না দিয়ে ছেলেটা পৃথিবীর রাজার মত গলায় বলে—আবার যখন আসব তখন তোমার কাছে একটা জিনিস চাই ।

—কী ? ভয়ার্ত তারা জিজ্ঞেস করে ।

—ক্লোরোফিল, কিংবা ক্যালসিয়াম, ভিটামিন কিছু একটা । ঠিক জানি না । অনেকদিন আগে আমি ডাক্তারী পড়তাম, সেকেণ্ড ইয়ারে ছেড়ে দিই । সব ভুলে গেছি । কিছু একটা চাই যা আমাকে ঘুম পাড়াবে । বুঝেছ ?

তারা কিছু বোঝে নি । তবু ছাড়া পাওয়ার জন্য মাথা নাড়ল ।

—আজ আর সময় নেই । বলে হঠাৎ নিস্পৃহভাবে তারার হাতটা ছেড়ে দিল নয়ন । বলল জগদীশ আমাকে চড় মেরেছিল একদিন, বুঝলে । আমাকে চড় মেরেছিল । যে আমাকে মারে তার ছাড় নেই ! আমি ফিরব ! বুঝলে ! ফিরব ।

ছোকরাটা ঘুরে চটপটে পায়ে আবার বেড়াটা ডিঙিয়ে গেল । ঝোলাটা তুলে নিল হাতে । একবারও ফিরে না তাকিয়ে জঙ্গল ভেঙে মিলিয়ে গেল ।

তারা নিঝুম হয়ে রইল কিছুক্ষণ । তার নরম হাতখানায় পাঁচ আঙুল বসে যাওয়ার লালচে দাগ । ব্যথা করছে । চোখ ভরে টলটলে জল এল তার । তারপর হঠাৎ সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ।

দরগার পিছনের ঢিবিটা পেরোলে একটা বাঁশঝাড় । সেটা ডাইনে রেখে দু-কদম হাঁটলেই নাবাল মাঠটা দেখা যায় । বাঁয়ে উঁচুতে মোনা ঠাকুরের মন্দির । মাঠের শেষে রাস্তাটা ঘুরে গেছে ।

দূর থেকেই দেখা যায়, রাস্তার বাঁকটাতে স্কুল দাঁড়িয়ে । এত বড় মাঠটা সামনে বলে স্কুলটাকে যে কী ছোট্ট আর একা দেখায় । শেষবেলার আলোয় এখন কুয়াশার ভাব । মাটি থেকে ধুলোটে অস্বচ্ছতা উঠে আসে । বড় আবছা চারদিক । বড় মায়াময় । এ সময়টায় আলো ক্ষয়ে গিয়ে পৃথিবীর ওপর একটা স্বপ্নের সর পড়ে । সত্যি নয় কিছু । আলো ক্ষয় হয় এ সময়ে । দূর থেকে স্কুলকে মনে হয় মাঠের ওপর একটা দাগ মাত্র । বুকটা ফাঁকা লাগে জগদীশের ।

মাঠের মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে রোজ জগদীশ মন্দিরের দিকে হাত-

জোড় করে একটা প্রণাম ছুঁড়ে দিয়ে যায়। আজ দূর থেকে সুকুলকে দেখে বুকটা কেমন করল। মাঠখানা বুকে নিয়ে ছোট্ট সুকুল দাঁড়িয়ে। একা। বাবার জন্য চেয়ে আছে। মিথ্যে। বাবা কোথায় সুকুলের? তবে কি সবই এরকম? সাঁঝবেলায় সন্ধের ঝুঁঝকো আঁধার যেমন স্বপ্নের সর তেমনি? বুকটা কেমন করল। জগদীশ আজ মাঠের মাঝখানে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল···কাছে যাই না মা, দোষ নিও না। তোমার মন্দিরের চারধারে লোকনিন্দের কাঁটাবেড়া। আমার যা হোক তা হোক, সুকুলকে দেখো। দেখ না, অভাগা ছেলেটা পৃথিবীতে কী রকম একা। মাঠ বুকে করে পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তো ওর কেউ না। জানে না তাই। এই মোহ চিরকাল রেখো মা জগৎসংসারে মোহ ছাড়া মোয়া বাঁধে না।

কামিনী ঝোপটার আড়াল থেকে সাজপরা একখানা মুখ রোজই চেয়ে থাকে। লক্ষ্য করেছে জগদীশ! আজও করল। দেখি না-দেখি না করে রোজ পেরিয়ে যায় জায়গাটা যেমন পোড়ো জায়গা রামনাম করতে করতে পেরোয় ভীতু মানুষেরা। জগদীশও পেরোয়। বন্ধনকে তার বড় ভয়। বাঁধা বাউণ্ডুলে ছিল সে। গাউস সাহেবের দলের সঙ্গে উজেন ভাটেন বয়ে যেত দেশ-দেশান্তরে। সেই জগদীশ এখন শিকড় ছেড়েছে মাটিতে। ভুঁই, ঘর, ছেলে। তবু কিছুই তার নয়, সে জানে। সুকুল একটু বড় হোক, হাত-পা ঝেড়ে আবার সে বেরিয়ে পড়বে। সংসারে তার এই স্থিতি বড় অদ্ভুত। ভাবলে রাতের ঘুম চটে যায়। চোখে জল আসে। জগদীশ এই স্থিতি চায় না। সংসারে থিতোবার লোক আছে, সে সেই লোক নয়।

পেরিয়েই যেত জগদীশ। কিন্তু বাগড়া দিল কান্নার শব্দটা। তারা কাঁদছে। জগদীশ একটা শ্বাস ফেলে। সুকুলকে গোপনে 'তারা-মা' ডাকতে শিখিয়েছে মেয়েটা। বোঝে জগদীশ সবই।

কী ভেবে দাঁড়িয়ে গেল জগদীশ। কান্না ব্যাপারটা ভাল না। বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

ঝোপের পাশে অবিরল ফোঁপানি। হেঁচকীর মত শব্দ হচ্ছে।

জগদীশ আস্তে করে বলল, ঠাকুর এসব দেখলে বড় রাগ করে। এ ভাল নয়।

ওপাশটা চুপ। ভীতু খসখসে একটা শব্দ হয়। শ্বাস চাপবার

চেষ্টা হচ্ছে। তারপর হঠাৎ ছোট্ট একটা প্রশ্ন উড়ে আসে…কেন?

জগদীশ বলে…মন চাইলেই কি সব হয়?

—কেন হয় না? আবার প্রশ্ন উড়ে আসে।

জগদীশ বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে বলে—হয় না। মোনা ঠাকুরকে জিজ্ঞেস কর, তিনিই বলবেন...হয় না।

ওপাশটা একটু চুপ করে থাকে, কী যেন ভাবে। তারপর হঠাৎ ভারী ছেলেমানুষের মত প্রশ্ন করে…আপনি ব্রাহ্মণ না?

জগদীশ হাসে…বামুন ঠিকই। হালদার বংশ। উপনয়নও হয়েছিল। শরীর খেলাতে গিয়ে সেই যে পৈতে ছেড়েছি, আর নেওয়া হয় নি।

—তবে বাধা কী?

জগদীশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে…বাধা অনেক। নীচু জাতে বিয়ে করেছিলাম বলে ব্রাত্যদোষ। তাছাড়া…

—তাছাড়া কী?

—সুকুলের বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে। সতর্ক এবং বেদনার্ত গলায় বলে জগদীশ। স্বরটা খুব নীচে নেমে আছে। তারপর মুখ তুলে বলে… ঐ সন্দেহ নিয়ে যে-ই আমার ঘর করতে আসুক, আমি তাকে সইতে পারব না।

—আমি কিছু ভাবি না।

জগদীশ তবু মাথা নাড়ে…গাঁয়ে পাঁচটা কথা উঠবে। লোকে ঘোঁট পাকাবে। গোলমাল হবে। মোনা ঠাকুর খুশী হবে না…

—আপনি বাবাকে ভয় পান?

জগদীশ শ্বাস ছাড়ে, বলে…কে না পায়?

—তবে কী উপায় হবে?

—উপায় দেখছি না। বেঁচে থাকতে গেলে কিছু ছেড়ে কেটেই থাকতে হয়। অবস্থাটা মেনে নেওয়াই ভাল।

—যদি কলকাতায় পালিয়ে যাওয়া যায়?

—উরেব্বাস!

—কেন, সর্বনাশ হয়ে যাবে নাকি?

—হবে। মাটির গন্ধ না পেলে আমি থাকতে পারব না। মাটির বড় মায়া।

—আপনার আবার মায়া-দয়া !

একটা দীর্ঘশ্বাস উড়ে আসে।

সুকুল এতক্ষণে বাপকে নিরিখ করেছে। কোনাকুনি ছুটে আসছে এঞ্জিনের মত। জগদীশ বলল…যাই।

—আচ্ছা।

—এ রকম ভাবে থেকো না। লোকে দেখলে কী বলবে?

—আমি থাকব। রোজ। আমার ইচ্ছে।

জগদীশ মাঠের শূন্যতায় এগিয়ে গেল। দু-হাত বাড়ানো। শূন্যতাকে ভরে দিয়ে সুকুল আসছে। আসছে।

ভারী সাপটাকে বয়ে আনতে কষ্ট গেছে খুব। পাকা সাপ, থলথলে চর্বি বোধ হয় গায়ে। নয়ন ঝাঁপি খুলে দেখে নি। কিন্তু মঝে মাঝে ঝাঁকুনি দিয়েছে। অমনি ভিতর থেকে প্রবল শ্বাসের শব্দ পেয়েছে। দাঁতে দাঁত টিপে এক ধরনের হাসি হেসেছে সে। ভীতু একটা জ্বালাময় আনন্দ।

সন্ধের বাসটা পেল নয়ন। পায়ের কাছে সারাক্ষণ ঝাঁপিটা সতর্ক পাহারা দিল, যেন পাহারা না দিলে মূল্যবান ঝাঁপিটা কেউ চুরি করে নেবে। মাঝে মাঝে ঝুড়িটায় লাথি মারল। শ্বাসের শব্দ পেল। পাশে বসা একটা মানুষ একবার জিজ্ঞেস করল—কী আছে ওটাতে?

নির্বিকার গলায় নয়ন জবাব দিল—একটা গোখরো সাপ।

—সাপ! লোকটা চমকে উঠে পড়ে, বলে—কী সাংঘাতিক!

মানুষজন তার দিকে কৌতূহলে তাকায়। ঝুড়িটা অনেকে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করে।

দূর-পাল্লার বাস বলে সিগারেট ধরালে কেউ কিছু বলে না। নয়ন কাউকে গ্রাহ্য না করে বাইরের দিকে চেয়ে সিগারেট ধরায়। তারপর একমনে সিগারেট টেনে যায়। বাইরে ভিতরে একটা তীব্র ছটফটানি তার। হাত-পা একভাবে রাখতে পারে না। এ পাশ ও পাশ হয়। বিড় বিড় করে নিজেকে বলে…সব প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে গেলে ঘুম আসবে। ঠিক ঘুম আসবে।

বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গেল। সদর বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু সেটা কোন বাধা নয়। সদর দিয়ে সে কদাচিৎ বাড়িতে ঢোকে। আজও

ঢুকল না। গলির দরজা টপকে ঢুকল। ঝাঁপিটার জন্য কষ্ট হল খুব। ঝাঁকুনি খেয়ে ব্যাটা ভিতরে গজরাচ্ছে। কর্কশ দেয়ালের ঘষাটায় কনুইটা ছড়ে গেল অনেকটা। কিছুই গ্রাহ্য করল না সে। ভিতরের দরজা খুলে দিল রাঁধুনী লোকটা। দরজা খুলে তাকে দেখেই সন্ত্রস্ত ভাবে সরে গেল। গলাখাঁকারী দিয়ে বলল···বাবুর বড় অসুখ।

—কার?

—বড়বাবুর।

—ও। বলে নির্বিকারভাবে নিজের ঘরে গেল সে। সে থাক বা না-থাক তার বিছানা পরিপাটি পাতা থাকে রোজ। খাওয়ার ঘরে খাবার ঢাকা থাকে। এই নিয়ম করে রেখেছে মা। বেশী রাতে ফিরলেও কোন অসুবিধে হয় না।

ঘরে ঢুকে ঝাঁপিটা যত্নে খাটের তলায় রেখে জামাটা খুলে শুয়ে সে সিগারেট ধরাল। কার অসুখ যেন বলছিল লোকটা!

উঠে আবার খাওয়ার ঘরে এল। বারান্দায় জল আর ঝাঁটার শব্দ হচ্ছে।

—কার অসুখ বললে?

—বড়বাবুর।

—কী হয়েছে?

—কী জানি! অজ্ঞান মত হয়ে আছেন কাল থেকে। মা বলেছে আপনি এলেই খবর দিতে।

দোতলায় সিঁড়ির তলায় একবার দাঁড়াল নয়ন। সিঁড়ির বাতি নেভানো। ওপরটা নিস্তব্ধ। সিঁড়ি ভাঙতে তার ইচ্ছে করছিল না। বাবার জন্য তেমন কিছু উদ্বেগও বোধ করল না সে। কোন দিনই করে না।

সিঁড়িতে গোটা দুই বেড়াল শুয়ে। একটুক্ষণ বেড়ালের ঘুম দেখল সে। বাবা এই রাতে মারা গেলে শ্মশান-ফশানে যাওয়ার ঝামেলা অনেক। ভেবে সে একটু বিরক্ত হল। মরেফরে যাওয়াটা যে সংসারে কেন আছে। এগুলো উঠে গেলেই ভাল।

আবার ঘরে এসে সে বাতি নিভিয়ে শুয়ে জেগে থাকে। তারপর হঠাৎ উঠে বাতিটা জেবলে ঝাঁপিটা বের করে।

একটা কপিশ শরীর পাকে পাকে জড়িয়ে আছে। দেখলে গা শির

শির করে। নিঝুম হয়ে পড়ে আছে সাপটা। হাতটা একবার বাড়াল নয়ন, তার হাতের ছায়া পড়ল সাপটার মুখে। সাহস পেল না সে, হাতটা আবার সরিয়ে আনল।

একটা স্কুটার ছিল নয়নের। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় খুব ভাল রেজাল্ট করেছিল বলে বাবা কিনে দিয়েছিল। সেই স্কুটারটা নয়ন চালাত ঝড়ের মত। হাল্কা জিনিস, চৌৎপুরে একবার রাস্তার গর্তে ঝাঁকুনি খেয়ে নিয়ে ওল্টায়। দ্বিতীয়বার একটা ট্রামকে টপকে যেতে গিয়ে ভবানীপুরে একটা স্টেটবাসের পিছনে ভিড়িয়ে দেয় নয়ন। তিন-বারের বার বর্ষাকালের জলে-ডোবা লাইব্রেরী রোডে সেটা পড়ে যায় আধখোলা ম্যানহোলের ভিতরে। জখমটা গুরুতর হয়েছিল। কালী-ঘাটের একটা গ্যারেজে দিয়েছিল, সেখানে আজও পড়ে আছে। আনা হয় নি। স্কুটার আর ভাল লাগে না নয়নের। যদিও কখনও কেনে একটা স্পোর্টস্ কারই কিনবে নয়ন। বাবা মরে গেলে কিনতে কোন ঝামেলা হবে না। একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড এম-জি স্পোর্টস্ কার দেখেও রেখেছে নয়ন।

স্কুটার যখন চালাত তখনকার একজোড়া চামড়ার দস্তানা আর গগলস্ আলমারিতে পড়ে আছে। নয়ন উঠে গিয়ে আলমারি খুলে দস্তানা জোড়া বের করে আনল। দস্তানাটা পুরু, দু পাল্লা চামড়ার মাঝখানে তুলোর গজ ভরা। সে দুটো হাতে পরে নিল সে। তারপর সাপের ঝুড়িটার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসল। তেমনি নিঝুম পড়ে আছে সাপটা। মাথাটা ছোট্ট দেখাচ্ছে। কী করে ফণাটা মুহূর্তের মধ্যে অতটা চওড়া করে ফেলে!

নয়ন হাতটা বাড়াল। মাথাটার এক বিঘৎ দূরে হাতটা নিয়ে গেল সে। হাতের ছায়াটা নাড়তে লাগল সাপের মুখের ওপর। তারপর চকিতে আঙুল বাড়িয়ে একটা খোঁচা দিল সে। সাপটা নড়ল না। নড়লে কী হবে তা নয়ন ভাবে না। কাছাকাছি জগদীশ নেই, সে একা। তবু নয়ন আবার আঙুলের খোঁচা দিল। আবার।

চমকে মুখ তোলে সাপ। ছোট্ট মাথাটার দু পাশে ছড়িয়ে যায় হাতের পাতার মত ফণা। শেকড়ের মত ছোট্ট জিবটা বেরিয়ে আসে। বারবার। ঘন শ্বাসের শব্দ। একটু দোলে। ছোবল দেবে নাকি?

সাপটার উদ্ধত আক্রমণাত্মক ভঙ্গীটা দেখে নয়ন। চোখ ভরে দেখে।

যা কিছুটা ভয়ংকর তা-ই তার প্রিয়। দস্তানা পরা হাতটা সন্তর্পণে বাড়ায় সে। কিছু বুঝবার আগেই চাবুকের মত মুখটা আছড়ে ফেলে নয়নের হাতের ওপর। দস্তানা পরা হাত, তাই কিছুই টের পেল না নয়ন। কিন্তু খুব চমকে গেল। সাপ যে কতটা গতিময়, কী মারাত্মক তার চকিত আক্রমণ তা টের পায়, এই গতিটাই নয়নকে ভারী অবাক করে। জগদীশ এর চেয়েও দ্রুতবেগে হাত বাড়ায় এবং হাত সরিয়ে নেয়। নয়নকে শিখতেই হবে।

কিন্তু সাপটা আর ছোবল দেয় না। সে হয়তো নিজের বিষদাঁতহীন অক্ষমতা বুঝতে পারে। তাই মাথাটা নামিয়ে শরীরটাকে জলধারার মত স্বচ্ছন্দে ঝুড়ির কাণার ওপর দিয়ে টেনে মেঝের ওপর দিয়ে আঁকা-বাঁকা হয়ে চলতে থাকে। সাপটা যে কত বড় তা এই প্রথম বুঝতে পারে নয়ন, ফলে তার গায়ে কাঁটা দেয়।

সাপটা নয়নের দিকে ফিরেও তাকায় না। প্রথমে আলনার তলা, তারপর আবার ঘুরে খাটের নীচের অন্ধকারে যেতে থাকে। নয়ন একটু স্তব্ধ থাকে। তারপরই দাঁতে দাঁত টিপে নিজের কাঁপা শরীরকে সামলে হাত বাড়িয়ে খাটের তলার অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে এগোয়। সাপটা আবার পাকে পাকে শরীর জড়াচ্ছে। সন্তর্পণে নয়ন হাত বাড়ায়। সাপটা মুখ তোলে, শ্বাস ফেলার মত শব্দ করে নয়নকে সতর্ক করে দেয়। নয়ন থেমে যায়। ওর দ্রুতবেগটাকেই নয়নের ভয়।

উদ্যত হাতটা বাড়িয়ে রেখেই নয়ন খর চোখে সাপটাকে দেখে। সাদা বুকটা তুলে, ফণা মেলে সাপটাও দেখে নয়নকে। নয়ন হাসে। তারপর নয়নের হাতটাই সাপটাকে অবিকল সাপের মত ছোবল দেয়। গলার নীচে চেপে ধরে সাপটাকে হিঁচড়ে নিয়ে আসে সে। ছট্‌ছট্‌ করে সাপটা, সমস্ত শরীর আছড়ায়। নয়নের হাতটা পাকে পাকে জড়াতে থাকে।

হঠাৎ সমস্ত বুক পেট জুড়ে একটা বমির ভাব আসে নয়নের। ঘেন্নার শরীর রী রী করে। সাপের ঠাণ্ডা শরীরের স্পর্শ তার হাতটাকে হিম করে দেয়। পাগলের মত সে হাত ছুঁড়ে, ঝাঁকুনি দিয়ে ঝেড়ে ফেলে দেয় ওটাকে, তারপর হাঁফাতে থাকে।

সাপটা মেঝেময় ছড়িয়ে কিলবিল করে। তারপর আবার ঝাঁপিটার পাশ দিয়ে খাটের তলায় চলে যেতে থাকে।

নয়ন দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে ঢোকে, দস্তানা খুলে গলায় আঙুল দেয়।

বেসিনে উপুড় হয়ে হড় হড় করে বমি করে। টক-তেতো স্বাদ, শরীরটা কাঁপতে থাকে।

মুখে চোখে জল দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই সে টের পেল, মাথায় ভয়ংকর যন্ত্রণা হচ্ছে। চোখ খুলতে কষ্ট হচ্ছে ভীষণ। শরীরটা যেন বাতাস দিয়ে তৈরী, এমন হাল্কা লাগে।

দেয়াল ধরে ধরে ঘরে এল নয়ন। টেবিল হাতড়ে সোনেরিলের কৌটোটা বের করল। একসঙ্গে তিনটে কি চারটে—না গুণে মুখে নিয়ে জল দিয়ে গিলল। সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় আধশোয়া হয়ে কিছুক্ষণ সিগারেট খেল।

একটা ঝিমুনির ভাব আসছে। একটু পরেই সে ঘুমিয়ে পড়বে। এক আধবার সাপটার কথা মনে হয় নয়নের। ভাবে উঠে গিয়ে ওটাকে ঝুড়িতে ভরে রাখা উচিত। কিন্তু শ্লেটের ওপর লেখা যেমন মুছে যায় তেমনি নানা হিজিবিজি চিন্তা স্বপ্নের মত চোখের সামনে এসে যায়। সাপটার কথা খেয়াল থাকে না। হাতটা বিছানার বাইরে এলিয়ে পড়ে আছে, দু আঙুলে ধরা সিগারেটটার ছাই লম্বা হয়ে ঝুলে আছে, মাথা ভর্তি স্বপ্ন, চোখ জুড়ে আসছে……

ঘুমিয়েই পড়ত নয়ন। দরজায় মৃদু শব্দ শুনে চোখ কষ্টে খোলে সে।

—কে রে?

নতুন চাকরটা ঘরে উঁকি দেয়—দাদাবাবু বড়বাবুর অবস্থা খারাপ। মা আপনাকে ওপরে ডাকছেন।

নয়ন প্রথমটায় বুঝতে পারে না, জিজ্ঞেস করে—কার অবস্থা খারাপ বলছিস?

—বড়বাবুর, আপনার বাবামশাইয়ের।

—ও, মাথাটা একটু ঝাঁকায় নয়ন। তারপর উঠে বসে বলে—কী হয়েছে?

—কী জানি, অবস্থা কাল থেকেই খারাপ যাচ্ছে। খুব অসুখ। নয়ন উঠল।

খুবই ক্লান্ত লাগছে তার। সোনেরিল খাওয়ার পর শরীরটা একরকম নেশায় ভরে ওঠে। নড়া-চড়া ভাল লাগে না। তবু সিঁড়ি ভেঙে ওপরে বাবার ঘরে এল সে।

খুব মৃদু নীল ঘুম-আলো জ্বলছে ঘরে। প্রকাণ্ড মেহগিনির

পালঙ্কের ধারে টেবিল, তাতে ওষুধপত্র রাখা। পালঙ্কের নীচে সাদা বেডপ্যান, জলের বালতি। ঘরে ওষুধের গন্ধ। উঁচু বালিশে মাথা রেখে নয়নের বাবা শুয়ে। শরীরটা স্থির নয়। ডান পাটা ক্রমাগত নড়ছে, ডান হাতটা কপালের কাছে উঠে যাচ্ছে বার বার।

নয়ন দরজা থেকে তিন চার পা হেঁটে বাবার বিছানার কাছে দাঁড়াল। শিয়রের কাছে মা বসে আছে। মা জিজ্ঞেস করল—খেয়েছিস?

গলাটা ভাঙা। বোধ হয় খুব কেঁদেছে মা, নয় তো ঠাণ্ডা লাগিয়েছে। মার কথার জবাব না দিয়ে নয়ন জিজ্ঞেস করে—কী হয়েছে?

—কী জানি, পরশু রাতে খাওয়ার আগে বাথরুমে গিয়েছিল, হঠাৎ দৌড়ে ফিরে এল, কী যেন সব আবোল তাবোল বলল, শুয়ে পড়ল হঠাৎ। ডাক্তাররা তো স্পষ্ট করে কিছু বলে না। তবে শিরা থেকে রক্ত নিয়ে গেছে পরীক্ষা করতে।

নয়ন বলল—জ্ঞান নেই?

—না তো। কোন সাড়া দিচ্ছে না।

নয়ন ভীত চোখে চেয়ে বলে—তবে ডান পাটা নড়ছে কেন?

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—কে জানে! ক্রমাগত নড়ছে। দিনরাত কামাই নেই। কী যে হবে। তুই খাস নি?

—না।

—খেয়ে নে।

—নিচ্ছি, রাতে তুমি জাগবে নাকি।

—না, নার্স রাখা হয়েছে। এক্ষুণি এসে পড়বে। তুই খেয়ে নে যা। ঘুম থেকে উঠে কোথাও যাস না সকালে, কখন কী হয়।

নয়ন বাবার দিকে একটু চেয়ে রইল। জ্ঞান নেই, সাড়া নেই, তবু দুটো অঙ্গ নড়ছে। ডান পা, ডান হাত, লক্ষণটা একটু চেনে নয়ন।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করল—পিত্তের বমি হয়েছিল?

মা একটু থমকে গিয়ে বলে—হয়েছিল।

—কখন?

—একটু আগে। কেন?

নয়ন মার দিকে একটু চেয়ে রইল। আবছা আলোয় ভাল দেখা যায় না। শিয়রের কাছে খাটের বাজুতে পিছনে হেলে বসে আছে মা। শরীরটা মোটা, নড়াচড়া করতে কষ্ট হয়। তার ওপর মোটা, ভারী সব

গয়না, আঁচলে আধকেজি ওজনের এক থোলো চাবি। এসব নিয়েই একটু পরে গড়াগড়ি খেয়ে কাঁদতে হবে। পরনে চওড়া পাড়ের শাড়ি, সিঁথের সিঁদুরের দাগে ঘা…নয়ন বাবার দিকে চেয়ে মনে মনে বলে…গুডবাই স্যার, আর দেখা হচ্ছে না তাহলে!

—যাচ্ছি।

মা জিজ্ঞেস করে…ঐ বমি হলে কী হয়?

—কী আবার হবে?

—তবে জিজ্ঞেস করলি কেন?

—এমনিই।

—তুই তো ডাক্তারী একটু শিখেছিলে, বুঝছিস না অবস্থাটা?

—আমার বোঝাবুঝি দিয়ে কী হবে, বড় ডাক্তার দেখছে যখন!

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর বলে…যা খেয়ে নে।

নয়ন নেমে আসে। রাঁধুনী খাওয়ার ঘরে অপেক্ষা করছে। খাওয়ার টেবিলে আরো একজন বসে খাচ্ছে। কালোমত একটি মেয়ে। খুব সাধারণ চেহারা, রোগা, না তাকালে কিছু এসে যায় না। মেয়েটা তাড়াহুড়ো করে শেষ কয়েকটি গ্রাস খাচ্ছিল।

নয়ন মুখোমুখি বসল। বলল—ব্যস্ত হবেন না, আস্তে খান।

মেয়েটা মুখ তুলে অপ্রতিভ গলায় বলে—আমি গেলে আপনার মা শুতে যাবেন। ওঁরও শরীরটা…

নয়ন একটু হাসে…শুয়ে আর কী হবে? রাত পোয়াবে না। নার্স মেয়েটা চুপ করে থাকে।

—খান।

মেয়েটা খায়।

রাঁধুনী প্লেটে খাবার সাজিয়ে আনে নয়নের জন্য। নয়ন একটু নাড়াচাড়া করে। দু এক গ্রাস খায়, মেয়েটা উঠে যাওয়ার আগে একবার সন্তর্পণে নয়নের দিকে তাকাল। নয়ন একটু হাসল। বন্ধুত্বের হাসি।

আঁচিয়ে ঘরে এসে আরো দুটো সোনেরিল গেলে নয়ন। সিগারেট ধরায়। বিছানার দিকে যেতে গিয়ে হঠাৎ তার সাপটার কথা মনে পড়ে। নীচু হয়ে খাটের তলাটা দেখে সে। নিঝুম হয়ে খাটের নীচের আবছায়ায় পড়ে আছে লক্ষ্মীছেলের মত। নড়ে নি।

নয়ন একটা হাই সামলায়। দস্তানা জোড়া খুঁজে হাতে পরে নেয়।

তারপর খাটের তলায় হাত বাড়ায়।

বিরক্ত হয়ে ছিটকে ওঠে সাপটা। কিন্তু নির্বিষ, অক্ষম তার আক্রোশ। মুহুর্মুহু কয়েকবার সে নয়নের হাতে মাথা কোটে। চুম্বনের মত তা নয়নের হাত ছুঁয়ে যায়। নয়ন আর ভয় পায় না। দ্বিধা বোধ করে না। হিংস্রতর তার দুটি হাতে সে গলা টিপে সাপটাকে টেনে এনে মেঝেতে ছেড়ে দেয়।

সাপটা তার ফণা তোলে। নয়নের কোমর সমান সমান বা তার চেয়েও উঁচুতে। নয়ন সেই উদ্যত মুখে ঠাস করে একটা চড় মারে। সাপটা ঢলে পড়ে আবার চিতিয়ে ওঠে। আক্রোশে রাগে হিংস্রতায় তাকে পর পর কয়েকটা চড় দেয় নয়ন। বলে···শুয়োরের বাচ্চা, ঢোক্ ঝাঁপিতে, ঢোক্···তোর বাবা ঢুকবে···

বলে মাথা চেপে ধরে নয়ন মেঝেতে ঠুকে দেয়। লেজ ধরে তুলে প্রায় আছাড় মারে। কেন যে এই আক্রোশ তা বুঝতে পারে না সে, কিন্তু তীব্র জ্বালাময় আনন্দ বোধ করে। সাপটা কী বোঝে কে জানে! অবশেষে তাকে ঝাঁপিতে পাকিয়ে পাকিয়ে রাখে নয়ন। তার শ্বাস, জিব, চোখ...কোন কিছুকেই গ্রাহ্য করে না।

ঝাঁপিটা বন্ধ করে দড়ি দিয়ে বাঁধে। তারপর খাটের তলায় সেটা ঠেলে দিয়ে বিছানায় বসে। সিগারেটটা আড় করে খাটের রেলিঙে রেখে দিয়েছিল। সেটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে কাঠ ধরে ফেলেছে। রেলিঙের কাঠ জ্বলে গেছে অনেকখানি, ধোঁয়াচ্ছে। সিগারেটটা তুলে নিয়ে খাটের পোড়া জায়গাটায় একবার আঙুল ঘষল নয়ন। আধশোয়া হয়ে সিগারেট টানতে লাগল। শরীর জুড়ে ক্লান্তি নেমে আসছে অন্ধকারের মত।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে নয়নের চোখে স্বপ্ন ভেসে বেড়ায়। সে জগদীশকে দেখতে পায়। একটা প্রকাণ্ড বাগানে জগদীশ ফুল তুলছে। বাঁ হাতে একটা সাজি। ফুল তুলে সাজিতে রাখছে জগদীশ। কিন্তু সাজিতে রাখা ফুল হয়ে যাচ্ছে সাপ। সাজি থেকে অজস্র সর্পের ফণা উঁচু হয়ে আছে। দেখতে দেখতে অন্ধকারটা চলে এল। সোনেরিলের ঘুম।

বিকেলে বেরোবার মুখে শ্যামার বাবা ধুতী পাঞ্জাবীর ওপর শালটা ঘাড়ে নিয়ে, হাতে চমৎকার লাঠিগাছটা একবার নামিয়ে বেরোতে যাচ্ছে

সেই সময়ে কাণ্ডটা ঘটল।

বাইরের সিঁড়িতে পা রেখেছে মাত্র, সেই সময়ে দেখা গেল একটা লোক সিঁড়ির মুখেই ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে হাফশার্ট আর পরনে খাকী প্যাণ্ট, পায়ে কেড্‌স্‌। চোখমুখ ফোলা ফোলা, চোখ লাল, মাথাটা জুতোমারা মাথার মত উলোঝুলো, ধুলোটে। চুর-চুর মাতাল লোকটা শ্যামার কাকা তড়িৎ চৌধুরী। বংশের কুলাঙ্গার। পরিবারে এমন কেউ নেই যে তাকে না সমঝে চলে।

শ্যামার বাবা ভূত দেখার মত চমকে সিঁড়ি থেকে পা তুলে নিল। মাতাল অবস্থায় না থাকলে তড়িৎ চৌধুরীকে ভয়ের কিছু নেই, কিন্তু এই অবস্থায় তার ভিতরকার সব জমে থাকা কথা ওগড়ায়। শ্যামার বাবা বুঝল তার ভাই এখন ওগড়াবে। সিঁড়ি থেকে পা তুলে ভিতরে চলে এল, সদরটা বন্ধ করতে করতে টের পেল, তার হাত কাঁপছে, বুকে বেড়ে যাচ্ছে রক্তচাপ, মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌। দরজা বন্ধ করতে করতেই শুনল মাতাল হারামজাদা চেঁচিয়ে বলছে—ঐ যে শালা সরিৎ চৌধুরী দরজা দিচ্ছে, ঐ যে শালা বেওয়া বিধবার জমি খাস দখল করেছে যে ব্যাটা…

চেঁচামেচিটা শুনতে পেল শ্যামাও। সোয়েটারটার শেষ কয়েকটা কাঁটা বোনা এখন বাকী। দিনরাত কদিন ধরে বুনছে শ্যামা। ফুলহাতা সোয়েটার, উঁচু গলা, তার ওপর প্যাটার্নটাও গোলমেলে—বড্ড পরিশ্রম গেছে। পিঠ টন্‌টন্‌ করে, চোখে ঝাপসা দেখে, মাথা টিপ্‌টিপ্‌ ব্যথা করে। তবু শেষ হয়ে আসছে বলে হাত থামায় নি শ্যামা। আজ রাতে বাবাকে পরিয়ে দেখবে। দেয়ালে হেলান দিয়ে নিজের বিছানায় বসে সে বুনতে বুনতে হঠাৎ চীৎকারটা শুনতে পেল। হাত কেঁপে একটা ঘর গেল পড়ে। কাকার গলা। মাসে দু মাসে এক একদিন কাকা এরকম মাতাল হয়ে আসে, বাইরে দাঁড়িয়ে চেঁচায়, রাস্তার লোক পাড়ার লোক জড়ো করে গালমন্দ পাড়ে। সেইসব গালমন্দের কোন মানে হয় না। কাকা লোকটা হাইকোর্টে ফোলিও টাইপ করে। বাঁধা মাইনে নয়। ফোলিওর ওপর কমিশন পায়। তার বৌ থাকে বাপের বাড়িতে, কাকার বিধবা শাশুড়ি মেয়েকে নিজের বাড়িতে একখানা বারান্দা সমেত ঘর লিখে দিয়েছেন, পাছে সেটা ভাইরা বেহাত করে, সেই ভয়ে। তা ছাড়া কাকার সঙ্গেও বনিবনা নেই, সেই বৌ স্কুলে চাকরি করে দুটো ছেলেমেয়েকে খাওয়ায়। কাকা গলা পর্যন্ত মদ গিলে যখন দুঃখবোধ করে তখন দাদার বাড়ির

সামনে বা শ্বশুর বাড়ির সামনে গিয়ে চেঁচায় ; শ্যামার বাবার অপরাধ টালিগঞ্জে যে জমিটায় বাড়ি তুলেছে সেটা কাকার শাশুড়ির কাছ থেকে সস্তায় কেনা। খাটাল ছিল, সেটা তুলে দিয়েছে শ্যামার বাবা। কাকার বিশ্বাস জমিটা বাবা না কিনলে শাশুড়ি সেটা কাকার নামে লিখে দিত। এক সময়ে কাকার সঙ্গে একান্নবর্তী পরিবারে থাকত শ্যামারা, নয়নদের পাড়ায়। সে সময়ে কাকার সঙ্গে নয়নের খুব ভাব ছিল। আজও আছে কিনা কে জানে! শ্যামা পরিষ্কার শুনতে পায় কাকা চীৎকার করে বলছে —আমার বৌকে কানমন্তর দিয়ে ভেন্ন করেছে কোন্ শালা ঐ সরিৎ চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করুন আপনারা। বুকে হাত দিয়ে বলুক ঐ ব্যাটা আমার বৌকে বলেছে কিনা—বৌমা, মাতালটার ঘর কোরো না তুমি! বলেছে কিনা... ! পাপ করেছে বলেই ওর ছেলে পাগল হয়ে বেরিয়ে গেছে, ওর শান্তি আছে? শালা সাধু-তান্ত্রিকের পেছনে পয়সা ঢালে, মায়ের পেটের ভাই আমি পেটে আলসার, হাতে বাত নিয়ে নুলো হয়ে যাচ্ছি, আমাকে একটা পয়সাও ছোঁয়ায় না……

পড়ে-যাওয়া ঘরটা সাবধানে কাঁটায় ফের তুলল শ্যামা। এখন আর বোনাটা এগোবে না। কাঁটা মুড়ে রেখে ওঠে শ্যামা। বাইরের ঘরে বাবা চেয়ারে বসে ঘামছে, পাশে দাঁড়িয়ে মা। পাখাটা পুরো জোরে ঘুরছে। রক্তচাপটা বিপজ্জনক সীমানাতেই ঘোরা ফেরা করে বাবার। কখন যে সীমাটা ছাড়িয়ে যায় শ্যামার সেই ভয়।

শ্যামা একটু হেসে বলে—বাবা, অমন করছ কেন? কাল তো আমরা মুর্গী খাচ্ছিই।

কাকা যেদিন গালমন্দ করে তার পরদিন সকালে মুর্গী হাতে এসে বাবার পায়ে পড়ে। তারপর কেটেকুটে বাড়ির পাশের গলিটায় স্টোভ জেলে নিজেই রান্না করে। নুন ছাড়া খানিকটা তুলে রাখে বাবার জন্য। মা খায় না, বাকীটা কাকা আর শ্যামা খায়। এটাও নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। কাকা গাল দিলে পরদিন মুর্গী হবেই।

—আর মুর্গী! বাবা, অসহায় ভাবে মুখখানা তুলে বলে। শ্বাস ছেড়ে বলে…কী পাপে যে ওর শাশুড়ির জমিটা কিনেছিলাম!

মা ঝাঁঝ দিয়ে বলে…কেন, কিনে দোষটা কী করেছি শুনি! ঠাকুর-পোর শাশুড়ি জমিটা তো বেচতই!

বাবা লালচে মুখখানা তুলে বলে…বেচত তো বেচত। আমি নিমি—

ত্তের ভাগী না হলেই হত। ভেবে দেখ, আমার বাড়ি করার তো কোন অর্থ নেই। আমরা বুড়োবুড়ি চোখ বুজলে ও বাড়িতে থাকবে কে?

মা হঠাৎ চুপ করে বাবার দিকে সোজা একটু চেয়ে থাকে, তারপর জ্বল-জ্বলে হয়ে ওঠে চোখ, খ্যাপাটে গলায় বলে···বাড়িতে থাকবে কে! কেন আমার টোকন ফিরবে না ভেবেছ? তোমার ধারণা কি যে আমার টোকন নেই? অ্যাঁ!

বাবা ইতস্ততঃ করে বলে ··সে কথা বলি নি। আঃ, তুমি বড্ড কথা ঘোরাও, বলছিলাম কি···

—তোমার কথা আমি সব বুঝি।

শ্যামা নিঃশব্দে গিয়ে সদরের ছিটকিনিটা খুলল। মা বাবা ঝগড়া করছে, তাই লক্ষ্য করল না।

রাস্তায় বিকেলের ভরভরন্ত আলো। কাকা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে, তার চারধারে লোক জমেছে। ওধারের পার্কে খেলা হচ্ছিল, খেলা ভেঙে এসেছে কয়েকটা ছেলে, জুটেছে কিছু ভবঘুরে, কিছু ঝি-চাকর শ্রেণীর লোক। কাকা শ্রোতা পেয়ে ডিঙ মেরে যতদূর সম্ভব উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে বুক চিতিয়ে বলছে···শালা আমার বৌকে যেমন ভেন্ন করেছে তেমনি ওর বৌ-মেয়েও ভেন্ন হবে। আমার শাশুড়িকে ভজিয়ে যে জমি দখল করে বাড়ি তুলছে সেখানে ইঁদুর বাদুড় ঘুরবে, শকুন পড়বে···

কাকা যখন এরকম অবস্থায় এসে চেঁচায় তখন শ্যামাদের বাড়ির কেউই বাইরে বেরোয় না। তাদের ভয় করে। তবু বাবার প্রেসারের কথা ভেবে ক্ষণেকের জন্য শ্যামা ভয় ভুলে গেল। বারান্দার রেলিং থেকে ঝুঁকে ডাকল···কাকা!

কাকা তখন স্বরচিত একটা ছড়ার মত অনর্গল বকে যাচ্ছে···এই আমি তড়িৎ চৌধুরী, ঐ শালার মায়ের পেটের ভাই, কিন্তু আমার শালা গো-ভাগাড়ে ঠাঁই। আই হ্যাভ এ পুওর বেল্লী, মনের দুঃখে মদ গিলি। মশাইরা···বলতে বলতে শ্যামার ডাক শুনে তড়িৎ চৌধুরী ব্রেক কষে তাকাল। তাকিয়েই রইল শ্যামার দিকে, মুখখানা একটু হাঁ করে। তারপর বলল—কী বলছিস?

—ভিতরে এস।

—না।

—না কেন? যা বলার বাবাকে মুখোমুখি বল। বাইরে দাঁড়িয়ে

কেন ?

—আলবৎ চেঁচাব। তোর বাবাকে বেরিয়ে আসতে বল। বলে তড়িৎ চৌধুরী শ্যামার দিকে পিছন ফিরে আবার চেঁচাতে শুরু করে··· মশাইরা শুনুন···ঐ যে আমার ভাইঝি শ্যামা···ও নয়ন নামে একটা ছেলেকে ভালবাসে···ডীপ লাভ্, ভেরী ডীপ লাভ···কিন্তু চামার সরিৎ চৌধুরী তবু বিয়ে দেবে না। কারণ কি জানেন ? ছেলেটা তেলী··· হা হা···তেলী ! তেলী আবার কী মশাইরা, অ্যাঁ ! মানুষ মানুষ, তার আবার তেলী বামুন কিছু আছে নাকি আজকাল ? মেয়েটা ভিতরে ভিতরে শুকিয়ে একদিন মরবে, ছেলেটা আত্মহত্যা করবে দেখবেন। ঐ যে আমার ভাইঝি, ঐ শ্যামা, ওটার বিয়ে হবে না···

রাস্তার লোকেরা শ্যামার দিকে চেয়ে আছে। সচেতন হয়ে শ্যামা সেটা বুঝতে পারে। লজ্জায় অপমানে ঝাঁ ঝাঁ করে তার মুখ। দেয়ালের আড়ালে সরে আসে শ্যামা। মুখ লুকিয়ে পালিয়ে আসে ঘরে। থরথর করে তার শরীর কাঁপে।

আধঘণ্টাটাক চেঁচিয়ে কাকা চলে গেল। নিঃঝুম হয়ে গেল বাড়িটা। রাতে তারা কেউ ভাল করে খেতে পারল না। ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বাবা জিজ্ঞেস করে···তড়িৎ নয়নের কথা কী বলছিল রে ?

শ্যামা মাথা নত করে বলে···কী জানি !

বাবা চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে···নয়ন ওকে মদ টদ খাওয়াচ্ছে হয়তো। শ্যামা, খুব সাবধানে থাকিস। আমি শিগ্‌গিরই তোর বিয়ে দিয়ে দেব।

মা ঝংকার দেয়, পাত্র কোথায় যে বিয়ে দেবে ?

—আমি সেই ডাক্তার ছেলেটার কথা ভাবছিলাম। বাবা বলে—ছেলেটা বড় ভাল ছিল।

আশায়, আনন্দে হঠাৎ ভিতরে ভিতরে শিউরে ওঠে শ্যামা।

মা মুখখানা পাথরের মত করে বলে—সন্নিসি-টন্নিসির সঙ্গে আমি মেয়ের বিয়ে দেব না।

শ্যামার বুকটা অন্ধকার হয়ে যায়।

বাবা মিনমিন করে বলে—নয়ন যদি তড়িৎকে হাত করে থাকে তবে বড় ভয়ের কথা। তড়িৎ মদ খেলে তো যা তা বলে, শ্যামার নামেও বলবে এর পর থেকে। তাই ভাবছি—

—তাই বলে যার তার হাতে মেয়ে গছিয়ে দিতে হবে নাকি!

—যে সে তো নয়। বিলেতফেরত বড় ডাক্তার, মতি ফিরলে একদিন লাখ টাকা কামাবে—

—কামাক। তবু বলব, ও ছেলে অপয়া। যে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিকঠাক ছিল সে মেয়েটা দুম করে মরে গেল, সেটা ভুলো না। তার ওপর ভাবের পাগল লোক, ওদের কি বিশ্বাস আছে?

—তবে তুমি কি করতে বল?

মা একটা শ্বাস ছেড়ে বলে—কী বলব? আমার কি মাথার ঠিক আছে! এ সময়ে টোকনটা কাছে থাকলে আমি এত ভাবতাম না। বলে মা চোখে একটু আঁচল চাপা দেয়। অনেকক্ষণ পর বলে—যার তার হাতেই যদি মেয়ে দেবে তো বরং নয়নের হাতেই দাও না কেন!

—কী বলছ এ সব?

—ঠিকই বলছি। অনেক ভেবে দেখেছি। জাতে ছোট তাতে আর আজকাল তো কিছু আটকায় না। মেয়ে নিজে থেকে ছোট জাতে রেজিস্ট্রি করে এলে কী করতে? ফেলে দিতে? তাই বলছি, নয়ন তো উকিল-বাবুর এক ছেলে, বিস্তর টাকা পয়সা। ছেলেটা শ্যামার জন্যই কেমন বাউণ্ডুলে হয়ে গেল, নইলে সেও তো ছাত্র ভালই ছিল, ডাক্তারী সেও পড়ত। বিয়ে না দিলে সে ছেলে হাঙ্গামা করবে না? হয়তো বোম কি ছোরা মারবে, কি আরও কত কাণ্ড করতে পারে—তাই বলছিলাম, মেয়ের বিয়ে দিয়ে চল আমরা নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়ি টোকনকে খুঁজতে—

শ্যামা পাত ছেড়ে উঠে যায়।

মায়ের কাছে টোকনই সব, শ্যামা কেউ না—এই সত্যটা ভাবতে ভাবতে শ্যামা রাতে বিছানায় অন্ধকার মশারির বাইরে মশার শব্দ শুনতে শুনতে খানিকক্ষণ জেগে রইল। খুব দূরের একজন মানুষ শ্যামার স্মৃতিতে ক্রমে আবছা হয়ে আসছে। সেই মানুষটির জন্য এক উম্মুখ পিপাসা আজও আছে। থাকবে কি?

শ্যামা পাশ ফিরে শোয়। ফাঁকা বিছানার একটা ধারে একদিন একজন মানুষ জায়গা নেবে। কে সে? নয়ন? নয়নের কথা ভাবতেই শ্যামার শরীরটা কেমন কুঁকড়ে যায় অনিচ্ছায়। তবু যদি নয়নই হয়? হায় ঈশ্বর! শ্যামার ভিতরে এক প্রকৃতিদত্ত প্রতিরোধ আর অনিচ্ছা নয়নের প্রতি ফণা তুলে আছে। মায়ের কথাটা ভাবে শ্যামা। অভিমানে চোখে

জল চলে আসে।

ভোর রাতে শ্যামা শুনতে পায়, বাইরে একটা ময়না পাখী ডাকছে। চমৎকার কথা বলে পাখীটা। প্রথমে 'রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ' বলে ডাকল, তারপর বলল 'ওঠ, ওঠ, চোর এসেছে।' আধঘুমের মধ্যে আলস্যভরে শুনছিল শ্যামা। চমৎকার ডাক শিখেছে পাখীটা। তারপরই ভয়ংকর চমকে ওঠে সে। শুনতে পায় পাখিটা তার জানালার কাছ ঘেঁষে ডাকছে—'শ্যামা, শ্যা—মা তোমার চিঠি, তোমার চিঠি…' তারপর পাখীটা চুপ করে যায়।

নয়নপাখী!

শ্যামা উঠল না, কিন্তু সম্পূর্ণ জেগে শুয়ে রইল।

সকালবেলায় শ্যামা নয়নের চিঠিটা পেল শিয়রের জানালা খুলে। জানালার বাইরের খাঁজে সাদা খামের চিঠিটা পড়ে আছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্যামা চিঠিটা হাতে নিল। নয়ন যতক্ষণ বেঁচে আছে, মুক্তি নেই।

চিঠিতে লেখা—চৌরাস্তায় একবার এস। না এলে সারাদিন বসে থাকব। মনে রেখো। সারাদিন।

শ্যামা চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলল।

সময় নিল শ্যামা। অনেকক্ষণ। ভাবল খানিক। তারপর বেলা বাড়লে তাঁতের সাদা খোলের একটা শাড়ি পরে, চুলটা আঁচড়ে চটি পায়ে বেরিয়ে পড়ল।

চৌরাস্তায় গাছতলার পশ্চিমায়,চায়ের দোকানটার পাশে নয়ন দাঁড়িয়ে। হাতে চায়ের ভাঁড়। শ্যামাকে দেখে ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে হাসল দূর থেকেই।

ওর ঝাকড়-মাকড় চুলে একটা সবুজ পাতা খসে পড়েছে। আটকে আছে পাতাটা। অদ্ভুত দেখাচ্ছে নয়নকে। তীব্র, তীক্ষ্ন, জংলাধরা চেহারা। সুন্দর নয়, কিন্তু ওর দিকে দুবার তাকাতে হয়। চলন্ত রাস্তা ওর পিছনে, মানুষজন ব্যস্ত ভাবে যাচ্ছে, একটা ট্যাক্সি উড়ে গেল, বাস দাঁড়াল। সেই চলন্ত দৃশ্যকে পিছনে রেখে নয়ন দাঁড়িয়ে। চুলে সবুজ একটা পাতা। গা-টা শির শির করে শ্যামার। ভয়? হবেও বা।

—কী চাও নয়ন?

নয়ন মাটিতে রাখা একটা ঝোলা বাঁ হাতে তুলে নিল। বলল…

ওদিকে একটা কবরখানা আছে না ?

—মসজিদ।

—মসজিদই হবে। সেখানে মাঠটা নির্জন। চল।

—কেন ?

—কথা আছে।

—কথা শেষ হয়ে গেছে নয়ন।

নয়ন অকপট হাসি হাসে। বলে…দূর, কথা কি শেষ হয় ? শোনো শ্যামা, আমার খুব একটা সময় নেই। বাবা বোধ হয় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা যাবে। মারা গেলে অনেক ঝামেলা। আমাকে দেরী করিও না। বলে নিই। চল।

শ্যামা মুখ ফিরিয়ে নেয়। নয়ন হাঁটতে থাকে।

শ্যামা তার পিছনে।

মাঠটা আজও ফাঁকা। রোদ পড়ে আছে।

—তোমার বাবার কী হয়েছে নয়ন ?

—সেরিব্রাল থ্রম্বসিস। আশা নেই।

—তাহলে তুমি এখানে কেন ? এখন তো তোমার বাড়িতে থাকাই উচিত।

—উচিত ! ঠিকই তো। কিন্তু তোমার জন্য একটা জিনিস বয়ে এনেছি অতদূর থেকে, না দেখিয়ে যাই কী করে ? তা ছাড়া, লাভ কী ? বাবার জ্ঞান নেই। জ্ঞান থাকলেও আমাকে তার কিছু বলার ছিল না, বা আমার কিছু শোনার ছিল না। আমরা এক বাড়িতে থাকতাম, এইমাত্র।

—তবু তুমি যাও। তোমার মায়েরও তো একজন সহায় চাই এ সময়ে !

—তুমি আমাকে যা হোক বলে তাড়াতে চাইছ শ্যামা। আমি তো বলছি, কাজ হলে যাব। আমার বাবার জন্য দুঃখ পেও না শ্যামা, আমি পাই না। যারা মরবার জন্য সব সময়ে প্রস্তুত থাকে তারা কাউকে মরতে দেখলেও স্থির থাকে। স্বাভাবিক কাজকর্ম করে যায়।

শ্যামা শ্বাস ফেলে বলে…এ তো যে কেউ নয়। তোমার বাবা।

নয়ন একটু বিরক্ত হয়ে বলে…তুমি বড় সেকেলে শ্যামা। বাবা বাবা বাবা ! বাবা তো কী ? বাবা তো একটা লোকের সঙ্গে সম্পর্ক চিহ্নিত-করণের অভিধা মাত্র। তার বেশী কিছু নয়। তাই কেউ বাবা তুলে গাল

দিলে আমার কোন রি-অ্যাকশন হয় না।

নয়ন নীচু হয়ে চাদরের গিঁট খুলল। ঝাঁপিটা বের করে ঘাসের ওপর রাখল সযত্নে। শ্যামার দিকে চেয়ে হাসল।

শ্যামা ঝাঁপিটা দেখে। অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। নয়ন পকেট থেকে চামড়ার দস্তানা বের করে দু হাতে পরে নিল।

—ওটাতে কী আছে নয়ন ?

নয়ন খুব খুশীর হাসি হাসল…সাপ। একটা গোখরো সাপ শ্যামা।

বলেই চকিতে ঝাঁপির ঢাকনাটা তুলে নিল।

কপিশ একটা শরীর পাকে পাকে জড়িয়ে আছে। গায়ের ঝকঝকে আঁশে রোদ চলকে ওঠে।

শ্যামা দু পা পিছিয়ে আসে…নয়ন। বলে আর্তস্বরে ডাকে।

—ভয় নেই শ্যামা।

শ্যামা এক অদ্ভুত চোখে নয়নের দিকে তাকায়। পরমুহূর্তে সাপটার দিকে।

—তুমি পাগল।

সাপটা একটু অনড় রইল। তারপর আস্তে তার পিচ্ছিল শরীর পাক ছাড়তে থাকে। ঝাঁপির কাণার ওপর দিয়ে মুখ বের করে। তারপর হড় হড় করে নেমে আসতে থাকে ঘাসে, মাটিতে। আসছে তো আসছেই, শরীরের যেন তার শেষ নেই।

শ্যামা একটা চাপা চীৎকার করে প্রথমটায় মুখ ঢাকল, তারপর হঠাৎ ঘুরে দৌড়তে লাগল। কিন্তু পারল না। অভ্যেস নেই তার ওপর শাড়ি জড়িয়ে যাচ্ছে পায়ে।

নয়ন দৌড়ে এসে তার বাঁ হাত চেপে ধরে বলে…দোহাই, ভয় পেও না। আমি তো আছি। দেখ…

বলে তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে নয়ন দৌড়ে ফিরে গেল। সাপটা ততক্ষণে সর সর করে দেয়ালের ইঁটের খাঁজের দিকে অনেকটা চলে গেছে! নয়ন দৌড়ে গিয়ে দস্তানা পরা আনাড়ী হাতে সাপটার ঘাড় চেপে তুলে আনল। লকলকে সাপটা মুহূর্তে মুখ ঘুরিয়ে ছোবল দিতে চেষ্টা করে। একটুর জন্য পারল না। নয়ন ঝাঁকি দিয়ে সেটাকে নির্জীব করে দিয়েছে।

শ্যামার দিকে চেয়ে নয়ন হাসে…বিষদাঁত নেই।

শ্যামা বিশাল চোখে চেয়ে থাকে।

আর সেই চোখ দুখানা মুগ্ধ হয়ে দেখে নয়ন। ঠিক এরকমটাই সে চেয়ে এসেছে এতকাল। এরকম বিস্ময় মাখানো মুগ্ধ চোখে শ্যামা তাকে চেয়ে দেখবে।

ঝাঁপির ভিতরে মুখটা ঢোকাতেই সাপটা আপনা থেকেই অভ্যস্ত পাকে জড়িয়ে নিঃঝুম হয়ে যায়। ঝাঁপিটার ঢাকনা বন্ধ করে দিল নয়ন।

—কাল সারারাত ধরে ওটাকে নিয়ে প্র্যাকটিস করেছি। শিখে যাব শ্যামা।

শ্যামা অনেকক্ষণ কথা বলতে পারে না। তারপর জিজ্ঞেস করে··· কী শিখে যাবে ?

—ধরা। কিছু না। জগদীশ খুব চাল নিল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা একদম সোজা।

—জগদীশ কে ?

—একজন। সাপ ধরে। ওস্তাদ লোক, কিন্তু শেখাতে চায় না।

—তুমি সাপ ধরতে শিখছ ? কেন ?

—তোমার জন্য।

শ্যামা বিস্ময়ে চোখ বড় করে বলে···আমার জন্য ?

—তোমার জন্যই। তোমাকে চমকে দেব বলে। দিই নি ?

শ্যামা শ্বাস ছেড়ে বলল···দিয়েছ। অনেকদিন আমি এমন চমকাই নি।

শিশুর মত খুশীতে হাসে নয়ন। ওর রগ-ওঠা, চোখ-বসা মুখখানা স্নিগ্ধ হয়ে যায়। তার মাথার চুলে এখনও সবুজ পাতাটা লেগে আছে। সে আস্তে করে বলে···শ্যামা, আমি সব পারি। সব।

—নয়ন, তুমি বাড়ি যাও।

—কেন ?

—তোমার বাবার কাছে যাও।

নয়ন একটু চমকে বলে···ওঃ ভুলেই গিয়েছিলাম ! যাচ্ছি শ্যামা।

বলে তাড়াতাড়ি চাদরটা দিয়ে ঝাঁপি বাঁধে নয়ন। বাঁধতে বাঁধতেই মুখটা তুলে বলে—শ্যামা, তুমি ঠিক যেমন চাও আমি ঠিক তেমনটি হব। দেখে নিও। আমাকে সময় দাও শুধু।

শ্যামার একটু মায়া হয়। আবার ভয়ও। সেই পুরোনো কথা

নয়ন আজও বলে যাচ্ছে।

সাপটাকে কোথাও ছেড়ে দিও নয়ন।

নয়ন একটু হাসে…কেন শ্যামা? আমার জন্য ভয় পাচ্ছ?

—পাচ্ছি।

—ওটার বিষদাঁত নেই।

—গজাবে।

নয়ন একটু ভ্রূ কুঁচকে ভাবে, তারপর বলে—তখন দেখা যাবে।

শ্যামা আস্তে করে বলে—নয়ন, এরকম পাগলামী করছ কেন? আমাকে চমকে দেওয়ার জন্য এতটা করার কোন মানে হয় না।

নয়ন হি-হি করে হাসে…এবার যদি আমাকে বিয়ে না কর শ্যামা, তবে একদিন তোমার ঘরে এটা চুপ করে ছেড়ে দিয়ে আসব।

—তা হয় না নয়ন।

—কী হয় না?

—তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে।

—কেন?

—আমি তোমাকে ভালবাসি না।

—সে কথা অনেকবার শুনেছি। কিন্তু তোমাকে বাসতেই হবে।

—কাঙালপণা করতে তোমার ঘেন্না হয় না?

তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে শ্যামা মনস্থির করে বলে—নয়ন, আমি আর একজনকে ভালবাসি।

নয়ন চমকে যায়। চেয়ে থাকে। শ্যামা অস্বস্তি বোধ করে চোখ সরিয়ে নেয়।

নয়ন অবাক গলায় বলে—শ্যামা, এরকম কথা আগে কখনও বল নি। তোমার অনেক ফ্যান, বহু ছেলে ঘুরেছে তোমার পিছনে, কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে।

—নয়ন, আমি সত্যি বলছি।

—লোকটা কে?

—তুমি চিনবে না, সে দূরের লোক।

—তবু শুনি। কী করে সে?

—ডাক্তার।

—ডাক্তার? নয়ন শুকনো জিব ঠোঁট দিয়ে চাটে। তারপর আকুল

গলায় বলে—কয়েকটা বছর সময় আমাকে দাও শ্যামা, আমি ডাক্তারী পাস করব। একবারে পাস করব। দিনরাত পড়ব।

—আমি ডাক্তারটাকে ভালবাসি না। মানুষটাকে।

—সে কেমন মানুষ বল। আমি হুবহু তার মত হব।

শ্যামা ম্লান হাসে একটু। বলে—বাড়ি যাও নয়ন। বাবার কাছে যাও। সাপের ঝাঁপিটা হাতে নয়ন দাঁড়িয়ে আছে, দৃশ্যটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় শ্যামা। তারপর হাঁটতে থাকে।

নয়ন পিছু নেয় না। দাঁড়িয়ে থাকে। তার হাতের ঝাঁপিটার ভিতরে মৃদু একটা শ্বাসের শব্দ হয়।

উকিলবাবুর জ্ঞান আর ফেরে নি।

সাপের ঝুঁড়ি ঝোলায় নিয়ে যখন ফিরল নয়ন তখন বেলা এগারোটা। বাড়ির সামনে কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে! ফুল এবং মালা হাতে কয়েকজনকে দেখা গেল। বাড়িটা খুব নিস্তব্ধ। কেবল ওপরতলায় মা শ্বাসকষ্টের সঙ্গে লড়াই করে একরকম কান্নার শব্দ বের করছে মাঝে মাঝে।

নয়ন শান্তভাবে তার ঘরে চলে গেল। সাপের ঝুড়িটা সাবধানে রাখল খাটের নীচে, একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপ করে বিছানায় পড়ে রইল একটুক্ষণ। কিছুক্ষণ সে তার বাবার মুখটা ভাববার চেষ্টা করল। পারল না। হাল ছেড়ে সে শ্যামার মুখটা ভাববার চেষ্টা করল। আশ্চর্য, তাও পরিষ্কার মনে পড়ল না। শ্যামার বদলে নার্স মেয়েটির মুখখানা ভেসে উঠল চোখে। একটু হাসে নয়ন। ঘুমহীন চোখজোড়া জ্বালা করে। সিগারেটের ধোঁয়া উড়ে আসে চোখে। চোখ বোজে। তারপর ক্লান্তিকর ঘুমের কথা ভাবে কাঙাল নয়ন। সে কবে একটু ঘুমোবে সোনেরিল না খেয়ে?

চাকরবাকররা উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। ডাকতে সাহস পায় না কেউ। নয়ন আধবোজা চোখে দরজার পর্দায় কয়েকটা ছায়ার আনাগোনা দেখল। তারপর উঠল ধীরে-সুস্থে। একবার ওপরে যাওয়া দরকার। শ্মশানেও যেতে হবে। এ সময়টায় সে কলকাতায় না থাকলেই ভাল হত।

ঠাকুরটা ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে। খবরটা নয়নকে দেওয়ার জন্য চোখমুখ উদ্‌গ্রীব। সব মানুষেরই এই একটা দুর্বলতা থাকে, খবরটা

ভাল হোক বা মন্দ হোক, সবার আগে যে খবরটা পেঁছে দিয়ে সে এক-ধরনের তৃপ্তি বোধ করে। যেন একটা কম্পিটিশনে জিতে গেছে। ঠাকুরটার মুখে চোখেও সেইরকম উত্তেজিত ভাব। নয়ন বেরোতেই সে কাছে এসে বলে—বাবু, বড়বাবু নেই—

নয়ন একটু বিস্ময়ের ভাণ করে বলে—নেই ? কোথায় বেরিয়েছে ? এত বেলায় ?

চাকরটা খাওয়ার টেবিলে ন্যাতা বোলাচ্ছিল। আসলে ন্যাতা বোলানোটা কাজ নয়, নিজেকে মোতায়েন রেখেছে ঐখানে, নয়ন বেরোলে খবরটা দেবে, কিন্তু নয়নের কথা শুনে চালাক চাকরটা ফিক করে একটু হেসে সামলে গেল, বলল—বেরোন নি। মারা গেলেন একটু আগে।

নয়ন গম্ভীর চোখে চাকরটাকে একটু দেখল। ভয়ে সিঁটিয়ে গেল চাকরটা।

নয়ন ঠাকুরকে ডেকে বলে দিল—আমার ঘরে এর মধ্যে কেউ যেন ঝাঁট-ফাঁট দিতে না যায়, দেখিস। ঘরে আমি একটা গোখরো সাপ পুষছি। কেউ যদি ঢোকে টের পাই তবে জুতিয়ে কিন্তু বাড়ি থেকে বের করে দেব।

ঠাকুরটা সভয়ে ঘাড় নাড়ে।

নয়ন সিঁড়ি বেয়ে ওঠে। অনেক লোক জমেছে ওপরতলায়। বার লাইব্রেরী থেকে তার বাবার বন্ধুরা এসেছে, মক্কেল এসেছে, আর আত্মীয়-স্বজন। ফুল আর ধূপকাঠির গন্ধে টেঁকা যায় না। নয়নকে দেখে মা আর একবার শ্বাসকষ্ট চেপে কাঁদবার চেষ্টা করে। কিন্তু তেমন কোন শব্দ হয় না। দু একজন বুড়ো বয়স্ক আত্মীয় নয়নকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসে অনিচ্ছার সঙ্গে। তারা নয়নকে চেনে। দু একটা কথা বলে তারা চুপ করে যায়, বৃথা জেনে।

কিন্তু নয়নের মুখে একটা বিষাদের ভাব ফুটে ছিল ঠিকই, সে তার ক্লান্তির জন্য। ঘুমহীন জ্বালাধরা চোখের কোলে কালি, ভাঙা মুখে শিরা-উপশিরা, পিঙ্গল এলোমেলো ধুলোটে চুল। নার্স মেয়েটা খাটে শোয়ানো দেহটার মাথা এবং বুক জুড়ে বার লাইব্রেরী থেকে পাঠানো একটা প্রকাণ্ড লরেল মালা সাজিয়ে রেখে নয়নের কাছে এগিয়ে এল। বলল···আপনি খুব ভেঙে পড়েছেন।

নয়ন একটু হাসতে গিয়ে হাসল না। বলল—মাথাটা বড্ড ধরেছে।

আপনার কাছে অ্যাসপিরিন বা ঐরকম কিছু আছে ?

—না। আমি ওসব রাখি না।

—তবে কী আছে ?

মেয়েটা একটু ইতস্ততঃ করে বলে—কী চাই বলুন, কাউকে ডেকে আনিয়ে দিই।

নয়ন একঘর লোকের চোখের সামনেই মেয়েটির দিকে স্থির তাকিয়ে থেকে বলল—অ্যাসপিরিন না থাক, ক্লোরোফিল বা ক্যালসিয়াম বা ভিটামিন, কিছু নেই ? নাথিং ?

মেয়েটা বোবার মত ঘাড় নাড়ে।

নয়ন দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলে বলে—শ্মশান পর্যন্ত হেঁটে যেতে আমার খুব কষ্ট হবে !

মেয়েটা চুপ করে থাকে।

নয়ন নির্ভাবনায় বলে—কেন কষ্ট হবে জানেন ? শ্মশানে যাওয়ার সময়ে কেউ আজ কথা বলবে না। একটা ট্র্যাজিক ব্যাপার তো। কিন্তু অতদূর রাস্তা চুপ করে মুখ বুজে যাওয়া ভারী কষ্টের। আমি এখন অনেক কথা বলতে চাই।

মেয়েটার চোখে মুখে ক্রমশঃ একটা ভয়ের ভাব ফুটে ওঠে। নয়ন তা লক্ষ্য করে। আস্তে করে বলে—আপনি যাবেন না শ্মশানে ?

—আমি ! আমি কেন যাব ?

—গেলে দোষ কী ? আমি বরং একটা গাড়ির বন্দোবস্ত করি। ডেডবডি নিয়ে শ্মশানবন্ধুরা যাবে। আমরা ঘুর পথে অন্য রাস্তায় গাড়ি নিয়ে যাব। শ্মশানে যাচ্ছি বলে মনেও হবে না, গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। চলুন না।

—না। মেয়েটা মাথা নাড়ল। তারপর খাটের কাছে ফিরে গেল আবার।

ফ্ল্যাশলাইট লাগানো ক্যামেরা হাতে দুজন লোককে ঘরে ঢুকতে দেখে বিরক্ত হয়ে নয়ন বারান্দায় বেরিয়ে এল। মরেই গেছে লোকটা, তবু তার ছবি কেন যে তুলে রাখে মানুষ ! মরা মানুষের ছবিতে মানুষটা চিরকাল মৃতই থেকে যাবে।

বারান্দায় বাতাস আর রোদ খেলা করছে। রেলিং-এ দুটো চড়াই। 'কিচিক কিচিক' শব্দ করে লাফিয়ে তারা পরস্পরের কাছে আসছে। খেলছে। অন্যমনেই নয়ন আপনা থেকেই শব্দটা গলায় তুলে আনল।

ডাকতে লাগল'—কিচিক্—চি-র্-র্-র্—কিচিক্—'

শ্মশান থেকে ফিরতে রাত হয়ে গেল। নয়ন স্নান করে নি। আদি-গঙ্গার এক হাঁটু কাদায় নেমে এক কোষ ময়লা জল তুলে মাথায় চাপিয়েছিল। ফেরার সময়ে ইচ্ছে করেই দলছুট হয়ে একা একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে এক কাপ চা আর গোটা কয়েক সিঙ্গাড়া খেল। তাতেই বুক জুড়ে অম্বল উঠল ঠেলে। শরীরটায় একটা জ্বালাভাব। সারাটা দিনের রোদ, চিতার আঁচ, ধোঁয়া—সব মিলিয়ে চড়চড় করছে গায়ের চামড়া।

বাড়িতে ফিরে অনেকক্ষণ ধরে ঠাণ্ডা জলে স্নান করে নয়ন। কোরা কাপড় পরে খাওয়ার ঘরে এসে দেখে নার্স মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। হাতে ক্যাম্বিসের একটা ব্যাগ, চুল আঁচড়ানো, পায়ে চটি।

—চলে যাচ্ছেন? নয়ন জিজ্ঞেস করে।

মেয়েটি সামান্য একটু হাসে, বলে—যাচ্ছি। তবে আপনার মায়েরও নার্সিং দরকার, তাই কাল সকালে আবার আসব।

নয়ন হাই তুলে বলে—রাতে নার্সিংয়ের দরকার হয় না বুঝি?

—হবে না কেন? রাতের শিফ্‌টের নার্স এসে গেছে। বলে মেয়েটি হাসল, তারপর নয়নকে ভীষণ চমকে দিয়ে বলল—এই নার্সটি কিন্তু বেশ সুন্দর দেখতে।

নয়ন একটু বোকা বনে গিয়েছিল। এতটা আশা করে নি। একটু থমকে গিয়ে বলে—আচ্ছা!

মেয়েটা চলে যায়।

ঘরে এসে নয়ন কয়েকটা ঘুমের বড়ি গিলে পড়ে থাকে।

তার বাবা কত টাকা রেখে গেছে তার হিসেব নয়ন রাখে না। তবে, অনেক টাকা, অনেক। নয়নের বাকী জীবনটা কিছু না করলেও এসে যাবে না। তার বাবা ছিলেন উকিল মানুষ। আয়কর ফাঁকি দিতে ওস্তাদ লোক। ব্যাংকের লকার, মায়ের গয়না, লুকোন টাকা—সব কিছুর হিসেব নয়ন বোধ হয় কোনদিনই বের করতে পারবে না। কলকাতায় আরো একটা বাড়ি আছে তাদের, হাজারখানেক টাকা ভাড়া পাওয়া যায়। বাবা মাঝে মাঝে শাসিয়ে বলত বটে, সব সম্পত্তি উইল করে ভারত সেবাশ্রম সংঘকে দিয়ে যাবে, কিন্তু বাস্তবিক সেটা করার মত যথেষ্ট মানসিক জোর তার ছিল না। নয়ন জানে, তার বাবা তাকেই সব দিয়ে গেছে।

তার এক দাদা আছে। দীর্ঘকাল আগে সেই দাদা আপন পিসতুতো বোনকে বিয়ে করেছিল ভালবেসে, বাবা তাই তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিল। সে দাদা বাইরে ভাল চাকরি করে। তাকেও শেষ পর্যন্ত বাবা কিছু দিয়ে গেছে কিনা কে জানে। সেই দাদা হয়তো কিছু দাবী-দাওয়া করতে পারে। করুক, নয়নের তাতে কিছু যায় আসে না, সে যে নিজে বেশ কিছু টাকা পয়সা হাতে পাবে, এই খবরটাই যথেষ্ট।

ভাবতে ভাবতে সোনেরিলের আচ্ছন্নতায় ডুবে যায় নয়ন। তারপর স্বপ্ন দেখে। মোনা ঠাকুরের কালীমূর্তি জ্যান্ত হয়ে ছুঁচে সুতো পরাচ্ছে। জগদীশকেও দেখা যায়, মাফলারের বদলে গলায় এক গাদা সাপ জড়িয়ে খুব কাশছে। এমনি পাগলাটে খ্যাপাটে সব স্বপ্ন।

সোনেরিলের ঘুম নয়নের বেশীক্ষণ থাকে না। ওষুধটা তাকে আজকাল আর তেমন ধরছে না! রোজ খায় বলেই বোধ হয়। মাঝরাতে নয়নের ঘুম ভাঙল। ঘরের বাতিটা জ্বলছে, পায়ের দিককার জানালা খোলা। ভীষণ ঠাণ্ডা আসছে। বিছানার চাদর তুলে নয়ন মুড়ি দিয়ে বসে সিগারেট খেল। রাতটাই অসহ্য, কিছু করার থাকে না।

জানালাটা বন্ধ করে নয়ন সাপের ঝুড়িটা বের করে। দুহাতে চামড়ার দস্তানা পরে ঢাকনাটা খোলে। সাপটা ঘুমোচ্ছে। দেখে নয়ন ভারী হিংসে বোধ করে। সাপটাকে খোঁচাতে আঙুল উঁচিয়েছিল নয়ন। তারপর আবার সাবধানে ঢাকনাটা চাপা দিয়ে ঝুড়িটা খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিল! কিছুক্ষণ পায়চারী করল। তারপর একঘেয়ে এই জেগে থাকা থেকে মুক্তি পেতে সোনেরিলের কৌটোটা টেবিলের ওপর খুঁজতে লাগল। আর হঠাৎ তখনই মনে পড়ল, নার্স মেয়েটি বলে গিয়েছিল, রাতের শিফটের নার্স দেখতে সুন্দর। মনে পড়তেই নয়ন আপনমনে একটু হাসে।

সিঁড়ি বেয়ে বেড়ালের মতই নিঃশব্দে উঠে আসে নয়ন। মায়ের ঘরের দরজা বন্ধ। সে মৃদু টোকা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে মিহি মেয়ে গলার প্রশ্ন আসে—কে?

—দরজাটা খুলুন।

পায়ের শব্দ ভিতরে দরজার কাছে আসে। নয়ন উত্তেজনা বোধ করে।

—আপনি কে? প্রশ্ন আসে।

—আমি নয়ন।

—নয়ন কে, আমি চিনি না।

—এ বাড়ির ছেলে। আমার মাকে দেখতে এসেছি।

—ও!

পরমুহূর্তেই ছিটকিনির শব্দ। দরজা খুলে যায়।

সুন্দর! না, মোটেই না। ভারী হতাশ হয় নয়ন। বড্ড রোগা মেয়েটি। গায়ের রং ফ্যাকাশে। দেখলেই বোঝা যায়, মেয়েলী রোগে ভোগে। ম্যাল নিউট্রিশন। ক্যালোরি খায় না। প্রোটীন নেই। ভিটামিন সি-এর অভাব। তবু মেয়ে।

মেয়েটি দরজা ছেড়ে দিয়ে বলে—উনি ঘুমোচ্ছেন।

—কে? নয়ন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে।

আপনার মা। আপনি তো মাকে দেখতেই এসেছেন!

—ওঃ, হ্যাঁ। থাক, ঘুমোচ্ছে যখন ঘুমোক।

—চিন্তা নেই। উনি সামলে উঠেছেন।

নয়ন হাসল। বলল—আসলে আমার বাবা আর মার মধ্যে রিলে-শনটা তেমন ভাল ছিল না। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারত না।

মেয়েটা কথা বলল না। অপ্রস্তুতভাবে চুপ করে রইল।

নয়ন জিজ্ঞেস করে—আপনি কী করছেন?

—তেমন কিছু না। অ্যালার্ট থাকছি, যদি কিছু দরকার হয়।

—বোরিং লাগছে না?

—আমার অভ্যাস আছে।

—তা তো আছেই। তবু বড় একঘেয়ে! আমারও ভীষণ ইনসোমু-নিয়া। একা জেগে থাকতে যে কী কষ্ট!

মেয়েটা চুপ করে থাকে।

নয়ন বলে—চা খাবেন?

—চা?

—চা। আমি নিজে করব, তারপর দুজনে গল্প করতে করতে খাব। আসুন না নীচের খাওয়ার ঘরে।

মেয়েটা ইতস্ততঃ করে।

নয়ন মৃদুস্বরে বলে—মা নিশ্চয়ই ট্র্যাংকুইলাইজার খেয়ে ঘুমোচ্ছে?

—না। ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়েছি।

—তবে জাগবে না। নিশ্চিন্তে আসুন।

নয়ন পিছু ফিরে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চটপট সিঁড়ি ভেঙে নীচে আসে। চায়ের সরঞ্জাম সাজানোই থাকে খাওয়ার ঘরে নয়নের। জন্য ঘুম-হীন রাতে সে উঠে কখনও কখনও চা করে খায়। দু কাপ জল চাপিয়ে নয়ন খাওয়ার টেবিলে এসে বসতে না বসতেই মেয়েটি এল। মায়ের ঘরের অল্প আলোতে স্পষ্ট দেখা যায় নি। এখন দেখল নয়ন, মেয়েটির মুখশ্রী খুব খারাপ নয়। দাঁতগুলো একটু উঁচু, নাক ভোঁতা, তবে চোখ দুখানা ভালই। সিঁথিটায় সিঁদুর থাকতে পারে, নয়ন সেটা নিয়ে মাথা ঘামায় না। মেয়েটি অবাক চোখে নয়নকে দেখছে। হয়তো ভয় পাচ্ছে। যে লোকটার বাবা আজ সকালে মারা গেছে তার এমন সহজ ভাব দেখেই হয়তো বিস্ময়।

নয়ন চায়ে চামচ নাড়তে নাড়তে মেয়েটির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে হাসে বলে—বাবার সঙ্গে আমার রিলেশনও ভাল ছিল না। উই ওয়্যার মিউচুয়াল এনিমিজ্।

মেয়েটা চুপ করে থাকে। কী বলবে ভেবে ঠিক করতে পারে না।

নয়ন বলে—কিন্তু তবু বাবার কয়েক লাখ টাকা আমিই পাব।

মেয়েটা ভ্রু তুলে সামান্য কৌতূহলের গলায় বলে—কয় লাখ?

নয়ন ঠোঁট ওল্টায়—কে জানে! বিশ ত্রিশ লাখ হতে পারে। দশ বারো লাখও হতে পারে। বাবার অঢেল ব্ল্যাক মানি ছিল।

—টাকাটা পেয়ে কী করবেন? নয়ন চায়ের কাপ নিয়ে মুখোমুখি বসতেই মেয়েটি জিজ্ঞেস করল।

—কী করব! কী আবার, ওড়াব।

—ওড়াবেন মানে? ওড়াবেন কেন?

—অত টাকা নিয়ে আর কী করা যায়। চাকরি করব না, ব্যবসা করব না, কিচ্ছু করার দরকারও হবে না। ব্যক্তিগতভাবে আমার বেকার সমস্যা নেই। আমার সমস্যা সময় নিয়ে। আয়ুর লম্বা সময় জেগে থেকে কাটিয়ে দিতে হলে টাকা ওড়ানো ছাড়া কী করা যাবে!

মেয়েটা ঠিক বুঝল না, একটু সময় নিয়ে বলল—জেগে থেকে কেন বলছেন?

—আমার ইনসোম্নিয়া। বড্ড কষ্ট। ঘুম হয় না। সেই নির্ঘুম সময়টায় আমি চলে যাব রাতের ক্লাবে—যেখানে সারা রাত নাচ গান হয়। একটা গাড়ি কিনে সারা রাত ধরে চালাব রাস্তায় রাস্তায়। মাইনে করা

লোক রাখব যারা সারা রাত আমার সঙ্গে জেগে থেকে তাস দাবা খেলবে, গল্প করবে। একটা প্রোজেক্টার মেশিন কিনে সারা রাত ফিল্ম্ ঘুরিয়ে ছবি দেখব। সোনেরিলে আজকাল আর ঘুম তেমন হয় না। সব ওষুধেরই ইম্মিউনিটি আছে। ভয় হয়, এর পর আর ঘুমের ওষুধে কাজই হবে না। সারাটা জীবন জেগে থাকতে হবে।

মেয়েটা ডান গালে একটা আঙুল ছুইয়ে বসে তাকিয়ে আছে। খুব অবাকদৃষ্টি। একটুও ঠাট্টার ভাব নেই মুখে। সিরিয়াস ধরনের মেয়ে। অনেকক্ষণ ধরে ভেবে বলল—অনেক সময় সেরেও যায়।

—কি রকম? নয়ন কৃত্রিম আগ্রহ দেখায়।

—একটা মেয়েকে চিনতাম যে ঘুমতো না বলে তার স্বামী তাকে সেতার কিনে দেয়। সারা রাত ধরে মেয়েটা আলাদা একটা ঘরে বসে সেতার বাজিয়ে সময় কাটাত। প্রথমে টুংটাং করতে করতে আস্তে আস্তে সে সুর বুঝতে শেখে। সেতারের প্রাণটাও সে একদিন ধরতে পারে। সারা রাত ধরে সে সেতারে ডুবে থাকতে শিখল। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে সে সেতারের শব্দ পার হয়ে সুরের নিস্তব্ধ জগতে পেঁছে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে সে সেতার থামিয়ে চুপ করে ঝুম্ হয়ে বসে থাকত। সে আমাকে বলছিলে, ঐ ভাবে বসে থেকে সে এক নিস্তব্ধতার সুর শুনতে পেত। শুনতে শুনতে একদিন সে অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

—নয়ন হাসল—এ তো গল্প।

—গল্প নয়। তবে গল্পের মতই। মেয়েটা সেরে গেছে।

—সত্যি?

—সত্যি।

টেবিলের ওপরের মসৃণ খয়েরী সানমাইকায় ধীর গতিতে নয়নের হাত এগিয়ে যায়। নয়ন লোল হেসে বলে—আমি যাকে বিয়ে করব তার সঙ্গে আমার একটা শর্ত হবে।

—কী শর্ত?

—সারা রাত তাকে জেগে থাকতে হবে। দিনের বেলায় সে যত খুশী ঘুমিয়ে নিক, কিন্তু রাতে, রোজ রাতে আমাদের বাসর জাগা। কেউ বোধ হয় রাজী হবে না। না?

—হতে পারে।

—কে হবে! আমি জানি মেয়েরা রাত বারোটার বেশী জাগতে

ভালবাসে না। তারা বড় ঘুমকাতুরে।

বলতে বলতে নয়ন হাত বাড়ায়। মেয়েটা একটা হাতে মাথার ভর রেখে হেলে বসেছে। নয়ন ভঙ্গীটা দেখল। চওড়া টেবিল প্রায় অতিক্রম করেছে তার হাত। সে হাতখানা তোলে ফণার মত।

—আপনি পারেন না?

—কী? মেয়েটা চমকে ওঠে বলে।

ঝপ করে ছোবল দেয় নয়নের হাত। উত্তপ্ত ব্যাকুল হাতে মুঠো করে ধরে একরাশ বকুলের মত নরম করতল। পিষে ফেলে নির্যাস নিংড়ে নিতে নিতে বিকৃত ভয়াল গলায় বলে—আমার সঙ্গে জেগে থাকতে। রোজ। পারেন না?

লক্ষপতির সঙ্গে জেগে থাকতে কোন মেয়ে রাজী নয়? এ মেয়েটিও হয়তো রাজী হত। কিন্তু নয়নেরই দোষ। সে যা চায় তার জন্য সময় দেয় না। মেয়েটা 'ছাড়ুন ছাড়ুন' বলে চাপা গলায় চীৎকার করে হাত ছাড়িয়ে নেয়। হাঁফায়। চেয়ার টেবিলের ঘোর শব্দ ওঠে নিশুত রাতে। চাকর বাকর জেগে যাবে। তাই নয়ন আর চেষ্টা করে না। মেয়েটা দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায়।

নয়ন ঘরে গিয়ে সাপের ঝুড়িটা টেনে আনে। ঝাঁপি খুলে দস্তানা পরা হাত এগিয়ে টেনে তোলে সাপটাকে। মুখোমুখি ভয়ঙ্কর দুজন দুজনের দিকে তাকায়। তারপর শুরু হল আক্রমণ এবং প্রতি আক্রমণ। রাত ভোর হয়ে আসে।

দিনের বেলায় আবার চমৎকার বোধ করে নয়ন। ঘুমের জন্য তার একটুও দুঃখ হয় না। শরীরটা হাল্কা লাগে। চায়ের সঙ্গে গোটা দুই অ্যাসপিরিন গিলবার পনেরো মিনিট পর অধিকপালে মাথা ধরাটাও ছেড়ে গেল।

খবরের কাগজ অনেকদিন দেখা হয় নি। আজ খাওয়ার টেবিলের ওপর কাগজটা পড়ে আছে দেখে তুলে নিল। বরাবর সে খেলার পাতাটা আগে দেখে। খুলে দেখল, দলীপ ট্রফির একটা আঞ্চলিক খেলা চলছে ইডেনে। আজ দ্বিতীয় দিন।

কিছু না ভেবেই নয়ন পোশাক পাল্টাল। জলপাই রঙের প্যাণ্ট, লাল জামা, গলায় রঙীন সিল্কের মাফলার, চওড়া বেল্ট, চোখে রোদ-চশমা। বেরিয়ে সে মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট কিনল। দোকানের আয়নায়

নিজের ধারাল চেহারাটা দেখল একটু। দেখতে দেখতে শিস্ দিল। দুহাতে চুলগুলো চেপে ঠিক করে নিচ্ছিল, সে সময়ে লক্ষ্য করল দোকানদার মহাদেব তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তেই মহাদেব বলল—বাবু, কাল তো বড়বাবু মারা গেলেন।

—হ্যাঁ মহাদেব। আফশোষের ব্যাপার। নয়ন গলায় যথেষ্ট দুঃখ ফোটাতে চেষ্টা করে!

—তো ইটা আপনার কী পোশাক হল? ই সময়ে কেউ প্যাণ্ট শার্ট পরে? নোতুন কাপড় পরে তো!

ঝাঁৎ করে ভুলটা ধরতে পারে নয়ন। কখন যে বে-খেয়ালে কোরা কাপড়টা ছেড়ে অভ্যাসবশতঃ রোজকার মত প্যাণ্ট শার্ট পরেছে তা বুঝতেই পারে নি। ভুল হয়ে গেছে বড়। পাড়ার চেনা লোকেরা অবশ্যই দেখেছে নয়নকে এই পোশাকে! নয়ন জিভ কাটল।

ভুলটা শোধরাতে নয়ন তাড়াতাড়ি পাড়ার রাস্তাটা হেঁটে পার হয়ে আসে। অচেনা মানুষজনের মধ্যে এসে স্বস্তি বোধ করে। ট্যাক্সি ধরে বড় রাস্তায়। শোকের পোশাকটা ভুল করে ছেড়ে ফেলেছে ঠিকই। তবু ট্যাক্সিতে বসে ভুলটার জন্য আবার ভালই বোধ করতে থাকে সে। একজনের মৃত্যুর ঘটনা আর একজনের পোশাকে বিজ্ঞাপনের মত ঝুলিয়ে রাখার মানে হয় না। নয়নের মুখে তো লেখা নেই যে গতকাল তার বাবা মারা গেছে! স্বাভাবিক পোশাকে সে বরং বেশ সহজ বোধ করতে থাকে।

মাঠে সে সাইট স্ক্রীনের পাশে গ্যালারিতে উঠে বসে। বেশ ভীড়। ভীড়ে কেউ কারও চেনা নয়। নয়ন অলস ভঙ্গীতে বসে খেলা দেখে।

ইস্ট্ জোন্-এর সাত নম্বর খেলোয়াড় সেঞ্চুরী করবে বলে কেউ ভাবে নি।—কিন্তু সারাটা সকাল ঠুকে ঠুকে খেলে নব্বুইয়ে যখন পেঁছে গেল তখনই প্রথম খেলাটায় কিছু উত্তেজনা বোধ করে নয়ন। একটু ঝুঁকে বসে। ছেলেটা একটা ওভার মেডেন দিল। তারপর পর পর দুটো চার মেরে এবং একটা রান নিয়ে পেঁছোল নিরানব্বইয়ে। সারা মাঠে উত্তেজনা, চীৎকার। শক্ত পাল্লার সাউথ জোনের সঙ্গে এমন হাড্ডাহাড্ডি ব্যাটিং কেউ আশা করে নি। নয়ন উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে চেঁচিয়ে বলল—রান—ওঃ একটা রান—

—বসে পড়ুন—পেছন থেকে কে চেঁচাল। তারপর জামা ধরে

টানল নয়নের। নয়ন শুধু গায়ে পড়া আরশোলা ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গীতে পিছনে হাত নিয়ে অচেনা হাতটা ঝেড়ে ফেলল।

লাঞ্চের আগে শেষ ওভার। পাঁচটা বল পাঁচটা বোমার মত। সাত নম্বর ব্যাটস্‌ম্যান মাঠের চীৎকার শুনে ঘাবড়ে গেছে। স্কোরবোর্ডটা দেখে নিয়ে পর পর পাঁচটা বল ঠেকিয়ে দিল আড়ষ্ট ভঙ্গীতে। খেলছে না। পারছে না।

—ওঃ, একটা রান! নয়ন চেঁচায়। তার দেখাদেখি আশপাশের হাজার জন গ্যালারীতে উঠে দাঁড়াতে থাকে! 'বসে পড়ুন' চীৎকার করতে করতে বসা লোকেরা দাঁড়িয়ে ওঠে। মাঠের মাঝখানে একটা রানের জন্য-প্রার্থনারত ছেলেটা ছয় নম্বর বলটা খেলতে পারল না। বোল্ড।

—খানকীর বাচ্চা! শালা! পাগলের মত চেঁচাল নয়ন মাথার চুল চেপে ধরে! তারপর আবার চেঁচাল—'ইয়ে' করগে বাঞ্চোৎ—

বাচ্চা একটা ছেলেকে নিয়ে এক বাবা সামনের বেঞ্চে বসে। ভদ্রলোক নয়নের দিকে বিরক্ত হয়ে তাকায়। নয়ন সঙ্গে সঙ্গে লোকটার চোখে তার নিজের চোখ ফেরত দেয়। লোকটা আস্তে আস্তে মাথা ঘুরিয়ে তার টিফিনের বাক্স খোলে।

লাঞ্চ।

নয়ন গ্যালারী থেকে অনেকটা নিচুতে চ্যানেলে লাফ দিয়ে নামে। আধকপালে মাথাধরাটা আবার শুরু হয়েছে! সারাক্ষণ মুখে রোদ, মাথায় উত্তেজনা, নাকে ধুলো। মাথা ধরতেই পারে।

গ্যালারীর নিচে ছায়া। বাঁশের বেড়া দেওয়া খাবারের দোকানে ভীড়। এক কাপ চায়ের জন্য নয়ন একটু ঘোরাঘুরি করল। কিন্তু শান্তভাবে, ঠেলাঠেলি না করে কোথাও চা পাওয়ার উপায় নেই। ক্ষিদে-তেষ্টায় পাগল হয়ে মানুষেরা হামলে পড়ছে।

কিন্তু নয়নের একটু চা বড় দরকার।

বাঁশের চৌখুপী ঘেরা দোকানটার কাছে গেল নয়ন। গায়ে গায়ে লোক দাঁড়িয়ে। হাজারটা হাত দোকানীর দিকে বাড়ানো। 'এই আমরটা—আমার এক কাপ চা, দুটো কাললেট' এই সব চীৎকারে একটা দাঙ্গার মত ভাব। মানুষেরা ক্ষেপে আছে। তপ্ত, শুষ্ক মানুষ। এক্ষুণি ফাটবে। বাইরের দোকানের চেয়ে দ্বিগুন দামের খাবার। আর চা—পয়সা বাড়িয়েও পাওয়া যাচ্ছে না! তিনটে পশ্চিমা দোকানদার

নাজেহাল হচ্ছে। দিশেহারার মত সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে।

নয়ন শান্তভাবে কনুই দিয়ে একটা মোটা মাড়োয়ারীকে সরিয়ে বাঁশের বেড়ার ধার ঘেঁষে দাঁড়াল। উঁচু কিন্তু ঠাণ্ডা গলায় বলল—এক ভাঁড় চা—

কথাটা কোথাও পেঁছোল না, যে লোকটা প্রকাণ্ড কেটলী থেকে চা ঢালছে সে নয়নের কাছ থেকে দু বিঘৎ দূরে মাত্র। নয়ন আবার আগের মতই চেঁচিয়ে বলল—চা···

লোকটা শুনল না। পিছন থেকে মাড়োয়ারীটা নয়নকে সরানোর চেষ্টা করছে শরীরটা ঠেলে সামনে এগিয়ে দিয়ে। নয়নের গলার স্বর ডুবে যাচ্ছে চারদিকের চীৎকারে।

নয়ন তৃতীয়বার বলল—চা—আ—আ—

তার বাড়ানো হাত শূন্যে রইল। মাথা ধরাটা ফিরে আসছে। বাড়ছে। মাথার ভিতরে চমকে উঠেছে রগ।

অনেক দিন আগে শিয়ালদায় বিনা টিকিটের যাত্রী বলে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের একটি ছাত্র ধরা পড়েছিল। সেই থেকে একটা ছাত্র হাঙ্গামার সূত্রপাত। নয়ন তখন হিন্দু স্কুলে শেষ ক্লাসে পড়ে। হাঙ্গামা শুনে বেরিয়ে এসেছিল। শিয়ালদার কাছে ছাত্ররা রাস্তা আটকে ট্রামে বাসে আগুন দিচ্ছে তখন। পুলিশ ছিল না। নয়ন তখন একদল ছাত্রের সঙ্গে ভিড়ে গেল। এগারোটা ট্রাম সারি সারি দাঁড়িয়ে। তার শেষ দুটোতে আগুন দিয়েছিল নয়ন। একাই লাফিয়ে উঠেছিল ট্রামে, যাত্রী-দের শাসিয়ে নেমে যেতে বলেছিল্ল। এক ভীড় লোক মেড়ার মত সুড় সুড় করে নেমে গেল। আর নয়ন ব্লেড দিয়ে সীটের খোসা ছাড়িয়ে ছোবড়া বের করে কেরোসিন ঢেলে দেশলাই জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তারপর বেনেটোলা লেনের মুখে দাঁড়িয়ে দেখেছিল—শিয়ালদার আকাশ কালো ধোঁয়ায় ঢেকে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়ে যাচ্ছে এগারোটা ট্রামগাড়ি।

সেই দৃশ্যটা হঠাৎ দেখতে পেল নয়ন।

আর একবার একটা ফিল্মের রিলিজের দিন ভারতীতে হাউসফুল। লবীতে বহু লোক দাঁড়িয়ে আছে টিকিট না পেয়ে। যদি কেউ বাড়তি টিকিট বিক্রী করে এই আশায়। সেই সময়ে একটি চশমাপরা ভালমানুষ মেয়ে টিকিট ফেরত এলে একরাশ লোক মেয়েটাকে ছেঁকে ধরে। প্রায় ত্রিশজনের ভীড়ের মধ্যে মেয়েটি দুটো টিকিট মুঠোয় ধরে কান চেপে

দাঁড়িয়ে অসহায় চোখে চেয়েছিল। কাকে টিকিট দেবে ঠিক করা তখন তার পক্ষে অসম্ভব। বহু লোক পাঁচ দশ টাকার নোট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে চীৎকার করছিল—'আমি দশ দেব', 'আমি পাঁচ', 'আমি আগে ওকে ধরেছি'। নয়ন দূর থেকে দৃশ্যটা দেখে এগিয়ে যায়। দু-চারজনকে হিঁচড়ে সরিয়ে দিয়ে মেয়েটিকে আড়াল করে দাঁড়ায়। তারপর একপলক চিন্তা না করে বিনা দ্বিধায় মেয়েটির কনুই চেপে ধরে একটু জোরের সঙ্গে ভীড়টা কেটে বেরিয়ে আসে। বিশ ত্রিশজন বোকার মত চেয়ে দেখে। নয়ন লবীর এক কোণে মেয়েটিকে নিয়ে গিযে যথার্থ দামে টিকিট দুটো নিয়ে মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়েছিল। কেউ একটিও কথা বলে নি। বরং দু একজন শ্রদ্ধা-প্রশংসার চোখে তার দিকে চেয়ে দেখেছিল।

নয়ন আর চেঁচাল না। চেঁচিয়ে লাভ নেই। চা-ওলা লোকটা এই ভীড়ে নয়নকে আলাদা করে চিনবে না। চেনাতে হলে কিছু করতে হবে। ভীড় ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে নয়ন জানে।

বাঁশের বেড়াটা কেউ ডিঙোয়নি ভদ্রতাবশতঃ। নয়ন এক পলকও দ্বিধা না করে বেডাটা ডিঙিয়ে গেল। চোখের নিমেষে চা-ওলার হাত থেকে কেটলীটা কেড়ে নিল। ঝুড়ি থেকে একটা ভাঁড় তুলে চা ঢালতে লাগল।

বাইরে লোকেরা একটু সময় নিল ব্যাপারটা বুঝতে। তারপর বুঝল, অরাজকতার ইঙ্গিত লুটের গন্ধ। পরমুহূর্তেই হাজারটা মানুষ পার হয়ে আসতে লাগল বাঁশের বেড়া। মড় মড় করে বাঁশের বেড়া ভেঙে পড়ার শব্দ। দৌড় পায়ের আওয়াজ, লাফিয়ে পড়ার শব্দ। ইতর একপাল ছেলে কাটলেটের থালাটা কয়েকটা থাবায় উড়িয়ে নিল, চপের ঝুড়ি থেকে কে একমুঠো ছুঁড়ে দিল শূন্যে। কেকের বয়ামটার দিকে বাড়ানো হাত-গুলো খাব্‌লা মেরে দলা পাকানো কেক তুলে নিচ্ছে মুঠো ভরে। কে একজন চেঁচিয়ে বলছে, 'শালা হারামীরা তিনগুণ দাম নেয়। লোট্‌ শালাদের। মেরে তক্তা করে দে।' তিনটে পশ্চিমা বাঁশের বেড়া ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল। তারপর লুট আর লুট।

নয়ন ভীড় ছেড়ে কষ্টে বাইরে এল। এক ভাঁড় চায়ের অর্ধেক তখনও তার হাতে ধরা। একটু দূর থেকে সে লুটের দৃশ্যটা দেখল দাঁড়িয়ে। তারপর ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে গ্যালারীর ছায়া পার হয়ে মাঠের বাইরে বেরিয়ে এল। খেলা দেখতে আর ইচ্ছে করছিল না তার।

কাকা মুর্গী নিয়ে এল ঠিকই, তবে পরদিন নয়। এল দিন পনেরো পর। হাতে প্রকাণ্ড পা বাঁধা লাল মুর্গী, অন্তত এক কেজি মাংস হবে, অন্যহাতে মিষ্টির বড় বাক্স। সঙ্গে ঝাঁকামুটের মাথায় প্রকাণ্ড ঝুড়িতে আনাজপাতি। মহার্ঘ নতুন ফুলকপি, বড় বেগুন থেকে শুরু করে ঘিয়ের কৌটো পর্যন্ত। কাকার পরনে ফিনফিনে ধুতী, পাঞ্জাবী। একেবারে বরকর্তা। মুখে অপরাধী হাসি।

বাইরের ঘরে শ্যামার বাবা বসেছিল। রবিবারের সকাল দশটা। শ্যামার বাবার হাতে খবরের কাগজ, পাশে চা। ছোটভাইকে ঢুকতে দেখে একটু তাকাল। জিনিসপত্র দেখে অবাক হয়ে একবার বলল—এত সব! কী ব্যাপার? আর কোন কথা হল না। কোনদিনই কথাবার্তা তেমন হয় না। হলেও কাকার মাতলামীর প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যায় বাবা। আজও ব্যাপার দেখে আবার খবরের কাগজে চোখ নামিয়ে নিল।

জিনিসপত্র রান্নাঘরের দরজায় নামিয়ে কাকা মাকে বলল—বৌদি, একটা কথা আছে।

—কী কথা?

—বলছি। বলে কাকা এসে শ্যামার ঘরে উঁকি মারে।

মুখ বাড়িয়ে বলে—উনুনটা ধরা তো শ্যামা।

ঘর গোছাচ্ছিল শ্যামা, মুখ ফিরিয়ে কাকাকে দেখে একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বলল—কেন?

—তুই ধরা তো। কেন, সে খাওয়ার সময়ে বুঝবি।

শ্যামা মুখখানা ভার রেখেই বলল—এত সব কিনে এনেছ কেন? এমনিতে তো বল তোমার পয়সা নেই।

কাকা একটু বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে বলে—নেই তো নেই, তা বলে মাঝে-মধ্যে একটু খাওয়া-দাওয়া করব না? গরীবেরা তো খেয়েই মরে।

শ্যামা একটু খর গলায় বলে—পয়সা পাও কোথায়?

কাকা একটু থমকে যায়। সকলেই জানে, শ্যামা নরম মেয়ে। তার গলায় ঝাঁঝ খুব কম শোনা যায়।

কাকা থমকে থাকে একটু, তারপর হঠাৎ রেগে গিয়ে বলে—যেখান থেকেই পাই তাতে তোর কী? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

—কোথা থেকে পয়সা পাও সেটা আগে বল, নইলে ওসব ফিরিয়ে

নিয়ে যাও, আমরা খাব না।

তুই না খাস খাওয়ার লোক আছে, চেঁচাস না।

—আমি চেঁচাব। ওসব এ বাড়িতে কেউ খাবে না, তোমার লজ্জা করে না, নিজের দাদা ভাইঝি সবাইকে জড়িয়ে চেঁচিয়ে পাড়ার লোকের কাছে যা তা বলে যাও! নিজেকে কী ভাব তুমি? তোমাকে বাবা মা ভয় পেতে পারে, আমি পাই না। তুমি ওসব নিয়ে চলে যাও।

—কী বললি! বলে কাকা তড়পাতে চেষ্টা করে, কিন্তু সুস্থ অবস্থায় তড়িৎ চৌধুরীর মুখটা তেমন খোলে না। কথা হারিয়ে যায়। মদ খেলে হুড় হুড় করে কথা আসে। তবু কাকা তোতলাতে তোতলাতে বলে—তোর বাড়ি যে বের করে দিবি? আমার দাদার বাড়ি—

রান্নাঘর থেকে মা উঠে এসে দুজনের মাঝখানে পড়ে। তড়িৎ চৌধুরীর পিঠে হাত রেখে বলে—এস ঠাকুরপো, আমি তোলা উনুন ধরিয়ে দিচ্ছি। শ্যামা, তোর না আজ কমলার বাসায় যাওয়ার কথা! যা, ঘুরে আয়।

—যখন সময় হবে যাব। তুমি কাকাকে চলে যেতে বল।

—ছিঃ, কী সব বলছিস!

তড়িৎ চৌধুরী স্তিমিত গলায় বলে—শুনেছেন বৌদি, শ্যামার কথা। সেই ছোট্ট নরম সরম শ্যামা আর নেই! আজকাল ভোটটোট দেয়, বয়স্থা হয়েছে—বলে একটু ম্লান হাসবার চেষ্টা করে কাকা।

—হয়েছিই তো। বেঁচে থাকলে সকলেরই বয়স হয়। একমাত্র তোমারই বয়সবুদ্ধি হয় না। কোন্ আক্কেলে তুমি রাস্তার লোকের কাছে নয়নের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে কথা বললে? আমি তোমার ভাইঝি না? ও বুদ্ধি তোমাকে কে দিয়েছে, কে বলেছে তোমাকে যে নয়নের সঙ্গে আমার ভাব?

—চুপ কর শ্যামা। মা ধমক দেয়!

কিন্তু শ্যামার চুপ করার মত অবস্থা নয়। তার নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠেছে, চোখ বিস্ফারিত, ঠোঁট কাঁপছে। জ্বলজ্বলে চোখে সে মার দিকে চেয়ে বলে—তুমি জানো না, এ সবই নয়নের কারসাজি। এত জিনিসপত্র এ সবই নয়ন পাঠিয়েছে। জিজ্ঞেস কর।

—নয়ন! ভারী অবাক হয় কাকা—নয়নের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী? কী যা তা বলছিস।

—ঠিকই বলছি। তুমি চলে যাও।

মা কাকার পিঠে হাত রেখে ঠেলে রান্নাঘরের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বলে—ও পাগল মেয়ে। তুমি চল তো ঠাকুরপো, কী কথা বলবে বলছিলে যে!

একা ঘরে শ্যামা দাঁড়িয়ে থাকে। নিঃঝুম।

গোলমাল শুনে বাবা উঠে এসেছিল। আবার ফিরে গিয়ে একটা প্রেসারের ট্যাবলেট খেয়ে কাগজ নিয়ে বসল। বাড়িটা আবার চুপচাপ হয়ে যায়। যেন কিছুই হয়নি, সব ঠিক আছে।

শ্যামার জানালার পাশেই বাড়িতে মেথর আসবার গলি। সেইখানে বসে কাকা মুর্গী কাটল। ধুতী পাঞ্জাবী ছেড়ে গামছা পরে নিয়েছে। মুর্গীটার 'কঁ-কঁ' ডাক, তারপরই ডানা ঝাপটানোর শব্দ পায় শ্যামা।

গলিমুখো রান্নাঘরের জানালা দিয়ে মা কাকার সঙ্গে কথা বলছে।

—শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকতে তো দেরী আছে? মা জিজ্ঞেস করে।

দেরী কি! আজকাল একমাস অশৌচ আর কে মানছে? গতকালই শ্রাদ্ধ চুকে গেল। পনেরো দিনে।

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—তা উকিলবাবু রেখে-টেখে গেল কেমন?

—পাঁচ সাত লাখ তো শুনছি সাদা টাকাই। পাঁচটা ইন্সিওরেন্স থেকে আরো লাখ দুই পাওয়া যাবে। ব্যাঙ্কের লকার টকার তো এখনও খোলাই হয় নি. বাড়িতে স্টীলের আলমারিতেও না হোক আরো দু আড়াই লাখ পড়ে আছে। দুঁদে উকিল ছিল, দুহাতে লুটেছে। দুখানা বাড়ি—

এরপর মার গলার স্বরটা হঠাৎ নেমে যায়।

চোখে জ্বালা। বুকে একটা ভয় বেড়ালের থাবার মত আলতো বসে আছে। শ্যামা সামান্য সেজে বেরিয়ে পড়ল। বাইরের ঘরে অন্যমনস্কভাবে বসে থাকা বাবাকে কেবল বলে গেল—বাবা, কমলাদির বাড়ি যাচ্ছি। এ বেলা ফিরব না!

—হুঁ।

বাইরে আজ শীতের বাতাস দিচ্ছে। তার সঙ্গে নরম রোদ। পার্কটা হেঁটে পার হতে ভারী ভাল লাগছিল শ্যামার। বড় রাস্তায় এসে ফাঁকা ট্রামে উঠে বসল।

কমলাদি দরজা খুলেই বলে—কত দেরী করলি। সকালে আসার কথা ছিল। তোর শঙ্করদা তোর জন্যে বসে থেকে থেকে এইমাত্র আড্ডা দিতে বেরোল। আয়।

রান্নাঘরে গ্যাসের উনুনে চাপানো প্রেসার কুকার। মাংসের গন্ধে ভুর-ভুর করছে চারদিক। ঘরের মধ্যে একটু ঘুরে ঘুরে দেখে শ্যামা। খাট পালং, আলমারী, টেলিফোন সব সুন্দর সাজানো। বেশ আছে ওরা। বাড়িটা ঠাণ্ডা, শান্ত, ভালবাসার চিহ্নগুলি চারদিকে ছড়ানো।

—শ্যামা, মাংসটা চেখে যা! কমলাদি ডাকে।

—যাই।

রান্নাঘরের দরজায় মোড়া পেতে বসে শ্যামা। টুকটাক নানা কথা হতে থাকে!

—ঝাল বড্ড কম দিয়েছ। পানসে!

—কী করি বল! ওর যে গ্যাসট্রিক। অনেকটা আদাবাটা দিয়েছি।

—তোমাদের বড্ড সাহেবী রান্না!

—ওর তো এরকমই পছন্দ, সেদ্ধ, নিঝাল। আমি মাঝে মাঝে আলাদা ঝাল গড়গড়ে করে রেঁধে নিই। কিন্তু রোজ তো ইচ্ছে করে না, তাই আমারও কেমন এইসব বিস্বাদ রান্নাই অভ্যেস হয়ে যাচ্ছে। বিয়ে করলে পার্সোনালিটি থাকে না, জানিস! কর বিয়ে, বুঝবি।

শ্যামা ঠোঁট ওল্টায়—বয়ে গেছে বিয়ে করতে। চাকরি খুঁজছি।

—খোঁজ। চাকরি করলে আরো ভাল বিয়ে হবে। আজকাল সবাই চাকুরে মেয়ে চায়।

—ইস, বিয়ে করলে চাকরি করতে বয়ে গেছে।

—ও কথা বলিস না। আজকাল একজনের রোজগারে সংসার চলে নাকি। চললেও শখ-শৌখীনতা কিছু করা যায় না। আমারই মাঝে মাঝে চাকরি করতে ইচ্ছে করে।

—আমার ভাল লাগে না। বিয়ে করলে হাত পা ছড়িয়ে সংসার করব—সেই ভাল। বৌকে সুখে রাখতে পারবে না যে মানুষ, তাকে বিয়েই করব না।

কমলাদি কপির ডাঁটার চচ্চড়ি বসিয়ে বলে—ভাগ্যিস তোর তবে সেই ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ে হয়নি। শুনেছি লোকের দানে তার দিন চলে। কী অবস্থা হত তোর!

শ্যামার বুকের ভিতর কোথায় যেন যন্ত্রপাতি নড়াচড়া শুরু করে। শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। ভারী ঝামেলা। কিছুতেই নিজেকে স্থির রাখতে পারে না সে। উঠে গিয়ে বেসিনে হাত মুখ ধোয়।

শংকরদা দুপুর পার করে ফিরল। হাসি ঠাট্টায় খাওয়ার পাট চুকতে গড়িয়ে গেল বেলা। তিনজনে ফিস খেলল খানিকক্ষণ। তারপর গড়াল। খাটে কমলাদি আর শ্যামা, ইজিচেয়ারে শংকরদা।

শ্যামা চোখ বুজে শুয়ে ছিল। সেই অবস্থাতেই বলে—শংকরদা।

—উঁ।

—আমার একটা চাকরি দরকার।

—কেন?

—খুব দরকার।

সিগারেটের প্যাকেটের ওপর একটা সিগারেট লম্বালম্বি ঠুককে ঠুকতে শংকরদা বলে—বিয়ের পর চাকরি কোরো, ডেগমাস্টারী।

—বিয়ে করব না।

—কে বলল করবে না।

—আমিই বলছি।

—কিন্তু তোমার জন্য একটা পাত্র যে প্রায় ঠিক করে ফেলেছি, আজকালের মধ্যেই কথাটা পাড়তে তোমাদের বাসায় আমার যাওয়ার কথা।

শ্যামা একটু হাসে, চোখ দুটো দুই আঙুলে চেপে রেখে বলে—এক পাত্রপক্ষের প্রস্তাব নিয়ে সকালেই কাকা এসেছে।

—পাত্র কী করে?

শ্যামা শ্বাস ছেড়ে বলে—কিছু করে না। বাপ বড়লোক ছিল, মরেছে, ফলে ছেলে এখন বড়লোক হয়েছে। বয়সে ছোট, জাতও এক নয়।

—সে কী! শংকরদা চমকে বলে—এ কেমন বিয়ের প্রস্তাব তোমার কাকা আনলেন?

কমলাদি ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর পিঠের তলা থেকে নিজের আঁচলটা ছাড়িয়ে এনে শ্যামা পাশ ফিরে বলে—আপনার পাত্রটি কেমন শুনি!

শংকরদা শ্যামার দিকে সন্দেহের চোখে তাকায়, বলে—এ পাত্র ভালই। আমাদের বন্ধুর মত তবে আমার চেয়ে বয়সে ছোট। ইঞ্জিনীয়ার। মুস্কিল হচ্ছে কিছু দাবী-দাওয়া করবে। হাজার তিনেক নগদ।

শ্যামা চোখ বুজে নিঃঝুম পড়ে থাকে একটুক্ষণ। তারপর বলে—তার চেয়ে চাকরিটাই ভাল লাগবে আমার। বিয়েটা থাক।

শঙ্করদা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে, মাথা হেলিয়ে শ্যামার দিকে চেয়ে। তারপর বলে—শ্যামা।

—উঁ।

—একটা সত্যিকথা বলবে?

—কী?

—তুমি কাউকে ভালবাস।

—দূর।

—বাস, কিন্তু কোন কারণে তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হচ্ছে না। হয়তো সে তোমাকে ফাঁকি দিয়েছে। সত্যি কিনা বল।

—না।

—তবে ফ্যাক্টটা কী?

—কিছু না।

—সেই সন্ন্যাসী ডাক্তারকেই তোমার পছন্দ নয় তো শ্যামা। ভেবে দেখ।

আবার সেই যন্ত্রপাতির নড়াচড়া। তার শরীরের ভিতরে একটা লিভার ওঠে নামে, হুইল ঘোরে, ধক্ ধক্ করে স্টার্ট নেয় ইঞ্জিন। শ্যামা তার কেঁপে-ওঠা হাত আঁচলে ঢাকে, বালিশে মুখ লুকোয়।

—কী হল?

—কিছু না।

শঙ্করদা নীরবে সিগারেট খায়। অনেকক্ষণ বাদে বলে—আমি এর মধ্যে আরো ভাল করে খোঁজ নিয়েছি শ্যামা। খোঁজ নিয়ে দেখেছি, তুমি সেই সন্ন্যাসীর ঘর করতে পারবে না সত্যিই।

শ্যামা চুপ করে থাকে।

শঙ্করদা বলে—তার বাঁধা মাইনের চাকরি নয়। লোকের দেওয়া জিনিসে তার সংসার চলবে। তার ধারণা লোকের সেবা করে মানুষের অযাচিত দান পাওয়াই শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, ব্রাহ্মণোচিত! সে তোমাকে সুখে রাখার চেষ্টাও করবে না। প্রতিদিন তোমার রাত ভোর হবে হাঁড়ির চিন্তায়, ভিক্ষায় চলবে পেট। স্বামীর সঙ্গও পাবে না তুমি। সে লোকটা উদয়াস্ত যাজন করে বেড়ায়, ছমাস নমাস বাইরে বাইরে ঘোরে বৌয়ের দিকে

তাকিয়ে দেখবে একটু—এমন স্বভাব নয়। তার জীবনে উন্নতি নেই, প্রমোশন নেই, ইন্সিওরেন্স, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, ব্ল্যাক মানি—কিছু নেই। তার কাছে থেকে কোনও উপহারও কোনদিন পাবে কিনা সন্দেহ। ফুল্লারার বারোমাসের গীত হবে তোমার শ্লোগান। পারবে শ্যামা?

শ্যামার চোখভরে জল আসে। কিছু বলে না।

শঙ্করদা মাথা নেড়ে বলে—পারবে না। ওরকম জীবন স্বেচ্ছায় বেছে নেবে কে? যার গতি হয় না সে হয়তো নেবে, কিন্তু তুমি নেবে কেন? আজকালকার মেয়ে তুমি, তোমার এতটা সেন্টিমেন্ট থাকার কথা নয়! থাকলে বুঝব তুমি বোকা।

হৃৎপিণ্ড একটা পাম্প মেসিনের মত ঝলকে ঝলকে জল তুলে আনছে চোখে। বুকটা ব্যথা করে। আস্তে আস্তে কান্নায় শরীরটা কেঁপে ওঠে। পারবে না শ্যামা। জানে, পারবে না। ঐ জীবন তার নয়। তবু সেই দূরবর্তী মানুষটার ছবি কেন ছুঁয়ে থাকে তাকে।

শঙ্করদা মৃদু গলায় বলে—আমি অনেক ভেবেছি। মানুষটাকে আমারও বড় ভাল লাগে শ্যামা। লোকটা আমাকে এতদূর প্রভাবিত করেছিল যে আমি এক সময়ে ওর ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিতেও রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু কমলা দিল না। বলল—যদি ওর মতই তোমারও অবস্থা হয়। সেটা অবশ্য হত না। ওদের আশ্রমের অনেক লোকই ভাল কাজকর্ম করে, বড় চাকরি করে, সংসারও করে। দীক্ষা নিতে ভয় পেলাম। তুমি কেঁদো না, সব শুনে যদি রাজি থাক, তবে বল ওর সঙ্গেই বিয়ের ব্যবস্থা করি।

শ্যামা সময় নিয়ে সামলে উঠে বসল। তারপর মাথা নেড়ে বলে—না শঙ্করদা। ঐ জীবন আমি পারব না।

—আমিও তাই বলি। তাহলে এঞ্জিনীয়ারের এ সম্বন্ধটা করব কি শ্যামা? তুমি মত দিলে সামনের রবিবার তোমাকে ওরা দেখতে যাবে।

শ্যামা নিজের কোলে মুখ নামিয়ে বসে রইল।

বিকেলের দিকে কমলাদিকে ঠেলে তোলে শঙ্করদা—এই, চা করবে না?

—আমি করছি। বলে শ্যামা উঠে গেল রান্নাঘরে। চায়ের সরঞ্জাম গোছাচ্ছিল যখন তখনই টেলিফোনের রিং শুনতে পেল। সারাদিন আজ

টেলিফোনটা বাজে নি। শব্দটা তাই নতুন লাগল শ্যামার কাছে। হঠাৎ দমকলের আওয়াজের মত। নিশুতিরাতে বুক কেঁপে ওঠে।

শঙ্করদা চেঁচিয়ে বলল—শ্যামা, তোমার ফোন।

একটু চমকায় শ্যামা। নয়ন নয় তো!

নয়নই। টেলিফোন তুলেই শ্যামা মিষ্টি একটা পাখীর ডাক শোনে। তারপরই নয়ন বলে—শ্যামা!

—বলছি।

—কী করছ?

—কিছু না।

—একটা জিনিস শোন।

—কী

—শোন না। কান পেতে থাক।

শ্যামা কান পাতল। প্রথমটায় কিছু বুঝতে পারল না তারপর একটা শ্বাস ছাড়ার মত বাতাসের শব্দ হয়।

—শুনেছ।

—কিসের শব্দ?

—সেই সাপটা!

শ্যামা হিম হয়ে যায়।

—শ্যামা!

—বল।

—সাপটার দাঁত উঠেছে। আজ সকালে দেখলাম, ছোট্ট হুলের মত দেখা যাচ্ছে।

শ্যামা নিঃশ্বাস ফেলে বলে—সেটা আমাকে বলে কী হবে?

—ইনফর্মেশনটা দিয়ে রাখলাম।

—আচ্ছা। ছেড়ে দিচ্ছি…

—ছেড়ো না। তাহলে আবার ফোন করব! তোমার দিদি জামাইবাবুর কাছে তোমার তাহলে প্রেস্টিজ থাকবে না।

—কী বলতে চাও বল।

—আমার বাঁ হাতে টেলিফোন, ডান হাতে সাপের গলা ধরে আছি। ওটা বিড়ে প্যাঁকিয়ে আমার কোলে পড়ে আছে। খুব রেগে আছে ইদানীং। দিনরাত আমি খোঁচাই। ঘুম থেকে টেনে তুলি। খেলা

করি। কাজেই সুযোগ পাওয়ামাত্র ও আমাকে কামড়াবে। এক্ষুণি কামড়াতে পারে। পাকা ম্যাচিওরড্ গোখরো। বিষের থলি ভরভরন্ত …বুঝলে ?

শ্যামার হাত কাঁপতে থাকে। বলে—বুঝেছি।

নয়ন বলল—তোমার কাকা একটা খবর দিয়ে গেল এই মাত্র।

—কী খবর ?

—তোমার মা বাবা রাজি। কাকা রাজি করিয়েছে। তাকে পাঁচশো টাকা দিয়েছিলাম।

শ্যামা আস্তে করে বলে—তাতে কী হল ?

—কিছুই না শ্যামা, তুমি রাজি না হলে কিছুই না। আমি জানি। তবে তোমার বাবার মত পাওয়া গেছে…সেটাও কম কথা নয়। তুমি ভয় পেয়েছিলে !

—আমি রাজি নই।

—তোমাকে রাজি করানোর জন্যই এই টেলিফোন। শ্যামা, তুমি রাজি না হলে আমি আমার ডান হাতের মুঠোটা আলগা করে দেব। সাপটা তৈরী আছে। এখন ভেবেচিন্তে বল। আমি ইয়ার্কী করছি না।

—নয়ন ! আত্মবিস্মৃতের মত নামটা উচ্চারণ করে শ্যামা। এতক্ষণ নামটা উচ্চারণ করে নি পাছে কমলাদি আর শংকরদা জেনে ফেলে।

নয়ন ধীর গলায় বলে—বল শ্যামা, শুনছি।

—তুমি কি পাগল ?

—হতেও পারি। আমি যে কী তা ভেবে পাই না। তবে তোমাকে বিয়ে করার জন্য আমি এত তাড়াহুড়ো করতাম না শ্যামা, অপেক্ষা করতাম। কিন্তু তুমি সেদিন একজন ডাক্তারের কথা বলেছিলে। সেই থেকে আমার মাথার ঠিক নেই। আমি এক্ষুণি জানতে চাই। বল।

—তা হয় না।

—তবে ছেড়ে দিই ?

—আঃ নয়ন।

ওপাশে একটা আর্ত চীৎকার শোনা গেল। তারপর রিসিভার পড়ে যাওয়ার শব্দ।

শ্যামা খুব সাবধানে টেলিফোনটা রাখল। তারপর টেবিলটায় ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল।

—কী হয়েছে রে ? বিছানা ছেড়ে কমলাদি উঠে আসে।

—ওকে বোধ হয় সাপে কামড়াল। উদ্‌ভ্রান্তের মত বলে শ্যামা।

—কাকে ?

—নয়নকে।

—সে কী ! কী বলছিস যা তা ?

—কী জানি ! শ্যামা মাথা ঠিক রাখতে না পেরে চারদিকে টালুমালু চেয়ে বলে—ইয়ার্কীও হতে পারে !

—তুই এদিকে আয় তো, বিছানায় বোস। ওগো, তুমি পাখাটা আস্তে করে ছেড়ে দাও তো !

ইয়ার্কীই। সাপের শব্দটা টেলিফোনে হুবহু নকল করেছিল নয়ন। শ্যামাকে টেলিফোন করার সময়ে সাপটা তার কাছে ছিলই না।

গতরাতে নয়ন দশটা সোনেরিল খেয়েছিল গুণে গুণে। ঘুম আসে নি। ইম্যুনিউনিটি এসে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। পৃথিবীর সব ঘুমের ওষুধের প্রতিক্রিয়া একদিন নষ্ট হয়ে যাবে। সেদিন অবিরল জেগে থাকবে নয়ন, একটা অস্পষ্ট ভয় বুকের মধ্যে ঘনিয়ে ওঠে।

কাল রাতে একটা ব্যাঙকে ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জের ছুঁচের খোঁচায় আধমরা করে সাপটাকে খেতে দিয়েছিল নয়ন। খুব খিদে ছিল ওটার। যখন মুখটা তুলে ব্যাঙটাকে ধরল, তখনই নয়ন লক্ষ্য করে সাপটার সামনের দুটো দাঁত হুলের মত জেগে উঠেছে। আগে লক্ষ্য করে নি সে। লক্ষ্য করে গাটা একটু শিরশির করেছিল তার ! নয়নের সব অত্যাচারের কথা ও কি মনে রেখেছে ? কে জানে ! ঝাঁপিটা সাবধানে আবার চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছে সে। খোলে নি।

শ্যামা রাজি হল না। হবে না। জানত নয়ন। দিন আর রাতের দুজন নার্স মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ রাখে নয়ন। উপহার দেয়। সুন্দর সব কথা বলে। ভাড়াটে মেয়েদের কাছেও ঘুরে এসেছে সে এর মধ্যে কয়েকবার। কিন্তু জুড়োয় না। কিছুতেই জুড়োয় না নয়ন। শরীরের মধ্যে কী একটা তার নেই ! সে কি ক্লোরোফিল ? ভিটামিন ? ক্যালসিয়াম ? ফেলে-রাখা মেটেরিয়ামেডিকা, অ্যানাটমির বই খুলে খুলে রাত জেগে

দেখে সে। কিছু বুঝতে পারে না।

মাঝে মাঝে ভাবে, সে আমেরিকা, ফ্রান্স বা মোনাকোতে চলে যাবে। সেখানে সারারাত ফুর্তি করার অঢেল জায়গা। মদ খাবে, নাচবে, জুয়া খেলবে, মেয়েছেলে পাল্টে দেখবে রোজ। বিদেশে সারারাত শহর জেগে থাকে। কিন্তু কিছু স্থির করতে পারে না সে।

কয়েকদিন বাইরে ঘুরে আসে সে। তার ঘরে এসে এক গভীর রাতে সাপের ঝুঁড়ির ঢাকনাটা খোলে।

প্রস্তুত ছিল না নয়ন। অপ্রত্যাশিত সাপটা ঝাঁপির ঢাকনা খোলা মাত্র লক্ লক্ করে জেগে ওঠে। ও বুঝতে পেরেছে কি যে ও এখন সশস্ত্র! একটা চকিত লাফে সরে যায় নয়ন। সাপটা শরীর ক্রমশঃ উঁচু থেকে উঁচুতে তুলে ধরতে থাকে। নয়নের বুক সমান উঁচু তার তীব্র ফণা। মিটমিটে চোখে নয়নের চোখ আটকে রাখে মায়াবী সম্মোহনে কিছুক্ষণ। তার শিকরের মত চেরা জিভ দ্রুত নাড়তে থাকে। অসম্ভব ফোঁস ফোঁসা-নীতে ভরে যায় ঘর। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে নয়ন। তারপর ধীরে ধীরে সাহসভরে অভ্যাসবশতঃ সে তার দস্তানা-পরা হাতটা এগিয়ে দেয়।

আক্রমণ। প্রতি আক্রমণ। নয়নই জেতে। এক সময়ে ছোবল দেওয়ার মুখে ধরে ফেলে ঘাড়। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে হাসে। ধীরে ধীরে ঝাঁপির ভিতর ঢুকিয়ে দেয় সাপটাকে। দস্তানা খুলে সিগারেট ধরায়। বিছানায় বসে থাকে জেগে। সারা রাত। কখনও বা মুঠো মুঠো সোনেরিল খেয়ে দেখে। বৃথা।

একদিন শ্যামার কাকা হন্তদন্ত হয়ে এসে খবর দিল—নয়ন, শ্যামার বিয়ের কথা চলছে।

নয়ন উদাস গলায় বলে—কার সঙ্গে?

—খবর পাই নি। তবে এক পার্টি ওকে দেখে পছন্দ করে গেছে।

নয়ন চুপ করে থাকে। কিছু একটা করা উচিত, তার মনে হয়। কিন্তু বড় গভীর ক্লান্তি তার আজকাল।

মাঝে মাঝে এমন হয়, পুরোনো ব্র্যান্ডের সিগারেটটা বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়। তখন মানুষ বিরক্ত হয়ে ব্র্যান্ডটা পাল্টে নেয়। তেমনই কিছু একটা ভাবল নয়ন, ব্র্যান্ডটা পাল্টে নেবে কিনা। তারপর আর সেই ভাবনাটাও রইল না। সম্পূর্ণ শূন্য মাথায় সে বসে রইল।

সে বুঝতে পারে, শ্যামা নয়, কিছু নয়, একটু ঘুম ছাড়া সে আর

কিছু চায় না।

সাপটাকে জগদীশের কাছে দিয়ে আসবে, ভেবেছিল! কিন্তু দিল না নয়ন। রেখে দিল। থাক। সে আজকাল ইঞ্জেকশন নেয় নিজে নিজে। তারপর ঘুমোয়। একদিন যখন ইঞ্জেকশনের ক্রিয়াও কমে আসবে তখন সেই ভয়াবহ রাত্রিগুলোতে কে জেগে থাকবে তার সঙ্গে? তখন ভয়ংকর ঐ দাঁতওলা সাপটাকেই জাগাবে সে।

কে জানে ওর দাঁতেই শেষ ঘুমের ওষুধটা রয়ে গেছে কিনা!

সমাপ্ত